কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রথম খণ্ড, প্রকাশিত হ'ল। এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে এক বৎসর পরে—এই আশা করছি।

এতে কোনো দীর্ঘ ভূমিকা যোগ করা হয়নি। এর পূর্বে প্রকাশিত 'বাংলার জাগরণ' এর ভূমিকাস্থানীয়। সেই সঙ্গে 'কবিগুরু গ্যেটে'ও পাঠকরা যদি পড়ে নেন তবে ভাল হয়।

বইখানি আকারে ছোট নয়। দুঃসাহসের পরিচয়ও এতে কিছু কিছু আছে। এমন একটি লেখায় বহু ধরনের অসম্পূর্ণতা, এমন কি ভুল, ঘটা আশ্চয নয়—না ঘটাই বরং আশ্চর্য। আশা করছি যেসব প্রসঙ্গ এতে উত্থাপিত হয়েছে সেসবের উপরে দেশের সুধীবৃন্দের তরফ থেকে অচিরে আরো আলোক-পাত হবে।

অধ্যাপক তারকনাথ সেনের মূল্যবান প্রবন্ধ Western Influence on Tagore's Poetry আমার চোখে পড়েছে কিছু দেরিতে—এই লেখাটি প্রেসে দেবার পরে। উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা এর দ্বিতীয় খণ্ডে করতে চেষ্টা করব।

কবিগুরুর যৌবনের একটি প্রতিকৃতি এই গ্রন্থে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনী আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড-এর আগ্রহে বইখানি এত শীগ্‌গির প্রকাশ করা সম্ভবপর হ'ল, এজন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে আমাকে পূবে সাহায্য করেছেন শ্রীআবদুল জব্বার ও শ্রীসনাতন সেন, পরে সাহায্য করেছেন কল্যাণীয়া সন্ধ্যা ও হেনা। এই শ্রমসাধ্য কাজের জন্য তাঁদের সবাইকেই সাধুবাদ জানাচ্ছি।

বড় বই পড়া সম্বন্ধে ভলটেয়ারের কথা আমরা 'কবিগুরু গ্যেটে'-তে উল্লেখ করেছি। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কেও তাই আমাদের নিবেদন। রবীন্দ্র-রচনা এত জীবন-রস-সমৃদ্ধ যে এর একটি ক্ষুদ্র অংশও পাঠকদের স্বাদহীন লাগবার কথা নয়।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২
কলিকাতা

কাজী আবদুল ওদুদ

উৎসর্গ

এ যুগের স্মরণীয় বাঙালী
অতুলচন্দ্র গুপ্তের
স্মৃতির উদ্দেশে

অবতরণিকা

কালিদাস তাঁর রঘুবংশের সূচনায় নিজের শক্তির অল্পতার কথা প্রায় সবিস্তারে বলেছেন। মনে হতে পারে, এটি ছিল সেকালের কবি-সাহিত্যিকদের জন্য গ্রন্থারম্ভের একটি শিষ্ট রীতি মাত্র—তার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আসলে এর সমূহ প্রয়োজন কবি অনুভব করেছিলেন। যা মহৎ ও বিরাট তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হতে হলে প্রস্তুতিরূপে চাই সীমাহীন কৌতূহল আর শ্রদ্ধা। এ ভিন্ন অন্য উপায় যে আছে তা মনে হয় না।

মহৎ ও বিরাট রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসু হয়েছি পরম বিনয়ে ও শ্রদ্ধায়। কোনো শিথিলতা কোনো প্রচ্ছন্ন বিমুখতার দ্বারা বিঘ্নিত না হোক আমাদের পরিমিত সাধ্য।

*　　*　　*　　*

'কবিগুরু গ্যেটে'তে আমরা চেষ্টা করেছি কবির জীবন ও রচনা দুয়েরই যথাসম্ভব পরিচয় দিতে। 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে'ও তুল্য চেষ্টা আমরা করবো। আর 'কবিগুরু গ্যেটে'তে যেমন আমাদের কাঙ্ক্ষিততম ছিল কবির অন্তর্জীবনের পরিচয় লাভ, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে'ও তাই আমাদের অভীষ্ট। তবে মনোহারিত্ব কাব্যের এক বড় সম্পদ; কবি রবীন্দ্রনাথের মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, তার ফলে, কবির রচনার মনোহারিত্ব ও বৈচিত্র্য সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে বেশি। অবশ্য আশা করি সেই মনোহারিত্বের মায়া এতখানি হবে না যে তাতে আবৃত হবে কবির ব্যক্তিত্ব বা অন্তর্জীবন—যাতে কবির শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

*　　*　　*　　*

মনোহারিত্বেই কাব্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় একথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কথাটার মনোযোগ আকর্ষণ করবার শক্তিও আছে। যা মনোহর নয় তা কাব্য বা শিল্প নয় একথা মানতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মানতে হবে যে যা একই সঙ্গে মনোহর ও অন্তর্জীবনে সমৃদ্ধ নয় তা মহৎ কাব্য বা মহৎ শিল্প নয়। কবি নিজেও অনেক সময়ে তাঁর বাণীর মনোহারিত্বের মায়ার আকর্ষণ অনুভব করেছেন বেশি। কিন্তু তাঁর বাণী যে একই সঙ্গে মনোহর ও মহৎ

সে সম্বন্ধে অবহিত না হলে তাঁকে ভুল বোঝা হবে। একটি বিশিষ্ট যুগ উদার কণ্ঠ লাভ করেছে তাঁর সাহিত্যে, এটি একটি বড় সত্য।

* * * *

কবির সম্বন্ধে প্রথম কিঞ্চিৎ দীর্ঘ আলোচনা করি বহুদিন পূর্বে—বাংলা ১৩৩১ সালে। তারও মূলে ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। কবির ইচ্ছা অনুসারে সেই আলোচনাটি ১৩৩২ সালে সেই দিনের একটি সুপরিচিত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৩৪ সালে সেটি গ্রন্থাকারে বার করা হয়। সেই দিনে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচকরূপে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

* * * *

তারপর রবীন্দ্রপ্রতিভা ও সাহিত্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সে-সবের মধ্যে আমার এই বইখানির জন্য বিশেষ ঋণ স্বীকার করবার আছে রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থ-পরিচয় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের কাছে আর রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে—কবির রচনাবলী ও জীবন দুয়েরই সম্পর্কে তাঁদের সংগৃহীত বহু মূল্যবান তথ্যের জন্য।

* * * *

কবির রচনার তাৎপর্য গ্রহণের চেষ্টা করেছি—পূর্বেও যেমন করেছিলাম—মুখ্যত তাঁরই বিভিন্ন রচনার সাহায্যে। বলা বাহুল্য এইটিই এ ব্যাপারে প্রশস্ততম পথ। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আলোচকের সঙ্গে আমাদের চিন্তার ও পরিদৃষ্টির মিল বা অমিল যা হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য যা পেয়েছি, সবই যথাস্থানে নিবেদন করতে চেষ্টা করবো।

* * * *

একালের চিন্তাজগতের বিশিষ্ট পথিকৃৎ গ্যেটে, রামমোহন ও টলস্টয়ের সগোত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁদেরই মতন জীবনের মর্যাদার, বিশ্বমৈত্রীর ও বিশ্বকল্যাণের সাধনা তাঁর—আর তাতেই তাঁর বিশিষ্ট পরিচয়।

বিচিত্রমূর্তি সৌন্দর্য, জগৎ ও জীবনের রহস্যময়তা, এসবও তাঁকে আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে। (কবি গ্যেটেকেও এসব আকর্ষণ করেছিল।) কিন্তু সেই নিরুদ্দেশ যাত্রা থেকে বারবার ফিরিয়েছে তাঁকে জীবন ও বাস্তব জগৎ

সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক চেতনা। প্রাচীন ধ্যানী ভারতবর্ষ আর একালের নবজীবনের স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ, বলা যেতে পারে, এই দুয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর জীবনে লক্ষণীয় হয়েছে। কিন্তু নবজীবনের স্বপ্নে ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ ভারত-বর্ষের হাতছানি যে তাঁর জন্য বলবত্তর হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাল্য ও কৈশোর

জন্ম

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন সুবিদিত—বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। ইয়োরোপীয় মতে সেটি ছিল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে। বাংলা মতে সেইদিন ছিল সোমবার, কিন্তু ইয়োরোপীয় মতে সেদিন ছিল মঙ্গলবার। তার কারণ, কবির জন্ম হয়েছিল মধ্যরাত্রির পরে।

যে ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম জ্যোতিষশাস্ত্রমতে তা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে কবি কোথাও কৌতূহল প্রকাশ করেছেন কি না মনে পড়ে না। তবে তাঁর জন্মলগ্নে চন্দ্র রয়েছে দেখে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি বলতেন—ওর লগ্নে চাঁদ, স্বনামধন্য পুরুষ হবে।

নামকরণ

কবির নামকরণ সম্পর্কে কবির জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবীর বিবরণ এই :

> রবির জন্মের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাতকর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অনুষ্ঠান অপৌত্তলিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে।...... রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার আলপনার সঙ্গে তার নাম লেখা হইয়াছিল, সেই পিঁড়ার চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ত করানো হয়। সেই গর্তের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জ্বালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তার নামের চারিদিকে বাতি জ্বলিতে লাগিল—রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মহর্ষির আত্মজীবনীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর ধর্মসাধনায় ইরানী কবি হাফিজের প্রেম-অগ্নি-পূর্ণ বাণী একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। তা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, মহর্ষি তাঁর নবজাত পুত্রকে তাঁর পরমপ্রিয় হাফিজের নাম দিয়ে থাকবেন। কবি হাফিজের আসল নাম শাম্‌স্‌-উদ্‌দীন, অর্থাৎ ধর্মরবি (শাম্‌স্‌=সূর্য, রবি)।

পূর্বপুরুষ

কবির পূর্বপুরুষদের কথা তাঁর সুপরিচিত 'জীবনী'তে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। সে-সবের অনেকটাই অবশ্য কিংবদন্তী। সেই সব থেকে মাত্র এইটুকু গ্রহণ করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে যে, আচারপ্রধান—সেকালে প্রায়-আচারসর্বস্ব—হিন্দুসমাজে কবির পূর্বপুরুষদের যথেষ্ট প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছিল; তার কারণ, সে-সমাজে তাঁদের গণ্য করা হয়েছিল একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ বলে। কি কি কারণে কোনো কোনো বংশের লোকদের সেকালে পতিত সাব্যস্ত করা হ'ত সে-সম্বন্ধে বহু কৌতূহলকর বিবরণ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের 'জাতিবিচার' গ্রন্থে রয়েছে।—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কবির পূর্বপুরুষেরা সেই সব প্রতিকূলতার কাছে হার মানেন নি। ইংরেজ আমলের সূচনায় দেখা যায়, তাঁরা কলকাতায় এসে বসবাস করছেন, আর সেদিনের আইন-আদালতের ভাষা পার্সীর সঙ্গে ইংরেজিও কিছু আয়ত্ত করে ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়ে মন দিয়ে ধন ও সামাজিক প্রতিপত্তি দুই-ই অর্জন করেছেন। কলকাতায় আসার পরে তাঁদের বংশের কুশারী উপাধি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে, আর চারপাশের লোকদের মুখে ব্রাহ্মণের সহজলভ্য ঠাকুর উপাধি প্রচলিত হয়। এই ঠাকুর ইংরেজ ব্যবসায়ীদের মুখে হয় Tagoure অথবা Tagore। একালের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঠাকুর-বংশের লোকদের যে দীর্ঘদিনের পরিচয় তা এই সব থেকে বোঝা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে জ্ঞান করা যেতে পারে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্ম ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি বহুগুণে ভূষিত ছিলেন—মাতৃভাষা ভিন্ন পার্সী, আরবী, ইংরেজি ও সংস্কৃত জানতেন; ভারতবর্ষীয় ও ইয়োরোপীয় উভয় সংগীতে তিনি পারদর্শী হয়েছিলেন; আইন সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল; আর নানা ধরনের ব্যবসায়ের দ্বারা ও পরে জমিদারির দ্বারা তিনি অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের ও বিপুল খ্যাতি-প্রতিপত্তির অধিকারী হন। বহু লোকহিতকর অনুষ্ঠানে অজস্র অর্থ তিনি দান করেছিলেন। নবভারতের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সহকর্মী, বিশেষত দেশের চিত্তোৎকর্ষের

ও রাজনীতির ক্ষেত্রে—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তিনি একসময়ে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রথমবার বিলাতে যান ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। বিলাতে গিয়ে তিনি খুব জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তার ফলে সেখানকার সম্ভ্রান্ত-সমাজে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'প্রিন্স দ্বারকানাথ'। কিন্তু শুধু জাঁকজমকপূর্ণ জীবনই তিনি ভালবাসতেন না, তাঁর সৌন্দর্যবোধ ছিল উচ্চাঙ্গের। এই প্রতিভাবান্ পুরুষ তাঁর অতুল ঐশ্বর্য এক হিসাবে নিজের জীবদ্দশাতেই নিঃশেষিত করে যান, কেননা, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে তাঁর মৃত্যু হলে দেখা গেল—তাঁর সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক সত্তর লক্ষ টাকা আর তাঁর ঋণের পরিমাণ আনুমানিক এক কোটি টাকা। অল্পদিনে প্রভূত ধন-উপার্জন, আর অজস্র ব্যয়ের দ্বারা অল্পদিনেই তা নিঃশেষিত করা—এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ-রাজত্বের সূচনায় শক্তিশালী বাঙালীদের এক ধরনের বৈশিষ্ট্য। মোগল-প্রতাপ তখন অস্তমিত, কিন্তু দেশের উঁচুমহলে মোগল মেজাজ তখনো অক্ষুণ্ণ।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের পরমশ্রদ্ধেয় পিতৃদেব—পিতার মৃত্যুকালে ছিলের উনত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক। কিন্তু এই বয়সেই তিনি তাঁর চারপাশের ধনীদের জীবনযাত্রার ধারা ডিঙিয়ে অন্য পথের সন্ধানী হয়েছিলেন। সে-পথ কঠিন জীবন-জিজ্ঞাসার পথ—প্রচলিত কথায় তাকে বলা হয় ধর্মের পথ। পিতার এই নিদারুণ ঋণ আর বহুবিস্তৃত বিষয়-সম্পত্তি দুয়েরই ভার তিনি পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করলেন তাঁর জীবন-বিধাতার দান হিসাবে, আর দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টায় সেই ঋণ পরিশোধ করে পারিবারিক গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন—শুধু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে এক নতুন মহিমায় মণ্ডিত করলেন, কেননা, তাঁর কালেই তাঁদের পরিবার অর্জন করল বাংলার ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা। তাঁর ধর্মবোধ ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর স্বদেশীয়েরা তাঁকে মহর্ষি আখ্যায় ভূষিত করেন। মহর্ষির চিন্তা, চরিত্র, সবেরই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে গভীর তার পরিচয় আমরা নানাভাবেই পাব।

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র। মহর্ষির অন্যান্য পুত্রকন্যারা, আর ভ্রাতুষ্পুত্ররাও, নানা বিষয়ে কৃতী হয়েছিলেন। কোনো পরিবারে প্রায়-একসঙ্গে এত গুণী ব্যক্তির আবির্ভাব সচরাচর ঘটে না। এর ফলে কবির

বাল্যে ও কৈশোরে শিক্ষা সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁদের বিপুল পরিবারের যে অসামান্যতা লাভ হয়েছিল কবির প্রতিভার বিকাশে তার ভূমিকা হয়েছিল অনন্যসাধারণ। কবির বাল্য ও কৈশোরের সেই স্মরণীয় লালন-ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করা যাক।

মহর্ষি (১৮১৭-১৯০৫)

মহর্ষির কথা কিছু বলা হয়েছে। তিনি শুধু পরিবারের কর্তা ছিলেন না, সব ব্যাপারে পরিবারের প্রত্যেকের উপরে তাঁর প্রভাব ছিল বিস্ময়কর। পারিবারিক জীবনে তেমন প্রভাবের কথা একালে ভাবা কঠিন। তাঁর চরিতকথা, বিশেষ করে তাঁর 'আত্মজীবনী' ও অন্যান্য রচনা, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের অবশ্য-পাঠ্য। কবির জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে থেকে মহর্ষি বিদেশ-ভ্রমণেই সময় কাটাতেন বেশি। কিন্তু বহুকাল প্রবাসে থেকে যখন তিনি বাড়িতে ফিরতেন তখন বাড়ির সবার উপরে তাঁর প্রভাব কেমন হ'ত সে সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন :

> তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গমগম করিতে থাকিত। দেখিতাম গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিশ্রাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

মহর্ষি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতির আরো কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করবো।

যা হীন যা নীচ সে-সবের প্রতি মহর্ষির বিতৃষ্ণা কত গভীর ছিল সে-সম্বন্ধে কবির আঁকা একটি ছবি এই :

> কোনো একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিটপরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল।

কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল…তৃতীয় বারে বোধহয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্-টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে।" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো।…স্টেশনমাস্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে-টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেঝের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়া গেল—টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

মহর্ষির অন্তরে যেন সবসময়ে চলত ব্রহ্মধ্যান। তাঁর বালক-পুত্রের মুখে ব্রহ্মসংগীত শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। কবি লিখেছেন :

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শুনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে—'

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—, সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

শুধু জীবনের বড় আদর্শগুলো সম্বন্ধে নয়, প্রতিদিনের জীবনে কি করণীয় কি করণীয় নয়, কি গ্রহণীয় কি বর্জনীয়, এ সব সম্বন্ধেও মহর্ষির চেতনা ছিল প্রখর। কিন্তু নিয়মশৃঙ্খলা তিনি যতই ভালবাসুন, সন্তানদের স্বাধীন বিকাশ যাতে ব্যাহত না হয় সেদিকেও তিনি ছিলেন তুল্যরূপে প্রখরদৃষ্টি। কবি লিখেছেন :

এক-একদিন দুপুর বেলায় লাঠি হাতে এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম ; পিতা তাহাতে কখনো উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন

না। তাঁহার জীবনের শেষ পর্যন্ত ইহা দেখিয়াছি, তিনি কোনো মতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধে কাজ অনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া তাহা নিবারণ করিতে পারিতেন কিন্তু কখনো তাহা করেন নাই। সত্যকে ও শোভনকে বাহিরের দিক হইতে লইব, ইহাতে তাঁহার মন তৃপ্তি পাইত না—তিনি জানিতেন সত্যকে ভালোবাসিতে না পারিলে সত্যকে গ্রহণ করাই হয় না।

কবি লিখেছেন, যতদিন তিনি পিতার সঙ্গে পাহাড়ে ছিলেন পিতা রোজ ভোরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা উপাসনা করতেন। শেষরাত্রে উপাসনার জন্য মহর্ষির নিঃশব্দ জাগরণের এই বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

এক-একদিন জানি না কতরাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারন্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

নব যৌবনে পিতাকে স্বরচিত গান শুনিয়ে কবি তাঁর হাত থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। প্রশংসনীয় গর্বের সঙ্গে তিনি সেই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

একবার মাঘোৎসবে (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, "দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সেই কাজ করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচশ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

বলা বাহুল্য নবযৌবনে এমন পুরস্কার লাভের অর্থ অনেক। এর পূর্বেই কবি অবশ্য সেই দিনের পাঠক-সমাজের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু মহিমময় পিতার হাত থেকে এমন পুরস্কার লাভের মর্যাদা সে-সবের চাইতে অনেক বেশি ছিল। বলা যেতে পারে এটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের জন্য হয়েছিল যেন দ্বিতীয় অভয়-মন্ত্র—প্রথম অভয়-মন্ত্র তিনি অবশ্য লাভ করেছিলেন সুন্দরের ও শোভনের প্রতি আপন অন্তরের অনির্বাণ প্রেমে।

মাতা সারদা দেবী (১৮২৪-৭৫)

মাতার সান্নিধ্য রবীন্দ্রনাথ বেশি দিন পান নি। তার কারণ, দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থা ছিলেন। তিনি যখন পরলোক গমন করেন তখন কবির বয়স বছর চৌদ্দ। মাতার কথা বিস্তারিতভাবে তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। তবে তাঁর স্মৃতিকথায় মায়ের যতটা ছবি আভাসে ইঙ্গিতে তিনি এঁকেছেন তা থেকে বোঝা যায়, কবিজননী খুব মধুরস্বভাবা ও স্নেহবতী ছিলেন। মহর্ষির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ এবং আনুগত্যও কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। কবি তাঁর সাহিত্যে কল্যাণী নারীর বন্দনা অনেক গেয়েছেন, মহনীয়া মাতৃমূর্তি বহু এঁকেছেন। সে-সবের মূলে তাঁর জননীর স্মৃতি অনেকখানি, এ অনুমান সংগত।

হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-৮৪)

ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা। কবির জীবনে ইনি অবিস্মরণীয় এইজন্য যে এঁর ব্যবস্থাপনায় কবির প্রথমজীবনের শিক্ষা দীর্ঘদিন বাংলার মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়। এঁর সেই ব্যবস্থাপনার জন্য কবি উত্তরকালে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এইভাবে :

> যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

এই ব্যবস্থা কবির সাহিত্য-সাধনার জন্য বিশেষ অনুকূল হয়েছিল, কেননা,

পরে আমরা দেখব, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁর বাংলা রচনা সুপরিণতির দিকে গিয়েছিল। কবিও বলেছেন :

ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রই তার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয় ; পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারকরসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় সেটি হইবার জো নাই।

গৃহের শিক্ষা-ব্যবস্থা

স্কুল-কলেজের শিক্ষা কবির মনকে কোনোদিন আকর্ষণ করতে পারে নি। বার বার তিনি বলেছেন তিনি স্কুল-পালানো ছেলে। ছেলেবেলায় ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে তাঁর দিন কেমন অনেকটা বন্দীভাবে কাটত, একলা মনে জানালায় বসে কেমন করে তিনি দীর্ঘ সময় কাটাতেন জানালার বাইরে পুকুর-পাড়ের বটগাছ, নারকেল গাছ, দুই-চারটা ফুলের গাছ, পুকুরে-গুগলি-খেয়ে-বেড়ানো রাজহাঁস ও পাতিহাঁস, স্নানার্থীদের স্নানের বিচিত্র ভঙ্গি, এইসব দেখে—তার চিত্তগ্রাহী বর্ণনা তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে। কবি ছেলেবেলায় খুব শান্তপ্রকৃতির ছিলেন, বলা যায় অনেকটা কুনোও ছিলেন,—আকাশ আলো মেঘ গাছপালা, প্রকৃতির এইসব শোভা-সৌন্দর্য যতটা দেখতে পেতেন তাতেই একলা মনে এক অসাধারণ আনন্দের উদ্দীপনা অনুভব করতেন। সে-অনুভূতি এমন যে বড় হয়ে বার বার সে-সবের কথা তিনি স্মরণ করেছেন। সেই দিনের স্কুলের শিক্ষকদের রূঢ় ভাষা ও ব্যবহার আর সহপাঠীদের নির্যাতন যে এমন নির্বিরোধ ও সুকুমার প্রকৃতির বালকের মন স্কুলের প্রতি বিমুখ করে তুলবে এ অনেকটা স্বাভাবিক। একজন হৃদয়বান ও আদর্শবান শিক্ষকের স্মৃতি কিন্তু চিরদিন কবির মনে জাগরূক ছিল। তাঁর সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

(সেণ্ট জেবিয়ার্সের) ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি ছিল না ;—বোধকরি কিছুদিন তিনি আমাদের নিয়মিত শিক্ষকের বদলিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয়

ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা ছিল। বোধকরি সেই কারণে তাঁহার ক্লাশের শিক্ষায় ছাত্রগণ যথেষ্ট মনোযোগ করিত না। আমার বোধ হইত, ছাত্রদের সেই ঔদাসীন্যের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অনুভব করিতেন। কিন্তু নম্রভাবে প্রতিদিন তাহা সহ্য করিয়া লইতেন।......আধ ঘণ্টা আমাদের কাপি লিখিবার সময় ছিল—আমি তখন কলম হাতে লইয়া অন্যমনস্ক হইয়া যাহাতাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা এই ক্লাশের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণা করিয়া যাইতেছিলেন। বোধকরি তিনি দুই-তিনবার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে না। একসময় আমার পিছনে থামিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন এবং অত্যন্ত সস্নেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাগোর, তোমার কি শরীর ভাল নাই।"—বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভুলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বৃহৎ মনকে দেখিতে পাইতাম—আজও তাহা স্মরণ করিলে আমি যেন নিভৃত নিস্তব্ধ দেব-মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই।

স্কুলের শিক্ষা কবির জন্য ফলপ্রসূ না হলেও গৃহে তাঁর জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, তাকে সফল বলতে হবে। কবি লিখেছেন:

ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাষ্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে ওস্তাদ বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে তাঁরা গান শিখতেন। কিছুদিন সেকালের বিখ্যাত গায়ক যদুভট্টের কাছে গান শিখবার সুযোগও কবির হয়েছিল। যদুভট্ট সম্বন্ধে কবি বলেছেন—"গান তাঁর অন্তরের

সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল।" অবশ্য বিধিবদ্ধভাবে সংগীত-শিক্ষা কবির তেমন হয় নি। সেকথা কবি বহুবার বলেছেন। তবে কবি-প্রতিভার মতো সংগীত-প্রতিভাও ছিল তাঁর সহজাত। তিনি লিখেছেন—"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না।" ছেলেবেলায় তাঁর গান গাইবার সহজ পটুত্বে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি বলেছিলেন—"রবি আমাদের বাংলা দেশের বুলবুল।" সেই সহজাত প্রতিভার সঙ্গে এমন প্রতিভাবান সংগীতাচার্যের নৈকট্যলাভও যে তাঁর জীবনে ঘটেছিল এটি হয়েছিল এক অসাধারণ অনুকূল যোগ।

গৃহে তাঁদের জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থাও হয়েছিল। সে-সম্বন্ধে কবি লিখেছেন :

> প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্ত (ঘোষ ?) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নিচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নিচে নামিতে থাকে, এবং এইজন্যই জল টগ্‌বগ্‌ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তি লাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ-কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে-রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে-রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।
>
> ইহা ছাড়া, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো-এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। তার দিয়া জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের স্কুলঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।

ছেলেবেলাতেই যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল কবির ভিতরে জেগেছিল তাঁর জীবন ও প্রতিভায় এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। হয়ত এর প্রভাবেই জীবনে সহজভাবে এক প্রবল কল্পনা-শক্তির বশীভূত হয়েও কবি বাস্তববিমুখ কখনো হন নি। তাঁর রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য, কৃষি, ফলের চাষ, শিক্ষা, পল্লীসংগঠন

প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে উত্তরকালে তাঁর বহু সফল ও বিফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এসবের অর্থ অনেকটা বোঝা যায় তাঁর জীবনে কল্পনা ও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের এই আদি যোগের কথা ভাবলে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল সারাজীবনই তাঁর ভিতরে প্রবল ছিল।

মেঘনাদবধের মতো কাব্য যে প্রধানত ভাষা শিক্ষার জন্য অল্পবয়সে তাঁকে পড়তে হয়েছিল, এটি অবশ্য সেই শিক্ষার দুর্বল দিক বলেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু দোষের চাইতে গুণের ভাগ কবির এই ছেলেবেলাকার গৃহের শিক্ষা-ব্যবস্থায় যে বাস্তবিকই বেশি ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে দিয়ে ছেলেবেলায় কালিদাসের কুমারসম্ভব মুখস্থ করান, শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ তর্জমা করান, আর রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় তাঁকে সংস্কৃত শকুন্তলা পড়িয়ে দেন। এমন সহৃদয় ও দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকদের অধীনে শিক্ষালাভের সুযোগ শিক্ষার্থীদের জীবনে বিরল ঘটনা।

এসবের সঙ্গে অবশ্য ভাবতে হবে ছেলেবেলা থেকেই কবির গ্রহণ করবার অসাধারণ ক্ষমতার কথা,—গ্রহণ করবার ক্ষমতা প্রতিভার এক বড় লক্ষণ। তাঁর জীবনস্মৃতিতে আমরা দেখি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বই-পড়ার প্রবল নেশা—রাত জেগে বই পড়ছেন দেখে তাঁর বড়দিদি বাতি নিভিয়ে দিয়ে তাঁকে বিছানায় পাঠিয়ে দিতেন। সেই দিনের যত বাংলা বই—বৈষ্ণব পদাবলী ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সমেত*—সবই তিনি অল্পবয়সে পড়েছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী কতটা যত্ন নিয়ে তিনি পড়েছিলেন তার পরিচয় রয়েছে তাঁর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে।

সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল

গৃহের উৎকৃষ্ট শিক্ষা-ব্যবস্থা, কবির উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য (তার কথাও তিনি বলেছেন), তাঁর গ্রহণ করবার অসাধারণ ক্ষমতা, এসবের সঙ্গে যোগ ঘটেছিল

* তাঁর ২১ বৎসর বয়সের একটি লেখায় (অনধিকার—বিবিধ সংগ্রহ) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা পরে দেখবো এই বইখানি তাঁর চিত্তগঠনে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

আর একটি বড় ব্যাপারেরও—একটি উদ্দীপক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ছেলেবেলা থেকে কবির বেড়ে ওঠার স্থযোগ। সেই পরিমণ্ডলের মনোজ্ঞ বর্ণনা তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে। সেখানে অনেককে আমরা পাই ; তবে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন এই চারজন গুণী—অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, কবির অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, আর তাঁদের পরিবারের প্রিয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। কবির চিত্তগঠনে এঁদের কার কাছ থেকে কি ধরনের আনুকূল্য জীবন-প্রভাতে তাঁর লাভ হয়েছিল তার দিকে একটু তাকানো যাক।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮)

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী বন্ধু। যেমন ইংরেজি কাব্যে তেমনি বিভিন্ন যুগের বাংলা কাব্যে তাঁর অনুরাগ ছিল অনন্যসাধারণ। সেই অনুরাগ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন :

> আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ইঁহার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ইঁহার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিতে জানিতেন না। গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসাধারণ ছিল। ...উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ...সাহিত্য-ভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যের পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি দুর্লভ। অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যিক বোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত। ...বালকদের দলে তিনি বালক ছিলেন। দাদাদের সভা হইতে যখন অনেক রাত্রে বিদায় লইতেন তখন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া আমাদের স্কুলঘরে টানিয়া আনিয়াছি। সেখানেও রেড়ির তেলের মিট্‌মিটে আলোতে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুণ্ঠা ছিল না। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কত ইংরেজি কাব্যের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তাঁহাকে লইয়া কত তর্কবিতর্ক আলোচনা-সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সেই লেখার মধ্যে যদি সামান্যতম গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

চিত্তবিকাশের উষাকালে এমন সুপণ্ডিত ও হৃদয়বান্ ব্যক্তির এতটা আনুকূল্য লাভ কবির জীবনে একটা বড় রকমের শুভযোগ বলতে হবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৩৮-১৯২৫)

রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিকরূপেই পরিচিত। কিন্তু যৌবনে কবিরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সেইদিনের ভাবে-ভোলা আনন্দময় কবিমূর্তি 'জীবনস্মৃতি'তে হৃদ্য রূপ পেয়েছে। কবি লিখেছেন :

> বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন···বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘনঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তের আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই···বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম। কিন্তু···লাভ করিবার জন্য পুরাপুরি বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম—তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাবে-ভোলা, খুব অগোছালো অথচ অন্তরে অন্তরে আদর্শানুগত্যে দৃঢ়, প্রকৃতি যে কবির বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল তাঁর বহু রচনায় আমরা তা দেখব। দ্বিজেন্দ্রনাথের একদিনের উপদেশ কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে কেমন একটা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-কথা ব্যক্ত হয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র এই বর্জিত ছত্রগুলোয় :

> যখন আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল এবং দূষিতবুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই, এমন সময় একদিন বড়দাদা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মচর্যপালন সম্বন্ধে আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া

> দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমার মনে এমনি গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, ব্রহ্মচর্য হইতে স্খলন আমার কাছে বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াছিল। বোধকরি, এইজন্য বাল্যবয়সে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সঙ্কোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এই কয়েকটি ছত্রে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের উপরে প্রচুর আলোকপাত হয়েছে। পরে তার পরিচয় আমরা পাব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫)

রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনের বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবির অগ্রজদের মধ্যে বোধহয় সবচাইতে অর্থপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন।...তিনি আমাকে খুব একটা বড় রকমের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সেজন্য হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্তু প্রখর গ্রীষ্মের পরে বর্ষার যেমন প্রয়োজন, আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল।...শাসনের দ্বারা, পীড়নের দ্বারা, কানমলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দ্বারা, আমাকে যাহাকিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যতক্ষণ আমি আপনার মধ্যে আপনি ছাড়া না পাইয়াছি ততক্ষণ নিষ্ফল বেদনা ছাড়া আর কিছু লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে সমস্ত ভালো-মন্দের মধ্য দিয়া আমাকে আমার আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এবং তখন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের ফুল বিকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুবার বাঘ শিকারের মতো বিপজ্জনক কাজেও কিশোর রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই দু'টি শিকার-যাত্রার একটির বর্ণনা কবি দিয়েছেন এইভাবে :

আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে, হাতির পিঠে চড়ে।…তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরুর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বনেশে ব্যাপার হয় বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে থাবা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি গাঁ গাঁ শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চড়ে বসে মনের মধ্যে ছিল ঐ হাড়-গোড় ভাঙার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায়, বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে চাইতে লাগলুম এদিকে, ওদিকে।…ঢুকে পড়ল হাতি ঘনজঙ্গলের মধ্যে।…জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার (আমাদের সঙ্গের শিকারির) সবচেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। যেন মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বজ্রওয়ালা ঝড়ের ঝাপটা। আমাদের বেড়াল, কুকুর, শেয়াল-দেখা নজর—এ যে ঘাড়েগর্দানে একটা একরাশ মুরদ, অথচ তার ভার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে দুপুর বেলার রোদে চলল সে দৌড়ে। কী সুন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে ফসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভরপুর করে দেখবার জায়গা এই বটে—সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

'বসুন্ধরা' কবিতায় এক জায়গায় কবি বাঘের জীবন-লীলার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। তেমন বর্ণনার মূলে কবির ছেলেবেলাকার এমন অভিজ্ঞতা যে অনেকখানি তা বোঝা যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের দাদারা দিদিরা এবং বৌদিদিরাও নতুন অনেক-কিছুর প্রবর্তনা করেন। কিন্তু তাঁদেরও মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে বলা যায় বিপ্লবী। পরিবারের মেয়েদের অবরোধ প্রথম ঘোচান সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ। সেই ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরো অনেক দূর অগ্রসর হন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুইটি আরবী ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি থেকে গড়ের মাঠে যেতেন বিস্মিত জনতার সামনে দিয়ে, আর মাঠে গিয়ে বেগে ঘোড়া ছোটাতেন। একসময়ে পিয়ানো বাজিয়ে নতুন নতুন সুর তিনি তৈরি করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী সেই সুরগুলোতে কথা যোজনা করতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশী জাহাজ পরিচালনা ও সেক্ষেত্রে প্রায় সর্বস্বান্ত হওয়ার কথা সুবিদিত। একটি জাতীয় পোশাক উদ্ভাবনের ও প্রচলনের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন—তার সকৌতুক বর্ণনা কবির 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। এমন বিপ্লবের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কখনো দাঁড়ান নি। তবে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। বিচিত্র নতুন পথে চলার ক্লান্তিহীন উদ্যমের দৃষ্টান্ত যে কবির অজস্র ভাবে লাভ হয়েছিল তাঁর জ্যোতিদাদার কাছ থেকে তা স্বীকার করতে হবে। এক-সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাট্যকাররূপে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম করে বহুদূর অগ্রসর হন। কিন্তু প্রবল জাতীয়তার দিনে এবং নিজে আন্তরিকভাবে জাতীয়তার সমর্থক হয়েও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'অশ্রুমতী' নাটকে উদার মানবিকতার যে অপূর্ব সুর ধ্বনিত করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মহত্তর সৃষ্টির পথে তা অমূল্য পাথেয়ের কাজ করেছিল। যথাস্থানে সে-সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৪-৯৪)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী মনস্বিনী কাদম্বরী দেবী কিশোর কবির সাহিত্য-সাধনায় যে একজন বড় সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্ররচনায় বহুভাবে সেকথা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কবির সাহিত্য-সাধনায় তাঁর 'নতুন-বৌঠানে'র শ্রেষ্ঠদান হয়ত এই যে, সেদিনের নতুন কবি বিহারীলালের রচনার প্রতি তিনি তরুণ কবির সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের উপরে বিহারীলালের প্রভাব যে লক্ষণীয় হয়েছিল তার উল্লেখ কবির বহু লেখায় রয়েছে, আমাদের অনেক সমালোচকও সেকথা বলেছেন—সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সেকথা কিছু অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত করে বলতে চেষ্টা করেছেন। বিহারীলাল ছিলেন ভাবে-ভোলা কবি। বিশ্বপ্রকৃতি আর নিজের প্রেমপ্রীতিপূর্ণ অন্তর এই দুইকেই তিনি জানতেন—মানুষের সমাজের নানা ধরনের স্বার্থবোধ, খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি, এসব থেকে তিনি ছিলেন আশ্চর্যভাবে মুক্ত। বিহারীলালের এই ভাবে-ভোলা প্রেমপূর্ণ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের মনকে আকর্ষণ করেছিল। কবি তাঁর সম্বন্ধে

বলেছেন : "তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি।...আমি বালক হইলেও এমন একটি উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না।"

কিন্তু বিহারীলাল একালে জন্মালেও তাঁর মনটি ছিল প্রকৃতপক্ষে সেকালের। সৌন্দর্যের বা তাঁর ইষ্টের ধ্যানে নিঃশেষে ডুবে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল অনেকটা সহজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সংসার থেকে বিমুখ ছিলেন বাহ্যত, আর অল্পদিনেই প্রকাশ পেল—যদিও ভাবজগৎ তাঁর বেশি প্রিয় তবু সেই ভাব-বিভোরতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব ক্ষেত্রের মানুষ ও বাস্তব জগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বা তাদের সম্বন্ধে তাঁর চেতনা কম প্রবল নয়। নিজের প্রকৃতির এই বিশেষত্ব সম্পর্কে উত্তরকালে তিনি বহুভাবে বহু উক্তি করেন; তাঁর একখানি চিঠিতে আছে :

> আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে—আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিংবা উঁচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়।...ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে—এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়া একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলে উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে—আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামান্য ক্ষুধা নিবারণের জন্যে পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে। একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতনভাবে ভুলে থাকতে পারি নে। সেইজন্য প্রতিবারেই মফস্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার, কলকাতার জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি।

> সেখানে মানুষ ছাড়া সমস্ত সজীব প্রাণী জড়ের সমান হয়ে আসে। পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোন্‌টা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে ?

বিহারীলালের রচনার অজটিল কিন্তু প্রাণপূর্ণ ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির উপরে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের একালের সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের যে লক্ষণীয় ব্যবধান তার ভিতরে সেতুর কাজ করেছিলেন বিহারীলাল। কিন্তু বিহারীলালের প্রভাব সন্ধ্যাসঙ্গীতের সময় থেকেই কবি কাটিয়ে ওঠেন সেকথা তিনি নিজে বলেছেন—আমরাও তা দেখব।

অন্যান্য গুণী

অন্যান্য যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কিশোর মনকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কবির পিতার বন্ধু ও ভক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ। শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন

> ভালো লাগিবার শক্তি ইঁহার এতই অসাধারণ যে মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচক-পদলাভের ইনি একেবারেই অযোগ্য। বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসমাত্র বর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফ-দাড়ি-কামানো স্নিগ্ধ মধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারি গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার-ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

একটি দুর্লভ মানুষের ছবি বটে।

কবি বলেছেন: "গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার একটা গান ছিল 'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'। এই গানটি আমার

মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন।”

গণেন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই পরলোক গমন করেন। কিন্তু তাঁর প্রভাবময় মূর্তি, সাহিত্য, ললিতকলা ও জাতীয়চেতনার বিকাশের জন্য তাঁর অফুরন্ত উদ্যম, এসব কবির মন থেকে কখনো মুছে যায় নি। হিন্দুমেলার তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অসাধারণ জ্ঞানবত্তা ও সহৃদয়তার কথা, ছেলেবেলা থেকে তাঁর কৌতূহলোদ্দীপক রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়, এসব কবি তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। আর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সারল্য ও জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম যে কবির বালকমনে দাগ কেটেছিল তারও উল্লেখ ‘জীবনস্মৃতি’তে রয়েছে। উত্তরকালে রাজনারায়ণের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের চিন্তার উপরে যে বেশ জোরালো ধরনের হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাব।

রবীন্দ্রনাথের গুরুজনদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হিন্দুমেলা আর বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনও তরুণ রবীন্দ্রনাথের উপরে একধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সেসব সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ পরে পরে স্বতঃই আসবে।

স্বভাবদত্ত প্রতিভা

তা পরিবেশ যত উৎকৃষ্ট বা অর্থপূর্ণ হোক আর তার প্রভাব যত ব্যাপক ও গভীর হোক একথা যথার্থ যে স্বভাবদত্ত প্রতিভা তারও চাইতে উচ্চমর্যাদার ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেই স্বভাবদত্ত প্রতিভার সন্ধান নিতে গেলে আমরা দেখি—এই কবির জীবনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব বড় একটা জায়গা দখল করে আছে বিশ্বপ্রকৃতি। সেই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যময়তা চিরদিনই তাঁর চিত্তে সাড়া জাগিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির নির্মমতার রূপও তাঁর চোখে কম পড়ে নি,—কিন্তু সব মিলে সেই বিশ্ব-প্রকৃতির আশ্চর্য প্রাণবত্তা আর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য তাঁর মনপ্রাণকে চিরদিন জাগিয়ে রেখেছে। হাঁ—তন্দ্রাচ্ছন্ন করে নি—জাগিয়ে রেখেছে। এ সম্বন্ধে গদ্যে পদ্যে সংগীতে চিত্রে কত ভাবে যে মনের কথা ব্যক্ত করতে

তিনি চেষ্টা করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। তাঁর রচনা থেকে এই সম্পর্কিত কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

> বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত-প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল।

অন্যত্র :

> …দূরে দেখা যাইত তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতা শহরে নানা আকারের ও নানা আয়তনের উচ্চনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্বদিগন্তের পাণ্ডুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই-সকল অতিদূর বাড়ির ছাদে এক-একটা চিলেকোঠা উঁচু হইয়া থাকিত, মনে হইত, তাহারা যেন নিশ্চল তর্জনী তুলিয়া চোখ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহস্য আমার কাছে সংকেতে বলিবার চেষ্টা করিতেছে।…মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া 'চাই, চুড়ি চাই, খেলোনা চাই' হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

অন্যত্র :

> এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল…প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই

আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ারভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। ...কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল।

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির এই অপূর্ব রহস্যময় যোগ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো বেড়ে যায়—অন্ততঃ সে-যোগ কবির ভিতরে অপ্রবল হয় নি কখনো। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহ থেকে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে আছে :

দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে এমন অভিজ্ঞতা তোদের বোধহয় কখনো হয় নি। যদি হ'ত তাহলে বুঝতে পারতিস সে-অবস্থায় আপনার চতুর্দিককে গ্রহণ করবার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা আশ্চর্য বেড়ে ওঠে। তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায় আমাদের চতুর্দিকই কথা কচ্ছে। কেবল যদি কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের অন্তহীন বক্‌বক্ থামে তাহলেই সেই-সমস্ত বিচিত্র ভাষা আমাদের কানে আসে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরল লকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে—আমার মনটি আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, মেঘমুক্ত আলোক-পূর্ণ শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত উদার চতুর্দিকের সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থির-ভাবে বিরাজ করছে—আমি জানি আজ সন্ধের সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে। আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত··· এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে···আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, ···একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে—যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ

জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন —সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। এখানকার দিনগুলি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্নদ্বারা অঙ্কিত। আমাদের দুটো জীবন আছে—একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাব-লোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই, তখনি সেগুলি চোখে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি—আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে। কারণ, ভাষা তো কেবল আমার একলার নয়—ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে, আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি সাধারণে তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় না।

বিশ্বপ্রকৃতির নিবিড় স্পর্শ থেকে কবির যে কী অফুরন্ত, অতলস্পর্শ, অথচ অসাধারণভাবে চিত্ত-উদ্দীপক আনন্দ লাভ হ'ত কবির এইসব উক্তিতে রয়েছে তার অভ্রান্ত প্রমাণ।

বিশ্বপ্রকৃতির বা অনন্তের এই যে প্রভাব এর সঙ্গে কবির অন্তর্জীবনে কার্যকর হয়েছিল আরো দুটি বড় প্রভাব—জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর সদা-জাগ্রত কৌতূহল আর মানুষের জন্য, সমস্ত জগতের জন্য, তাঁর অফুরন্ত শুভ-কামনা—সেই শুভ কামনার বিচিত্র শুভসাধনায় রূপান্তরিত হবার জন্য অন্তরতম আকুতি। পরে পরে নানাভাবেই এসবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। বাল্যে ও কৈশোরে যে-সব মহাপ্রাণ ব্যক্তির নিবিড় সান্নিধ্য কবির লাভ হয়েছিল তাঁদের প্রভাব যেন আরো শক্তি সঞ্চার করেছিল তাঁর অন্তরের এই সুগভীর অনুভূতিতে, কৌতূহলে আর শুভকামনায় ও শুভসাধনায়।

আমাদের সেই বহুদিন পূর্বের আলোচনাটিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলাম দুইটি কথায়—অতিতীক্ষ্ণ অনুভূতি আর সন্ধানপরতা। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর শেষ বয়সের রচনা

'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্যে' রবীন্দ্র-প্রতিভার লক্ষণ সম্বন্ধে সেই ধরনের কথাই বলেছেন। (তাঁর উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু সেই দুইটি কথা খুব অর্থপূর্ণ হলেও তার চাইতে আমাদের নতুন ব্যবহৃত তিনটি কথা রবীন্দ্র-প্রতিভার কুঞ্জিকা হিসাবে বেশি সার্থক, এই আমাদের ধারণা হয়েছে।

অনন্তের গভীর বোধ, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অফুরন্ত কৌতূহল, আর সবার জন্য নিবিড় শুভকামনা, কবির অন্তরাত্মায় সক্রিয় এই তিনটি প্রভাবের প্রথমটিকে বলা যেতে পারে কবির ভারতীয় উত্তরাধিকার থেকে লব্ধ মহাসম্পদ, আর পরের দুটিকে বলা যেতে পারে, একালের বা ইয়োরোপের সাধনা থেকে লব্ধ পরম-অর্থপূর্ণ বৈভব। রাজা রামমোহন রায়ের কাল থেকে ইয়োরোপের এই শ্রেষ্ঠ বৈভবের দিকে শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা যেখান থেকেই লাভ হোক এই তিন মহাসম্পদের বা প্রভাবের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটেছিল কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে—সেইটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর প্রাণবত্তার ও বৈচিত্র্যের মূলে হয়ত সেই মহাযোগ।

কিশোর কবি

কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বিস্তৃতভাবেই উল্লেখ করেছেন কেমন করে খুব অল্প-বয়সে কবিতা, গান, নাটক, নিবন্ধ, এসব রচনা তিনি আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই অভিমতও তিনি ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর অপরিণত বয়সের সেই-সব রচনা বিলুপ্তিলাভেরই যোগ্য—সেই পথেই তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় সার্থক হতে পারবে। তাঁর সমঝদারেরা অনেকে কিন্তু সে-সম্বন্ধে কবির সঙ্গে একমত নন; তাঁদের ধারণা, কবির প্রতিভার ক্রমোৎকর্ষ বোঝবার জন্য কবির সেই-সব অপরিণত রচনাকে যত্নে রক্ষা করার, এবং তাদের চর্চা করারও, প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কবির শেষ বক্তব্য রূপ পায় তাঁর একটি ব্যঙ্গধর্মী কবিতায়—সেই কবিতাটি তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের বিশেষ স্মরণেরই যোগ্য। তার কিছু অংশ এই :

লিখিত লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখি নি ওজন দেখিতে মেপে
　　কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।

* *

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
　　আবর্জনারে বর্জন করি যদি

চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে,
"ঐতিহাসিক সূত্র কি দিবে টুটে,
　　যা ঘটেছে তাকে রাখা চাই নিরবধি।"

* *

জোড়হাত করে আমি বলি, "শোন কথা,
সৃষ্টির কাজে প্রকাশেরি ব্যগ্রতা,
　　ইতিহাসটারে গোপন করে সে রাখে।

স্বষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের বলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা,

জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণপাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কী ধোবার গাধা।”

স্বষ্টির কাজে প্রকাশেরই সত্যকার মর্যাদা, ইতিহাসের মর্যাদা সে তুলনায় অনেক কম, কবির এই অমূল্য সতর্কবাণী স্মরণে রেখে আমরা তাঁর রচনার, ও তাঁর ব্যক্তিত্বের, পরিচয় লাভের চেষ্টা করব। ইতিহাসের দিকে অবশ্য আমাদের কিছু কিছু তাকাতে হবে, কেননা, প্রকাশ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে ইতিহাসেরও যথার্থ স্থান কিছু আছে। কিন্তু সাহিত্যে মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রকাশ—যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ, অথবা পর্যাপ্ত, প্রকাশ—সেই প্রকাশ যেখানে হয় নি, অর্থাৎ, প্রকাশে যেখানে চমৎকারিত্ব দেখা দেয় নি, তার ঐতিহাসিক মূল্যের মায়া আমরা কাটাতে চেষ্টাই করব।—শুধু সাহিত্য নয়, সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাও ‘ধোবার গাধা’ হলে অবাঞ্ছিতই হয় বেশি—এ বোধ না থাকা শোচনীয়।

বনফুল

কবির ‘অচলিত রচনা-সংগ্রহে’ যে-সব রচনা স্থান পেয়েছে সে-সবের মধ্যে তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য ‘বনফুল’। এটি যখন প্রথম ‘জ্ঞানাঙ্কুর’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন কবির বয়স সাড়ে তের বৎসর। এটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর এগার থেকে বারো বৎসর বয়সের মধ্যে, রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে এই কথা বলা হয়েছে। এর আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই :

কমলা পিতার সঙ্গে কাননে পালিতা। পিতার মৃত্যুর পরে তার আপন কেউ রইল না। কিন্তু বনের গাছপালা ও পশুপক্ষীর সঙ্গে তার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েছে। বিজয় নামে একটি যুবক তাকে লোকালয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করল। কিন্তু বিয়ের অর্থ কমলা ভাল বোঝে না।

বিজয়ের বন্ধু নীরদকে সে ভালোবাসল,—অর্থাৎ নীরদের প্রতি কমলার

অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হল। নীরদ বললে, এমন ভালোবাসা পাপ—যদিও কমলার প্রতি তার অন্তরের অনুরাগ গভীর।

ঈর্ষার বশীভূত হয়ে বিজয় নীরদকে হত্যা করলে।

কমলা আবার বনে ফিরে গেল।

কমলা সম্বন্ধে বালক-কবি বলছেন :

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন ?
সংসার কণ্টক বনে পারিজাত ফুল।
নন্দনের বনে গিয়া, গাইবি খুলিয়া হিয়া
নন্দন মলয় বায়ু করিবি আকুল।

কিন্তু বনে এসে কমলা শান্তি পেলে না। একদিন গিরিশৃঙ্গ থেকে পড়ে তার দেহ পার্বত্য নদীর জলে ভেসে গেল।

প্রকৃতির প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে এতে—বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার প্রভাবে—মানুষের ধরন-ধারন সেই প্রকৃতির সঙ্গে সুসংগত নয়। এই প্রকৃতি-প্রেম কবির পরিণত প্রতিভায় কেমন রূপ নেয় সে-সবের সঙ্গে পরে পরে স্বভাবতই আমাদের পরিচয় হবে।

বর্ণনা বা চিন্তা কোনো-কিছুতেই তাঁর এই রচনায় কোনো বৈশিষ্ট্য যে প্রকাশ পায়নি তা না বল্লেও চলে। বিজয়ের বন্ধু নীরদের প্রতি কমলার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হল, আর তা অন্যেরা নিন্দিত বললেও সে তাতে নিন্দার কিছু দেখলে না, এই মনোভাব বালক-কবির পক্ষে কিছু বিশিষ্ট বটে। তবে কাব্যে বড় কথা প্রকাশের বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ পরিণত মনের প্রকাশের বৈশিষ্ট্য,—সেই বৈশিষ্ট্য এতে লক্ষণীয় ভাবেই অনুপস্থিত।

এই অল্প বয়সে বাংলা ভাষার উপরে কবির যতটা অধিকার দেখা যায় সেটি সহজেই চোখে পড়ে।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও বিহারীলালের ভাব ও ভাষার প্রভাব কবির ভাষায় সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবির মন বিকশিত হয় নি বলে সেই প্রভাবও ভাসাভাসা ধরনেরই হয়েছে—তার অতিরিক্ত কিছু হয় নি। যা সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হয় নি তার ইতিহাস বেশি খোজা অসার্থক বৈ আর কি।

কবিকাহিনী

'বনফুলে'র পরের কাব্য 'কবিকাহিনী'। কবির ষোল বৎসর বয়সকালে এটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এটি তার প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত কাব্য। সংক্ষেপে এর কাহিনীটি এই :

ছিল এক কবি, প্রকৃতির একান্ত ভক্ত—লক্ষ্য করত সে, নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।

কিন্তু প্রকৃতি তার মনের শূন্যতা দূর করতে পারল না।

একটি বনবালা এসে কবিকে আদর জানাল। কবি তার সান্নিধ্যে মুগ্ধ হল। কিন্তু কবির মনের হাহাকার ঘুচলো না। বিলাস-সুরা দিয়ে নিজেকে যে বিহ্বল করবে এও কবি চাইল না :

মিটাতে মনের তৃষ্ণা ত্রিভুবন পর্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাদের করিতে পূজা ক্ষমতা নাহিক বলে
বিসর্জন করিবারে পারিব না আমি।

কবির উপরে তাঁর পরিবেশের প্রভাব লক্ষণীয়।

কবি বেরোল পৃথিবী ভ্রমণে।—ফিরে এসে দেখলে বনবালা নলিনী মরে গেছে। তার অভাব সে খুব অনুভব করতে লাগল।

সে নাই, তার স্মৃতি অক্ষয় হোক এই হল কবির কামনা। সেই স্মৃতির প্রভাবে কবি অনুভব করলে—"যা কিছু সুন্দর দেখি তাহাই মঙ্গল।" ক্রমে কবি বৃদ্ধ হল—

সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে।

সে দেখলে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার নেই, প্রবল কেবলই অত্যাচার করছে। সে আশা পোষণ করলে—পৃথিবীতে একদিন শান্তি ও প্রেম আসবে।

'বনফুলে'র তুলনায় 'কবিকাহিনী'তে উদার চিন্তা বেশ মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। শেলীর চিন্তার প্রতিধ্বনি এতে রয়েছে। কবি এর এই উদারতার সুরকে পরিণত বয়সে ঠাট্টা করেছেন। অনেকটা ঠাট্টা করারই এ যোগ্য। উঁচুদরের চিন্তার উল্লেখ থাকলেই রচনা কাব্যরূপে আদর পাবার যোগ্য হয় না—কবিকাহিনী তার একটি ছোটখাটো প্রমাণ। এর ভাষা বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

এইকালে কবির হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতায়ও দেখা যায়, স্বদেশের দুর্দশায় তাঁর চিত্ত যথেষ্ট ব্যথিত। তবে সে-ব্যথা প্রকাশের ভাষা পায় নি। হেমচন্দ্রের ভঙ্গিতে কবি স্বদেশের দুর্ভাগ্যের জন্য সোচ্চার বিলাপ করেছেন।

বোঝা যাচ্ছে, পরিবেশের প্রভাবে কতকগুলো উঁচু চিন্তা অল্পবয়সেই কবির ভিতরে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই তুলনায় হৃদয়ের অনুভব-শক্তি তাঁর ভিতরে স্বভাবত ছিল অবিকশিত ; ভাষা-শক্তিও তাঁর লাভ হয় নি।

অন্যভাবে বলা যায়, কবির বাল্য ও কৈশোরের অমন উৎকৃষ্ট পরিবেশ তাঁর জন্য কিছু ক্ষতিকরও হয়েছিল—এর প্রভাবে যাকে বলা হয় অকালপক্কতা তাই কিছু পরিমাণে তাঁতে দেখা দেয়। কবি তাঁর তারুণ্যের এই ধরনের আপত্তিকর লক্ষণের কথা নিজেও অনেক জায়গায় বলেছেন।

কিন্তু কবির স্বভাবদত্ত প্রতিভা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের। তার প্রভাবে এই দোষ তিনি কাটিয়ে ওঠেন কয়েক বৎসরেই।

দেশীয় লোকদের দ্বারা পরিচালিত স্কুলেই হোক আর ইয়োরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত স্কুলেই হোক, কোনোখানেই কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা—অর্থাৎ তাঁর ইংরেজি শিক্ষা—আশানুরূপ ভাবে এগোলো না দেখে তাঁর গুরুজনেরা তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনার কথা ভাবেন। জীবনীকার প্রভাতবাবু বলেছেন, তখন বিলাতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলেই ব্যারিস্টারি পড়া সম্ভবপর হ'ত।

আমেদাবাদ

বিলাতে যাবার প্রস্তুতি হিসাবে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ আমেদাবাদে নিজের কাছে তাঁকে নিয়ে যান—তিনি সেখানে জজ ছিলেন। যে বাড়িতে

সত্যেন্দ্রনাথ বাস করতেন সেটি ছিল বাদশাহী আমলের এক প্রাসাদ। তিনি সেখানে একা বাস করছিলেন, কেননা, তাঁর পত্নী ও পুত্রকন্যা শীতের পূর্বে বিলাতে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন—সত্যেন্দ্রনাথও বিলাতে দীর্ঘ ছুটি যাপনের অপেক্ষায় ছিলেন। সুবিস্তৃত কিন্তু অগভীর সাবরমতী-তীরের এই প্রাচীন প্রাসাদের নির্জন কক্ষগুলো, জ্যোৎস্নালোকে এর সাবরমতীর দিকের বিস্তীর্ণ ছাদে পায়চারি, এসবে কবির অন্তর-প্রকৃতি খুব নাড়া খেতো। তিনি লিখেছেন: "এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের সুর দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম।" আর উত্তরকালে এই প্রাসাদের নির্জন কক্ষগুলোর স্মৃতি যে তাঁর সুবিখ্যাত 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির রচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিল তা অনেকেই জানেন।*

এখানে অনেকগুলো ইংরেজি বই তিনি পড়েন—অবশ্য অভিধানের সাহায্যে। আর সে-সব থেকে প্রাচীন ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আর ইয়োরোপের বিখ্যাত কবি দান্তে, পেত্রার্কা, গ্যেটে, এঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেন। এঁদের কারো কারো রচনা থেকে তিনি কিছু কিছু অনুবাদ করেন—এঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখেনও। কবির এইসব রচনা অবশ্য তেমন স্মরণীয় কিছু নয়। তবে অল্পবয়সেই তাঁর মনের দিগন্ত যে বহুদিকে প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল সেটি লক্ষ্য করবার মতো। বিশেষ করে গ্যেটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নানা দিক দিয়ে সুফলপ্রসূ হয়েছিল।

এখানে সংস্কৃত কবিদের রচনাও তিনি কিছু কিছু পড়তে চেষ্টা করেন। সংস্কৃত ছন্দের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য কবির মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে নানাভাবে কার্যকর হয়েছিল, পরে পরে তা আমরা দেখব।

বোম্বাই

বিলেত যাবার আগে ইংরেজি কথাবার্তায় ও চালচলনে কবিকে কিছুটা দুরস্ত করবার জন্য তাঁর দাদা বোম্বাইয়ের এক ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির অনুরাগী

* 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি পড়ে প্রাসাদটি যত বড় মনে হয় আসলে প্রাসাদটি তত বড় নয়—এটি মধ্যমাকৃতির। তবে সাবরমতী-তীরে এর অবস্থিতি আজো অপূর্ব। বর্তমানে এটি গুজরাট প্রদেশের রাজভবন।

পরিবারে তাঁকে কিছুকাল বাস করবার জন্য পাঠান। এই পরিবারের বিলাত-ফেরত কন্যা আনা তরখড় (অন্নপূর্ণা তরখড়) ইংরেজি কথাবার্তায় ও চালচলনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন; তাঁরই কাছ থেকে কবির নতুন শিক্ষা লাভ হয়। তিনি কবির চাইতে বয়সে অল্প কিছু বড় ছিলেন। কবি তাঁকে তাঁর নতুন লেখা 'কবিকাহিনী' ইংরেজিতে অনুবাদ করে করে শোনাতেন। কবির কাছে তিনি একটি ডাকনাম চেয়েছিলেন। কবি তাঁর নাম দেন নলিনী—একটি কবিতাও তাঁব সেই নাম অবলম্বন করে লেখেন। সেটি এক ভোরে তাঁকে ভৈরবী সুরে গেয়ে শোনালেন। আনা বললেন—"কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধহয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।"

কবির প্রতি এই তরুণীর অন্তরে যে কিছু অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল সে-কথা কবি উত্তরকালে সংগীত ও সাহিত্যক্ষেত্রে খ্যাতনামা দিলীপকুমার রায়কে বলেন।

কবি আনার সেই অনুরাগকে অশ্রদ্ধা করেন নি। কোনো মেয়ের ভালবাসাকেই কবি কখনো অশ্রদ্ধা করেন নি, একথা তিনি বলেছেন। আনার উদ্দেশ্যে আরো কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন তিনি। তবে তরুণ বয়সের এই অনুরাগ কবির মনের উপরে তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি—এটি কিছু আশ্চর্য হবার মতো ব্যাপার। এ সম্পর্কে একটু পরেই কিছু আলোচনা আমরা করব।

বিলাত-যাত্রা

এইভাবে কয়েকমাস কাটিয়ে কবি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বরে বিলাত যাত্রা করেন। যাত্রাপথের কিছু কিছু বর্ণনা আর ইংলণ্ডে গিয়ে তরুণ বয়সে তাঁর কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে-সব কথা তাঁর 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' ও 'জীবনস্মৃতি'তে রয়েছে। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র কিছু পরিচয় আমরা দিচ্ছি।

ইংলণ্ডে তাঁর অন্যতম বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা হচ্ছে লণ্ডন য়ুনিভারসিটি কলেজে অধ্যাপক মর্‌লির মুখে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনা। তাঁর অধ্যাপনা সম্বন্ধে কবি বলেছেন: "সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার সুরে প্রাণ

পেয়ে উঠত—আমাদের সেই মরমে পৌঁছত যেখানে প্রাণ চায় আপন খোরাক, মাঝখানে রসের কিছুই লোকসান হ'ত না।" এই কলেজে পড়েছিলেন তিনি তিনমাস। এখানেই লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে তিনি বন্ধুরূপে লাভ করেন। লোকেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বন্ধুদের অন্যতম। তাঁর প্রসঙ্গ যথাস্থানে হবে।

লণ্ডনে কবি কিছুকাল বাস করেছিলেন ডাক্তার স্কট নামক এক ভদ্রলোকের পরিবারে। কবির প্রতি সেই পরিবারের গৃহিণীর মায়ের মতো স্নেহ-মমতা, পরিবারের কন্যাদের আপনার জনের মতো ব্যবহার, অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে তাঁর জীবনস্মৃতিতে। পরবর্তীকালে এই পরিবারের ছোট দুটি কন্যা সম্বন্ধে কবি দিলীপরায়কে বলেছিলেন: "দুটি মেয়েই যে আমাকে ভালবাসত একথা আজ আমার কাছে একটুও ঝাপসা নেই—কিন্তু তখন যদি ছাই সে কথা বিশ্বাস করবার এতটুকুও মরাল কারেজ থাকত"।

কবি কৌতুক করে যাকে তাঁর মরাল কারেজের অভাব বলেছেন, আমাদের মনে হয়েছে, সেটি আসলে ছিল তাঁর এই কালের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় ব্রহ্মচর্য পালন সম্বন্ধে তাঁর বড়দাদার উপদেশ তাঁর উপরে কিভাবে কার্যকর হয়েছিল তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এর পরেই আমরা দেখব, তাঁর নতুন-বৌঠাকরুনের প্রভাবও কবিকে বিপজ্জনক পথ এড়িয়ে চলতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। কিন্তু এইসব প্রভাব যে কবির উপরে এতখানি কাজ করতে পেরেছিল তার মূলে হয়ত ছিল কবির বিশেষ প্রকৃতিই ;—সত্যকার 'প্রেম-চেতনা' তাঁতে এসেছিল বেশ দেরীতে,—হয়ত তাঁর 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলো রচনার কালে—এই আমাদের ধারণা হয়েছে। অবশ্য এসব অনুমান। তবে এই কালে নারী সম্বন্ধে কবির প্রকৃতির উপরে যে একটি সঙ্কোচের আবরণ রয়েছে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর তরুণ বয়সের 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কয়েকটি রচনায়ও—যেমন, 'মনের বাগান-বাড়ি'তে—এটি লক্ষ্য করা যায়। কবি নিজেও 'জীবনস্মৃতি'তে (বর্জিত অংশে) বলেছেন :

> এখনকার ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখিতে পাই যথার্থ ভাবে পরিণত হইয়া উঠিতে আমার সুদীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার

বালকবুদ্ধি আমাকে অনেকদিন ত্যাগ করে নাই—আমি অধিক বয়সেও নানা বিষয়ে অদ্ভুতরকম কাঁচা ছিলাম।

দিলীপ রায়কেও কবি এই ধরনের কথা বলেছিলেন।

কিন্তু ব্যারিস্টারি পড়া শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর হল না। সত্যেন্দ্রনাথের যখন দেশে ফিরবার সময় হল তখন মহর্ষির নির্দেশ গেল, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁর সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে। দেশে ফিরলেন কবি ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারিতে—তখন তাঁর বয়স পৌনে উনিশ।

বিলাতে তাঁর কাটে এক বৎসর কয়েক মাস কাল। কিন্তু এই প্রবাস নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল কবির জীবনে। বিলাতে ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ওদেশের কয়েকজন প্রখ্যাতা গায়িকার এবং কয়েকজন গায়কেরও সাধাগলার নৈপুণ্যে চমৎকৃত হয়ে। বিলাত থেকে ফিরে এসে তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গানগুলোয় ইয়োরাপীয় সুর তিনি কিছু কিছু ব্যবহার করেন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে। মনে হয়, সেই সাফল্যের মূলে অনেক পরিমাণে ছিল তাঁর নতুন সাধাগলা। ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবে এই কালে তাঁর কণ্ঠস্বরেও কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সংগীত-সাধনার দিকে তাকিয়ে মনে হয়, ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাব তাঁর সংগীতের উপরে লক্ষণীয় নয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞও তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে এই ধরনের মতই ব্যক্ত করেছেন। কবি নিজে এ সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে যা বলেছেন তাই তাঁর সুবিবেচিত মত বলে গণ্য করা যেতে পারে:

> য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিয়া খুব আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্বসম্পাতের দিক;—আর এক দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায়

অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হোক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারংবার মনের মধ্যে বলিয়া উঠিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে-চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে-চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্র-খচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিয়াছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহ-বেদনা ও নববসন্তের বনান্ত-প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

'বাল্মীকি-প্রতিভা'র যে অসাধারণ সাফল্যলাভ হয়েছিল তা মূলত এর নতুন ধরনের সংগীতের জন্য। কবি বলেছেন, 'একটা দস্তুরভাঙা গীতবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে' তাঁর 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' লেখা। সাহিত্যিক রচনা হিসাবে এর তেমন মূল্য কবি স্বীকার করেন নি। তবে করুণার উপরে এতে যে জোর পড়েছিল সেটি কবির একটি প্রধান ভাব। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' রচনাটি, সেকথা প্রভাতবাবু বলেছেন।

প্রভাতবাবু কবির এই বিলাতপ্রবাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "তিনি গিয়াছিলেন লাজুক বালক, ফিরিলেন প্রগল্‌ভ যুবক"। কথাটি বেশ চোখে পড়বার মতো। কিন্তু বিচার করে দেখলে বোঝা যায়, কথাটি কিছু সত্য, কিন্তু পুরোপুরি সত্য নয়। কবির এই কালের রচনাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁর যুবক রূপ অনেকটা ফুটেছে মাত্র তাঁর 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে', আর কোনো রচনায় তেমন নয়।

ভগ্নহৃদয়

'রুদ্রচণ্ড' ও 'ভগ্নহৃদয়' ('ভগ্নহৃদয়ে'র পত্তন হয় বিলাতে) ১৮৮১ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয় কবির দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে। সেই যাত্রা অবশ্য সফল হয় নি—কবি মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন।

'রুদ্রচণ্ডে'র কোনো উল্লেখ কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে করেন নি; কিন্তু 'ভগ্নহৃদয়' সম্পর্কে তিনি তাতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন মুখ্যত উক্ত কাব্যের দুর্বলতা সম্পর্কে। কিন্তু কবি যখন এটি লিখেছিলেন তখন তাঁর

ধারণা হয়েছিল লেখাটা খুব ভাল হয়েছে। সেকালের পাঠক-সমাজেও এই কাব্য সমাদর লাভ করেছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু প্রিয়নাথ সেন 'ভগ্নহৃদয়' পড়ে কবি সম্বন্ধে অনেকটা ভগ্নোৎসাহ হয়েছিলেন।

এই কাব্যের ভাবাতিশয্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি সেই কালে শুধু আমাদের দেশের শিক্ষিতদের ভাবাতিশয্যের কথা বলেন নি, ইংরেজি সাহিত্যেও যে ঐ বস্তুটি আমরা প্রচুর পরিমাণে পাই সেকথাও বলেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর বিচার যথার্থ। কবি গ্যেটেও তাঁর ছেলেবেলাকার রচনার আবেগ-প্রাবল্যের কথা বলতে গিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের এই ভাবাতিশয্যের কথা বলেছেন।

তবে সমস্ত ক্রটি সত্বেও কবির সংগীতরচনাশক্তির প্রথম উন্মেষ তাঁর এই 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যে এবং এই কালের 'শৈশবসংগীতে' লক্ষ্য করা যায়। 'ভগ্ন-হৃদয়ে'র কোনো কোনো গান কবির সংগীতসংগ্রহে স্থায়ী আসন পেয়েছে। এর কোনো কোনো চরণও চমৎকার কাব্য হয়ে উঠেছে, যেমন—

আকাশে হাসিবে চাঁদ নয়নে লাগিবে ঘোর,
ঘুমময় জাগরণে রজনী করিব ভোর।

'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী'র মতো 'ভগ্নহৃদয়ে'র নায়কও একজন ভাবে-বিভোর কবি। তার পরিচয় সম্পর্কে এই কাব্যের অন্য একজন নায়ক বলছে :

যে জন রেখেছে মন শূন্যের উপরে,
আপনারি ভাব নিয়া উলটিয়া পালটিয়া
দিনরাত যেই জন শূন্যে খেলা করে,
শূন্য বাতাসের পটে শত শত ছবি
মুছিতেছে, আঁকিতেছে—শতবার দেখিতেছে,
সেই এক মোহময় স্বপ্নময় কবি—

কিন্তু কবির প্রতি অনুরাগিণী মুরলা সেই কবির সম্বন্ধে বলছে :

স্নেহের সমুদ্র সেই কবি গো আমার,
অনন্ত স্নেহের ছায়ে আমারে রেখেছে পায়ে,
তাই যেন চিরকাল থাকে মুরলার।

বলা যায়, কিশোর রবীন্দ্রনাথে এই দুই রূপই প্রতিফলিত হয়েছিল।

এই কাব্যের বহু নায়ক-নায়িকার মধ্যে নলিনীকে মনে করা যায় কিছু বিশিষ্ট সৃষ্টি। সে নিজে কারো প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হতে চায় না—যে-সব তরুণ তার রূপে ও বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করে তাদের হৃদয় নিয়ে খেলা করতে, কখনো কখনো সেই সব হৃদয় দলিত করতে, সে ভালোবাসে। কিন্তু শেষে এমন সময় এল যখন তার পূর্বপ্রেমিকরা সবাই তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেল। কাব্যের শেষের দিকে নলিনী একা একা বলছে :

আজ আমি নিতান্ত একাকী,
কেহ নাই, কেহ নাই হায়।
শূন্য বাতায়নে বসি পথপানে চেয়ে থাকি
সকলেই গৃহমুখে চলে যায়—চলে যায়
নলিনীর কেহ নাই হায়!
পুরানো প্রণয়ী সাথে চোখে চোখে দেখা হলে
সরমে আকুল হয়ে তাড়াতাড়ি যায় চলে।
প্রণয়ের স্মৃতি শুধু অনুতাপরূপে জাগে,
ভুলিবারে চাহে যেন ভালো যে বাসিত আগে।
বিবাহ করেছে তারা, সুখেতে রয়েছে কিবা
ভাইবন্ধু মিলি সবে কাটাইছে নিশিদিবা।
সকলেই সুখে আছে যেদিকে ফিরিয়া চাই,
আমি শুধু করিতেছি কেহ নাই—কেহ নাই।

কবি বিলাতে এমন কোনো কোনো তরুণীর দেখা পেয়েছিলেন যারা ভালোবেসে বিবাহ-বন্ধনে ধরা দিতে চায় না বরং রূপ ও বাক্যজালের মোহ বিস্তার করে প্রেম নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসে—তাদেরই ছবি এই নলিনীতে তিনি আঁকতে চেষ্টা করেছেন।

অবশ্য আঁকায় যে তেমন কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নি তা দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের দিকে সহজ সকৌতুক ও সপ্রেম বা সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে না চেয়ে তিনি চেয়েছেন অনেকটা খুঁতখুঁতে দৃষ্টিতে।

'ভগ্নহৃদয়' উৎসর্গ করা হয় শ্রীমতী হে—কে। 'হে' নাকি গ্রীকদেবী হেকেটির আদ্যক্ষর, আর কবির নতুন-বৌঠাকরুন কাদম্বরী দেবী নাকি তাঁর খুব আপনার জনের সমাজে এই নামে পরিচিতা ছিলেন।—উৎসর্গপত্রের এই

স্তবকটিতে ব্যক্ত হয়েছে তরুণ রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর এই মনস্বিনী নতুন-বৌঠাকরুনের প্রভাবের বিশিষ্টতা :

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।
গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাকো তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্নধূমকেতুসম
দিশাহারা হইত যে অনন্ত আকাশতলে।*

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র

কবির য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে তঁরে এই কালের এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের পরিচয় আরও বেশি পাওয়া যায়, এবং সেই জন্য কবি উত্তরকালে তাঁর এই কালের এই মনোভাবের কড়া নিন্দা করেন। তাঁর সেই আত্ম-সমালোচনার কিছু অংশ এই :

---

* উৎসর্গের জন্য কবি প্রথমে লিখেছিলেন এই লাইনগুলো :

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি 'পরে ঢাল গো আলোক-ধারা।
ও মুখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।
কখনো বিপদে যদি ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি—এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিত-ধারা।

কিন্তু পরে কিছু বদলে এটি ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করেন। এই কবিই বলবার অধিকারী—

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।

হরিণ-বালকের প্রথম শিং উঠলে তার যে চাল হয় সেই উগ্র চাল প্রথমে কৈশোরের। বালক আপন বাল্যসীমা পেরোবার সময় সীমালঙ্ঘন করতে চায় লাফ দিয়ে। তার পরিচয় শুরু হয়েছিল 'মেঘনাদবধকাব্যে'র সমালোচনা যখন লিখেছিলেম পনেরো বছর বয়সে। এই সময়েই যাত্রা করেছি বিলেতে। চিঠি যেগুলো লিখেছিলুম তাতে খাঁটি সত্য বলার চেয়ে স্পর্ধা প্রকাশ পেয়েছে প্রবল বেগে। বাঙালির ছেলে প্রথম বিলেতে গেলে তার ভালো লাগবার অনেক কারণ ঘটে। সেটা স্বাভাবিক, সেটা ভালোই। কিন্তু কোমর বেঁধে বাহাদুরি করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উল্টো মূর্তি ধরতে হয়। বলতে হয়, আমি অন্য পাঁচজনের মতো নই, আমার ভালো লাগবার যোগ্য কোথাও কিছু নেই। সেটা যে চিত্তদৈন্যের লজ্জাকর লক্ষণ এবং অর্বাচীন মূঢ়তার শোচনীয় প্রমাণ, সেটা বোঝবার বয়স তখনো হয় নি।

কিন্তু সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' যে তরুণ কবির একটি বিশিষ্ট রচনা তা স্বীকার না করে উপায় নেই। এত কম বয়সে তাঁর অঙ্কনের দক্ষতা দেখে বাস্তবিকই চমৎকৃত হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গি তিনি যে এই বয়সেই অনেকখানি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে।

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'র কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি তাঁর রচনাবলী থেকে :

(তৃতীয় পত্র)

আমরা সেদিন ফ্যান্সি-বল অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানা রকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চারিদিকে ব্যাণ্ড বাজছে—ছ-সাত-শ সুন্দরী সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। ···একজন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে। একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন, একটা

লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। একজন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন, সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপকান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরিতে ঝকমকায়মান পাগড়ি, জরির কোমরবন্ধ—তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা হয়ত নয়, কিন্তু ধরা পড়বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না…

(চতুর্থ পত্র)

আমরা সেদিন হাউস অফ কমন্সে গিয়েছিলেম। …পরচুলাধারী স্পীকার মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মতো তাঁর সিংহাসনে উঠলেন। হাউসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ করলেন…দুই-একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সার্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হাউসে দাখিল করলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য ও দয়া যেন মাখানো। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সেদিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হাউসে অতি অল্প মেম্বারই অবশিষ্ট ছিলেন ; যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, এমন সময়ে গ্লাডস্টোন উঠলেন। গ্লাডস্টোন উঠবামাত্র সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গ্লাডস্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বার আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পুরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মতো গ্লাডস্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল। কিছুমাত্র চীৎকার তর্জনগর্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা ঘরের যেখানে যে কোনো লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পারছিল। গ্লাডস্টোনের কী একরকম দৃঢ় স্বরে বলবার ধরন আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতরে গিয়ে যেন জোর করে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়…

(পঞ্চম পত্র)

··একদিন আমাদের নবাগত বঙ্গযুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণসভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা মিস অমুকের বাহু গ্রহণ করে আহারের টেবিলে গিয়ে বসলেন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাই নে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারি নে। কোনো সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথাবার্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের উপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি। আমাদের বঙ্গযুবকটি মিসকে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত অনেক কথা জানালেন, বললেন, তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভালো লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে। শেষকালে দুই-একটি সাজানো কথাও বললেন। যথা, তিনি সুন্দরবনে বাঘ শিকার করতে গিয়ে একবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিসটি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভালো লেগেছে। তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেন ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন। "আহা, কী গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই একটি 'হাঁ না', যা এত মৃদু যে ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠনিঃসৃত অজস্র মধুধারা, যা অযাচিতভাবে মদিরার মতো শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।"

হয়তো বুঝতে পারছো, কী কী মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়।

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' প্রথমে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়ে রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে। কবির বক্তব্য—পত্রগুলোর এমন সংস্কার প্রয়োজনীয়। সেই মূল চিঠিগুলোতে ইয়োরোপীয় সমাজের প্রতি কটাক্ষ কম ছিল না, সেই সঙ্গে ওখানকার স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনও যথেষ্ট ছিল। জীবনীকার প্রভাতবাবুর ধারণা, কবির সেই দুঃসাহস তাঁর

গুরুজনদের অসন্তোষ উৎপাদন করেছিল আর হয়ত তার ফলেই কবির দেশে ফিরবার নির্দেশ যায়।

কবি অবশ্য খুশী হয়েই দেশে ফিরলেন, কেননা দেশের আকাশ-বাতাসের জন্য ভিতরে ভিতরে তাঁর মন লোলুপ হয়ে উঠেছিল।

ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান না হয়ে কবি দেশে ফিরলেন, আর ফিরে এসে দিন কাটাবার সুযোগ যে পেলেন গঙ্গাতীরের এক নিরালা বাড়িতে এতে তাঁর খুশির আর অন্ত রইল না—কবির প্রকৃতির এই দিকটা মনে রাখবার মতো। এর থেকে বুঝতে পারা যায় উদার বিশ্বপ্রকৃতি ও স্বদেশ তাঁর জন্য কত বড় সম্পদ ছিল।

পদ্যে শিল্পী হওয়ার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ গদ্যে শিল্পী হয়েছিলেন—তাঁর 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' তার এক প্রমাণ—এই ব্যাপারটি তাঁর কোনো কোনো আলোচক লক্ষ্য করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে, এর কারণ, নবযৌবনে বিচারধর্মী আধুনিক গদ্য তিনি অনেকটা তৈরি পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে। কিন্তু কাব্যে তাঁর আদর্শ ছিলেন বিহারীলাল। বিহারীলাল প্রতিভাবান কবি নিঃসন্দেহ; তাঁর ভাষাও সহজ সরল বাংলা ভাষা; কিন্তু তাঁর মনটি ঠিক একালের নয়, তাঁর কাব্য-ভাষাও একালের জটিল ভাব প্রকাশের উপযোগী নয়। একালের ভাব প্রকাশের উপযোগী কাব্য-ভাষা রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ভাবন করতে হয়েছিল—অথবা তাঁর হৃদয়-মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা উদ্‌ভাবিত হয়েছিল। তাই এক্ষেত্রে তাঁর কিছু সময় লাগা স্বাভাবিক। মধুসূদনের প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন, কেন, তা আমরা পরে দেখবো। তার ফলে মধুসূদনের সনেট-আদি তাঁর তেমন কাজে লাগে নি। পরে অবশ্য মধুসূদনের ভাষাও তাঁর কাজে লেগেছিল।

শৈশব সংগীত

এটি একটি কবিতা-সংগ্রহ, আকারে খুব ছোট নয়—এটি প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। এর ভূমিকায় কবি বলেন:

> এই গ্রন্থে আমার তের হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম…কবিতাগুলির স্থানে স্থানে অনেকটা পরিত্যাগ করিয়াছি…

এই পর্যন্ত বলিতে পারি আমি যাহার বিশেষ কিছু-না-কিছু গুণ না দেখিতে পাইয়াছি তাহা ছাপাই নাই।

পরবর্তীকালে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় নি।

এর অনেকগুলো কবিতা ও গান বোম্বাইতে লেখা মনে হয়। কবির বান্ধবী নলিনীর উদ্দেশ্যে লেখা কয়েকটি কবিতা ও গান এতে স্থান পেয়েছে। সেসবের মধ্যে যেটি সবচাইতে সুপরিচিত তার কয়েকটি চরণ এই:

শুন, নলিনী খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি।
দেখ, তোমারি দুয়ার 'পরে
সখি এসেছে তোমারি রবি।
... ...
সখি, শিশিরে মুখানি মাজি
সখি, লোহিত বসনে সাজি,
দেখ বিমল সরসী আরসীর 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে থেকে থেকে ধীরে হুইয়া পড়িয়া,
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।

এর 'ফুলের ধ্যান', 'অপ্সরা-প্রেম' এই দুইটি কবিতাও নলিনীর স্মৃতি বহন করছে এই প্রভাতবাবুর ধারণা। কিন্তু প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় এই তিনটির কোনোটি তা হয়ে ওঠে নি। এগুলোকে প্রীতির কবিতা বলা যেতে পারে—অবশ্য 'প্রীতি'র ভাবটি এযুগে কবির একটি লক্ষণীয় ভাব। তবে 'ফুলবালা' নামের দীর্ঘ কবিতাটির এই কয়েকটি চরণে প্রেমের দাহ ও দীপ্তি কিঞ্চিৎ অনুভব করা যায়:

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্ নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্ নে।

হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে, "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো
আজিও যাহা বলি নি!
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়,
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"

কিন্তু এতটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা 'শৈশব সংগীতে' কমই আছে। এর 'কামিনী ফুল' কবিতাটি উল্লেখযোগ্য ; তার শেষের অংশ এই :

হেন কোমলতাময় ফুল কি না-ছুঁলে নয়।
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া।
মানুষ পরশ ভরে শিহরিয়া সকাতরে,
ওই যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া!

নারী সম্পর্কে কবির এই কালের মনোভাব এতে রূপ পেয়েছে মনে হয়। কবির এই মনোভাব মহত্তর প্রকাশ লাভ করেছে তাঁর 'মানসী'র বিখ্যাত 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটিতে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এটিও ১২৯১ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে পাওয়া যাচ্ছে :

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ কবি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন। সেই সংগ্রহের মৈথিলী-মিশ্রিত ভাষা তাঁর পক্ষে দুর্বোধ ছিল, কিন্তু সেই জন্যই অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে তিনি তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

গাছের বীজের মধ্যে যে-অঙ্কুর প্রচ্ছন্ন ও মাটির নিচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি প্রকাণ্ড কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল, আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্যরত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালক-কবি চ্যাটার্টনের বিবরণ তিনি শুনেছিলেন।...চ্যাটার্টন নাকি প্রাচীন কবিদের এমন নকল করে কবিতা লিখেছিলেন যে অনেকেই তা ধরতে পারে নি। অবশেষে ষোল বৎসর বয়সে এই হতভাগ্য বালক-কবি আত্মহত্যা করেন। কবি বলেছেন:

ওই আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশে আনন্দে বাড়ির ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশী হইলাম।

এটি ঘটে ১২৮৪ সালে, অর্থাৎ কবির ষোল বৎসর বয়সে। দুই তিন বৎসর ধরে 'ভানুসিংহের পদাবলী' তিনি লেখেন।

তাঁর কিশোর বয়সের অন্যান্য অনেক রচনার মতো এটিরও প্রতি কবির কোনো মোহ ছিল না। তিনি বলেছেন:

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো

ঢালা সুর নাই, তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটা মাত্র।

কিন্তু প্রাচীন পদকর্তাদের মতো ভাবের আবেগ না থাকলেও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে পদের লালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য সত্যই বিস্ময়কর হয়েছে —যে বয়সে কবি এই পদগুলো রচনা করেছিলেন সেই বয়সের কথা ভাবলে সেই বিস্ময়বোধ আরো বাড়ে। কবি নিজে এর প্রতি প্রসন্নতা না দেখালেও তাঁর পাঠকরা এর শব্দের ও ছন্দের মাধুর্যে আজো মুগ্ধ না হয়ে পারে না। এর কয়েকটি চরণ আমরা উদ্ধৃত করছি :

সজনী গো,

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী রে,
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত
ঘনঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থরথর কম্পত দেহ।
ঘনঘন রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌ রিম্‌ঝিম্‌
বরখত নীরদ পুঞ্জ।
ঘোর গহন ঘন তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
বোলত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান।
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।

কবি এর দুটি কবিতা, 'মরণ' ও 'প্রশ্ন', তাঁর 'সঞ্চয়িতা'য় স্থান পাবার যোগ্য বিবেচনা করেছেন।

মোহিতলাল মজুমদার এর এই চার চরণে—

হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখ-উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়—

অসাধারণ কাব্য-সৌন্দর্য দেখেছেন। কিন্তু এও বলা যায়, কবি এখানে যা বলেছেন প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে তা প্রচলিত idea—প্রকাশভঙ্গিমায়ও তার অতিরিক্ত কিছু ব্যক্ত হয় নি।

আমাদের মনে হয়েছে, শ্রুতিসুখকরতাই 'ভানুসিংহের পদাবলী'র একমাত্র গুণ। সেটি অবশ্য কোনো উঁচুদরের সাহিত্যিক গুণ নয়; তবে এই কাব্যে তা একটি বিশিষ্ট গুণ হয়েছে একটি সুপরিচিত ও মনোজ্ঞ বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। কথকতাও জনপ্রিয় হয়েছিল এই গুণে।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু জন্ম-কবি নন, জন্ম-গায়কও, তার প্রথম পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে এই ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যে।

মোহিতলাল এর কোনো কোনো কবিতায় ইংরেজি কবিতার প্রভাব দেখেছেন। তেমন ছিটেফোঁটা প্রভাব থাকা আশ্চর্য নয়; বরং না থাকাই আশ্চর্য। কিন্তু ভানুসিংহের পদাবলীর জগৎ বৈষ্ণব পদাবলীর জগৎই—প্রধানত জয়দেব ও বিদ্যাপতির একজন আনন্দময় ও স্বচ্ছন্দগতি কিশোর অনুচর হয়ে কবি সেই জগতে বিচরণ করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতরে তাঁর কবি-জীবনের সূচনায় এই আত্মনিমজ্জন খুব অর্থপূর্ণ। পদলালিত্যে, ছন্দোমাধুর্যে এবং প্রীতির মোহন মন্ত্রে একটা বড় দীক্ষা এইভাবে তাঁর লাভ হয়েছিল। ইংরেজি কবিতার সঙ্গেও এই যুগে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজি কাব্যে যে মননের পরিচয় আছে তা আয়ত্ত করবার সময় তখনো তাঁর হয়নি। জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং বিহারীলাল, এই তিনজনকে জ্ঞান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম দীক্ষাগুরু—জয়দেব আর বিদ্যাপতি তাঁর শব্দের বোধ আর ছন্দের কান তৈরি করতে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

অবশ্য এতে কবির যে কিছু ক্ষতিও না হয়েছিল তা নয়। এর ফলে ললিতপদবিন্যাসের মায়া কাটাতে তাঁর সময় লেগেছিল। তবে মোটের

উপর লাভই তাঁর (এবং বাংলা সাহিত্যের) বেশি হয়েছিল। তার এক ভাল প্রমাণ আমাদের একালের এক শ্রেণীর কাব্য। তাতে শক্তির পরিচয় আছে ; কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রাণভূত ধারার সঙ্গে সম্পর্কের অভাবে তা দেশের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি। মধুসূদন দেশের মর্মের সঙ্গে এমন সম্পর্কশূন্য ছিলেন না।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১২৮৮ সালে। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে 'জীবন-স্মৃতি'তে বলা হয়েছে:—এক সময় কবির জ্যোতিদাদা ও কবির নতুন-বৌঠাকরুন দূরদেশে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। তখন তাঁদের তেতালার ছাদের ঘরগুলো শূন্য ছিল। কবি সেই সময় সেই ছাদ ও ঘরগুলো অধিকার করে তাঁর নির্জন দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন। এইরূপে যখন আপন মনে কবি একলা ছিলেন তখন অজানিতভাবে তাঁর কাব্যরচনার পুরোনো সংস্কারগুলো কেমন করে যেন খসে গেল। কবি লিখেছেন :

> আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তি লাভ করিল।··· আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল কবিতা শোনাইবার একজন মাত্র লোক তখন ছিলেন—অক্ষয়বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুশি হইয়া বিস্ময়প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অনুমোদন পাইয়া আমার পথ আরও প্রশস্ত হইয়া গেল।

কবি এ সম্বন্ধে আরও লিখেছেন যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের যে তিন মাত্রার ছন্দ, যেমন—

> একদিন দেব তরুণ তপন
> হেরিলেন সুরনদীর জলে
> অপরূপ এক কুমারীরতন
> খেলা করে নীল নলিনীদলে—

কবি সেই ছন্দে কবিতা লিখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু এবার লিখলেন অন্য ধরনের ছন্দে, যেমন—

এই যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
একি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছেন :

সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সেসময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না।

পরবর্তীকালে কবি সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলোকে তাঁর স্থায়ী কাব্য-সংগ্রহে স্থান দিতে চান নি।

কিন্তু সেদিনের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমঝদার, যেমন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁরা সবাই সন্ধ্যাসঙ্গীতের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কোনো কবিতা এ যুগেও প্রশংসা পাবার যোগ্য। জায়গায় জায়গায় কবির বাণী লক্ষণীয়ভাবে তীক্ষ্ণ ও বিশিষ্ট হয়েছে। তবে কথার তেমন বাঁধুনি সর্বত্র যে নেই তাও সত্য।

এর 'আমি-হারা' কবিতাটিকে জ্ঞান করা যেতে পারে এই কাব্যের সব চাইতে বিশিষ্ট কবিতা। তাতে দেখা যাচ্ছে, অল্প বয়সেই কবি নিজের ভিতরে যে কবি-সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন সেটি তাঁর গভীর আনন্দের কারণ হয়েছিল। কবি আপনার সেই আনন্দময় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে—

জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিল রে হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত রে অরুণ-দোলায়।
হাসি তার ললাটে ফুটিত
হাসি তার ভাসিত নয়নে,

হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধর-শয়নে।···
···　　···　　···
বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখিটির মত
হরষে করিত শুধু গান
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে
দুলিত রে অরুণ-দোলায় ?
সচেতন অরুণকিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

সে আমার সুকুমার আমি—এই চরণে অনুভব ও প্রকাশ দুইই চমৎকার হয়েছে। এমন সুকুমারত্ব বিহারীলালের ভাষায় ঠিক নেই।

কিন্তু কবির সেই আনন্দময় সত্তার মধ্যে কালে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল—সেই আনন্দে দিন কাটানো তাঁর ঘুচে গেল :

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্যআঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পায়ে পায়ে বাজিতেছে বাধা,
তরুশাখা লাগিছে মাথায়।

চারিদিকে মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা সে শিশিরমাথা ফুল
কোথা সে প্রভাত-রবিকর।"

কবির আনন্দময় কৈশোর কেটে গেছে, কিন্তু যৌবন তার সমস্ত শক্তি নিয়ে পুরোপুরি আসে নি, এই অবস্থায় কেমন একটা অস্বস্তি কেমন একটা নিরানন্দভাব নিয়ে কবির দিন কাটছে—সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলোর মধ্যে সেই ভাবটি বিশেষ লক্ষণীয় হয়েছে।

কবি গ্যেটের ভিতরেও যৌবনের প্রারম্ভে এমন অস্বস্তি ও বিষাদ-ভাব দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মচরিতে বলেছেন, সেই অস্বস্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথাও তিনি ভাবতেন। রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তিবোধ কখনো তত তীব্র হয়েছিল কিনা তা জানা যায় নি। তবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে—যে ছিল জ্যোতির্বিন্দু, হাসি ভিন্ন যে আর কিছু জানত না, সেই তারকার অন্তরে কি এক অসন্তোষের উদয় হল, সে হঠাৎ আঁধার সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারকার সেই আত্মহত্যা লক্ষ্য করে কবি নিজেকে বলছেন—

গেল, গেল, ডুবে গেল তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে—
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ঐ মৃত তারাটির পাশে,
ঐ আঁধার সাগরে
এই গভীর নিশীথে,
ওই অতল আকাশে।

নবযৌবনে এমন অস্বস্তিবোধ, চারপাশের সঙ্গে কেমন একটা অবনিবনাও, অনেকেরই ভিতরে দেখা দেয়। যাদের শক্তি বেশি, বিকাশ-সম্ভাবনা প্রচুর, তাদের ভিতরে সেই অস্বস্তি আরো তীব্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জীবনীকার প্রভাতবাবু বলতে চেয়েছেন, কবি যে এই কালে খুব বিষাদে বা অস্বস্তিতেই

দিন কাটিয়েছিলেন তা নয়, তাঁর এই যুগের কতকগুলো রচনায় কোনো বিষাদ বা অস্বস্তির পরিচয় নেই। দৃষ্টান্তগুলো দেখিয়ে মোটের উপর তিনি ভালোই করেছেন। কিন্তু কবির এই যুগের রচনাগুলোর মূলসুর যে বিষাদমাখা বা অস্বস্তিমাখা তা স্বীকার করতে হবে। তাঁর সম্বন্ধে পরিজনদের নৈরাশ্যবোধ, তাঁদের কতকটা অনাদর, কবির এই বিষাদ বা অস্বস্তির আংশিক কারণ হতে পারে; কিন্তু মূল কারণটা আরো গভীরে। তা না হলে এর পরেই প্রভাতসঙ্গীতে আনন্দের ও আবেগের যে বন্যার সাক্ষাৎ আমরা পাই, সেটি সম্ভবপর হতো না।

আরো একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করবার আছে। বিষাদ, অস্বস্তি, এসব সন্ধ্যাসঙ্গীতে যতই ব্যক্ত হোক, কবির আত্মপ্রত্যয়, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যে তাঁর সহজাত আনন্দ, এসবও যে তাঁর মধ্যে জোরালো তারও পরিচয় সন্ধ্যাসঙ্গীতে রয়েছে। এ সম্পর্কে এর 'অনুগ্রহ' ও 'আবার' এই দুইটি কবিতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এর 'দুই দিন' কবিতাটিতে কবির ইংল্যাণ্ডে ও স্কট-পরিবারে বাসের স্মৃতি রূপ পেয়েছে। সেই পরিবারের একটি কন্যার মুখ কবির মনের পটে যে ভালোভাবেই আঁকা পড়েছিল, সে কথা বোঝা যাচ্ছে:

শতফুলদলে গড়া সেই মুখ তার
স্বপনেতে প্রতিনিশি হৃদয়ে উদিবে আসি
এলানো আকুল কেশে আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নক্ষত্র-গ্রহের মতো উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে, রেখা রেখা সেই মুখ তার,
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুমঘোরে,
"যাবে তবে? যাবে?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।

এ প্রেমে তীব্রতা নেই; কিন্তু গভীরতারও অভাব নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ অনন্তের প্রেমিক অনেকখানি—তাতে তাঁর প্রেম সহজেই তীব্রতা হারায়, তীব্রতা হারিয়ে আনন্দময় স্মৃতির রূপ নেয়।—যাঁরা কোনো না কোনো সময়ে কবির প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন:

জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।

সন্ধ্যাসঙ্গীত যে এর পূর্বে লিখিত শৈশবসঙ্গীত ও ভগ্নতরীর তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী তা বোঝা যাচ্ছে।—অবশ্য সেই শক্তির পরিচয় প্রধানতঃ এর অনেকগুলো চরণে। রবীন্দ্রনাথকে সত্যকার কিশোরকবি বা তরুণ কবি রূপে, অর্থাৎ মহৎপ্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বিকাশোন্মুখ কবি রূপে, আমরা পাই সন্ধ্যাসঙ্গীতে, প্রভাতসঙ্গীতে আর ছবি ও গানে। তাঁর আগেকার রচনাগুলো—তাঁর নিজের কথায়—"মডেল লেখা নকল করবার সাধনা"। তবে তারও মধ্যে কখনো কখনো প্রতিশ্রুতির পরিচয় যে পাওয়া না গেছে তা নয়।

প্রভাতসঙ্গীত

প্রভাতসঙ্গীত প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালের বৈশাখে। এর প্রথম সংস্করণের কয়েকটি কবিতা পরে এই বই থেকে বাদ দেওয়া হয়; কোনো কোনো কবিতা অংশত পুনর্লিখিত হয়।

এর প্রথম কবিতা আহ্বানসঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে, যে বিষাদ অস্বস্তি ও অস্বাভাবিকতার জাল তাঁকে ঘিরে ধরেছিল তা থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, বেরিয়ে এসে সমস্ত জগতের আনন্দময় আহ্বানগীত শুনতে পেয়েছেন। এই আহ্বান অবশ্য তাঁর কানে নতুন নয়; তবে মাঝখানে এটি যেন হারিয়ে গিয়েছিল। এই আহ্বানের কথা বার বার তাঁর কাব্যে আমরা শুনব, তার কারণ, মুখ্যত তিনি উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙলার ও ভারতের নবজাগরণের কবি।

এর সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি—তার অনুপূরক 'প্রভাত-উৎসব'। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন:

> …একটু একটু করিয়া বৌঠাকুরানীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময় আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কী উলটপালট হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্ণের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র।

কবির এই আনন্দ-অনুভূতি অচিরেই খুব মনে রাখবার মতো হয়ে তাঁর কাছে প্রকাশ পেল। সেই অবিস্মরণীয় দিনের বর্ণনা কবি দিয়েছেন এইভাবে :

সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে……একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।

কবি আরও লিখেছেন :

সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না……আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত, সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম……কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল।

সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখা—এই কথাটি লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষিদেব উপনিষদ থেকে পেয়েছিলেন এই তত্ত্ব—

আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি : যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ। এই তত্ত্ব তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ, এই তত্ত্বের সত্যতা তিনি সাধনার দ্বারা জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জগৎ যে অপূর্ব-আনন্দময় ও সৌন্দর্যময় এই সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অর্থাৎ এই অনেকটা মরমী চেতনায় তাঁর চিত্ত উদ্‌ভাসিত হয়েছিল, নবযৌবনেই। অনন্তের বা বিশ্বজগতের এই অপূর্ব আনন্দরূপের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের যে লাভ হয়েছিল সহজভাবে, কোনো গ্রন্থের বা গুরুর মাধ্যমে নয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই বিষয়ে যোগ্যভাবে অবহিত না হলে তাঁর সৃষ্টির খুব বড় অংশই হেঁয়ালি মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর রচনার অপূর্ব প্রাণশক্তির মূলে তাঁর এই অপরোক্ষ অনুভূতি। এই অনুভূতি কখনো তাঁর ভিতরে ম্লান হয় নি।

অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে : এই উপলব্ধি আসলে কী। এ কি মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটি অলক্ষিত কিন্তু মোটের উপর সাধারণ সত্য, না, কোনো কোনো ব্যক্তির ভিতরকার একটি অ-সাধারণ প্রবণতা। এর উত্তরে বলা যায় : এই দুইই সত্য। এক হিসাবে এমন উপলব্ধি মানুষের জীবনে সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না, আর এক হিসাবে এটি বিরল বা অ-সাধারণ কিছু নয়। অনন্ত বা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে চমক বোধ করা মানুষের জীবনের সাধারণ ঘটনা; কিন্তু অধিকাংশ মানুষের জীবনে সেই চমক ক্ষণস্থায়ী—জীবনের উপরে তা সাধারণত তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু কারো কারো জীবনে এই চমক স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে—ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর এই গভীর চেতনা থেকে তাঁর লাভ হয়েছিল শুধু অফুরন্ত সৌন্দর্যবোধ নয়, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ব্যাপক সচেতনতাও। সেই সচেতনতা পরে পরে শক্তি সঞ্চার করে তাঁর ভগবদ্‌বোধে, আর সমস্ত জগতের জন্য কল্যাণ-কামনায় ও কল্যাণ-সাধনায়। সে সবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে দেখা যাচ্ছে কবির অন্তরে খুব একটা আনন্দের ও প্রেমের আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে—সেই আবেগের বশে কবি সমস্ত জগৎটাকে একান্ত আপনার মনে করছেন, তিনি বলছেন—"জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।" কিন্তু এমন আবেগ খুব একটা প্রবল সত্যবস্তু হলেও সত্যকার

সাহিত্যিক সৃষ্টি এর দ্বারা সম্ভবপর নয়। সে-সৃষ্টি সম্ভবপর সেই দৃষ্টির সাহায্যে যে-দৃষ্টির সামনে বিরাট জগৎ বিচিত্র ও বিশিষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই সঙ্গে সব-কিছুর মধ্যে একটা রহস্যময় যোগও অনুভব করা যাচ্ছে।

কিন্তু প্রধানত একটি আবেগময় কবিতা হয়েও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' পাঠকদের দরবারে রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলেই গৃহীত হয়েছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অনুপূরক কবিতা 'প্রভাত-উৎসবে'ও এক অসাধারণ আবেগময় আত্মোপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে—

কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি উষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ-চরাচরে।

কিন্তু সেটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো সমাদর পায় নি।—মনে হয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মধ্যে যে একটি ছবি আছে—একটি দুর্বারগতি পার্বত্য ঝরনা সমতলে নেমে নদীতে পরিণত হয়েছে আর নদীরূপে বিচিত্র দেশদেশান্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মহাসাগরে গিয়ে মিলেছে—এই মনোহর ছবিটি এই কবিতাটির জনপ্রিয়তার মূলে অনেকখানি। এই চিত্রটি কালে কালে কবির বিপুল ও বিচিত্র জীবনের প্রতীক হয়েও দেখা দিয়েছে—কবি যেন সেই বহুদিন পূর্বে হঠাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন আপন বিরাট সম্ভাবনা।

টেনিসনের The Brook কবিতাটির সঙ্গে এর কিছু মিল আছে। কিন্তু The Brook-এর সঙ্গে তুলনায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের আবেগ অনেক বেশি। এর সত্যকার মিল বরং গ্যেটের মোহম্মদের গান Mahomet's Gesang* কবিতাটির সঙ্গে। তাতেও আঁকা হয়েছে এক পার্বত্য ঝরনার সমতলে

* কবিগুরু গ্যেটে প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নেমে নদী হয়ে আরো বহু ঝরনাকে সঙ্গে নিয়ে তীরে তীরে নানা শহর ও লোকালয় সৃষ্টি করে অন্তিমে সাগরের সঙ্গে মিলিত হবার চিত্র।

রচনা হিসাবে নিখুঁত না হয়েও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ যে একটি স্মরণীয় কবিতা হয়েছে, এর থেকে স্মরণীয় বা ভালো কবিতার এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা আমরা নির্দেশ করতে পারি: স্মরণীয় কবিতার মূলে অকৃত্রিম অনুভূতি-সম্পদ আর কিছু চিত্রসম্পদ। কিন্তু কিছু চিত্রসম্পদ বলতে আসলে অনেকখানি সুসম্বদ্ধ চিত্রসম্পদই বোঝায়। মূল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি পরে পরে যথেষ্ট কাটছাঁটের ফলে তার বর্তমান জনপ্রিয় রূপ পেয়েছে।

প্রভাতসঙ্গীতের কতকগুলি কবিতার বিষয় বেশ গম্ভীর, যেমন. অনন্ত জীবন, অনন্ত মরণ, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। কিন্তু কবি পরবর্তীকালে বলেছেন, এ সব চিন্তা যখন তাঁর মনে খেলেছিল তখনও কি গদ্যে, কি পদ্যে এসব যোগ্যভাবে প্রকাশ করবার সামর্থ্য তাঁর লাভ হয় নি। তা না হলেও এসব কবিতার কোনো কোনো চরণ, বিশেষ করে 'অনন্ত জীবনে'র অনেকগুলো চরণ, আমাদের মনকে বেশ আকর্ষণ করে। কবি পরবর্তী জীবনে লিখেছিলেন— "জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা"; সেই কথাই এখানে কিছু অপটুভাবে বলা হয়েছে।

এর 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির অর্থোদ্ধার করা কঠিন। চারদিক রহস্যে পূর্ণ, সৌন্দর্যের, সত্যের, একটা আভাস কবি পাচ্ছেন, কিন্তু তার বেশি কিছু পাচ্ছেন না—সেই আভাসকে কি কবি বলেছেন প্রতিধ্বনি?

এর শেষের কবিতাগুলোয় দেখা যাচ্ছে, দুঃখ ও অস্বস্তি-বোধ থেকে কবির যে মুক্তিলাভ হয়েছে সেই গভীর মুক্তি কবি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে অনুভব করছেন।

গভীর আবেগ, গভীর অনুভূতি, এসবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে প্রভাত-সঙ্গীতে, কিন্তু সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় যে দৃষ্টির স্বচ্ছতা তা এসেছে পরে।

ছবি ও গান

প্রভাতসঙ্গীত প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদা ও নতুন-বৌঠাকরুনের সঙ্গে বোম্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী মনোরম কারোয়ারে

কিছুদিন কাটান। কারোয়ার 'এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ'—সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে বদলি হয়েছিলেন। এই কারোয়ারে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কিছু ব্যঙ্গরচনা, 'ছবি ও গানে'র কিছু কিছু কবিতা, বিশেষ করে 'পূর্ণিমায়' কবিতাটি এখানে তাঁর হাতে রূপ পায়।

কারোয়ার থেকে ফেরার কিছুদিন পরে ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে কবির বিবাহ হয়। তাঁর পত্নী মৃণালিনী দেবীর বয়স (পিতৃগৃহে তাঁর নাম ছিল ভবতারিণী) তখন এগারো বৎসর। আর বিয়ের কয়েকমাস পরে ফাল্গুনে তাঁর 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয়।

এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি বলেছেন: চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সারকুলার রোডের একটি বাগানবাড়ীতে তাঁরা তখন বাস করছিলেন। তার দক্ষিণদিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। কবি অনেক সময়ই দোতালার জানালার কাছে বসে সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখতেন। তাদের সমস্ত দিনের নানা-প্রকার কাজ, খেলা ও আনাগোনা দেখতে তাঁর ভারি ভালো লাগত—সে সব যেন তাঁর কাছে বিচিত্র গল্পের মত ছিল। কবির উক্তি:

> নানা জিনিসকে দেখিবার যে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।......তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তখন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই, তাই কেবলই রঙ ছড়াইয়া পড়িত।

'ছবি ও গানে' কবি যে দক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠেন নি তা যথার্থ। কিন্তু সন্ধ্যাসঙ্গীত ও প্রভাতসঙ্গীতের মতো এতেও কিছু কিছু উৎকৃষ্ট চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঘুমন্ত শিশুদের এই চিত্রটি কবি এঁকেছেন:

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলাধুলা সব গেছে ভুলি।
ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়
ঘুম এনে দেয় আঁখিপাতে

শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে
ঘুমায়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছে রে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বার বার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।

* * *

কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
প্রভাতের আলো জাগি, যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে একসাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখিতে গান গায়।

প্রতিদিনের জীবনের অনেক ছোটখাটো ব্যাপার কবির চোখে পড়েছে, কিন্তু তাঁর মন এক সীমাহীন আনন্দের আবেশে বিভোর। তাই ছবি যা খানিকটা ফোটাচ্ছেন পরক্ষণে তা অনেকটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কবির এই তলকূলহীন ভাব-বিহ্বলতা রূপ পেয়েছে তাঁর 'পূর্ণিমায়' কবিতাটিতে:

যাই যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।
কোন্‌খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে,
কোথা হয়ে যাই নিমগন।

* *

গান নাই কথা নাই
শব্দ নাই স্পর্শ নাই
নাই ঘুম নাই জাগরণ।

কোথা কিছু নাহি জাগে
সর্বাঙ্গে জোছনা লাগে
সর্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীল শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—
নিশীথের মাঝে শুধু
মহান একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায়।

ছবি ও গানের কবিতাগুলো লিখবার সময় এক প্রবল ভাবোন্মত্ততায় কবির দিন কাটত। সে সম্বন্ধে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যুবক প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন :

আমার 'ছবি ও গান' যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম……আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষ্যাপামি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মতো এসে পড়েছিল। আমি জানতুম না আমি কোথায় যাচ্ছি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক-রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবল একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না।……সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আর কোনো পুরোনো লেখায় হয় না।……আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা

হচ্ছে Shelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylrak.

একটা অপূর্ব নবযৌবনের চিত্র বটে! গ্যেটের নবযৌবনের চিত্রও অপূর্ব রূপ পেয়েছে তাঁর আত্মচরিতে।*

উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটিতে কবি সম্বন্ধে একটি বড় সত্য রূপ পেয়েছে: একই সঙ্গে কবির মধ্যে রয়েছে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশযাত্রারও প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অনেক সমালোচক তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশযাত্রার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যই দেখেছেন, সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাও যে তাঁর মধ্যে প্রবল সেদিকে তাঁদের দৃষ্টি তেমন যায় নি।

কিন্তু কবি এই কালে তাঁর ভিতরকার যে অসাধারণ আনন্দ-উন্মাদনার কথা বলেছেন, তাঁর কতকগুলো কবিতায় (যেমন, পাগল, মাতাল, পূর্ণিমায়) তার পরিচয় পেলেও অনেকগুলোতে ঠিক সেটি আমরা পাই না—অনেক-গুলোতে যা পাই তাকে বলা যায়, আনন্দ-উন্মত্ততা নয়, যেন আনন্দ-সাগরে নিমজ্জন-দশা।

সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মধ্যে এমন আত্মনিমজ্জন সোনার তরী ও চিত্রার অনেক কবিতায় আমরা দেখব, আবার অন্য রকমের নিমজ্জন দেখব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্যে। অবশ্য ভাবে এমন ডুবে যাওয়ার দশায় ভাব-প্রকাশ উচ্চাঙ্গের না হবার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু এও সত্য যে যাকে আমরা ভাবে-নিমজ্জন-দশা বলেছি তাকে যোগ্যভাবে ব্যক্ত করতে পারা শিল্প-কৌশলের এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। ভাবে এমন নিমজ্জন-দশা—তা প্রকৃতির সৌন্দর্যেই হোক, মহতের পূজায়ই হোক, অথবা ভগবৎ-চেতনাতেই হোক—রবীন্দ্রসাহিত্যে যে যোগ্য রূপ পেয়েছে সেইটি এর কৌলীন্যের এক বড় হেতু।

এর 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ এতে রবীন্দ্রনাথের বাস্তববোধের পরাকাষ্ঠা দেখেছেন। কিন্তু এটি

* কবিগুরু গ্যেটের 'তরুণ কবি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়েছে, কবি এতে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ কথাই বলতে চেয়েছেন—অবশ্য বলেছেন কিছু ফলাও করে, হয়ত ব্যঙ্গ করবার প্রবৃত্তি থেকে। সেই কথাটি এই : যে প্রেম অত্যন্ত গরজে কেবল নিজের দিকটার কথাই ভাবে, প্রেমাস্পদের সুখদুঃখ বা পছন্দ-অপছন্দের দিকটার কথা আদৌ ভাবে না, সে-প্রেম রাহুর মতো—কদর্য। প্রেমের এই কদর্য স্বার্থপর চেহারার দিকে বার বার কবির দৃষ্টি পড়েছে, তার কারণ, কবির শালীনতা-বোধ অসাধারণ। সেই শালীনতা-বোধের জন্যই প্রেমের নীরব আত্মনিবেদনের ছবি বার বার তিনি এঁকেছেন এবং সে-সব ছবি অনবদ্য হয়েছে।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত আর ছবি ও গান, কবির যৌবন-প্রারম্ভের এই তিনখানি কাব্য যে রচনা হিসাবে উৎকৃষ্ট নয় সেকথা কবি বলেছেন; আমরাও বলি। কিন্তু এই তিনখানি কাব্য কবির রচনার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়ও, কেননা, এসব বহন করছে তাঁর অনন্যসাধারণ চিত্তের বিকাশের এক মহামূল্য পরিচয়। ঐতিহাসিক মূল্য এখানে একরকমের শাশ্বত মূল্য লাভ করেছে। কিন্তু এদের পূর্বের রচনাগুলোর সেই গৌরব লাভ হয় নি। ভানুসিংহের পদাবলী অপরিণত বয়সের রচনা হয়েও কেন কিছু সমাদরের যোগ্য হয়েছে সে কথা আমরা বলতে চেষ্টা করেছি।

কয়েকটি নিবন্ধ-সংগ্রহ

বাংলা ১২৮৮, ১২৮৯ ও ১২৯০, প্রধানত এই তিন বৎসর ধরে কবিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ছোট নিবন্ধও কবি রচনা করেন। কয়েক বৎসর পরে সেগুলো যথাক্রমে 'বিবিধ প্রসঙ্গ,' 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' নামে প্রকাশিত হয়। এগুলো এখন অচলিত সংগ্রহের অন্তর্গত। 'বিবিধ সংগ্রহে'র ভূমিকাস্বরূপ কবি লিখেছিলেন:

> আমাদের হৃদয়বৃক্ষে প্রত্যহ কতশত পাতা জন্মিতেছে ঝরিতেছে, ফুল ফুটিতেছে শুকাইতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের শোভা দেখিব না? আজ যাহা আছে আজই তাহা দেখ, কাল থাকিবে না বলিয়া চোখ বুজিব কেন? আমার হৃদয়ে প্রত্যহ যাহা জন্মিয়াছে, যাহা ফুটিয়াছে, তাহা পাতার মত ফুলের মত তোমাদের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ইহারা আমার মনের পোষণকার্যের সহায়তা করিয়াছে, তোমাদেরও হয়তো কাজে লাগিতে পারে।

কাব্যে সাহিত্যে মূলত এমন বাড়ন্ত মনেরই প্রতিদিনের পরিচয়। কিন্তু সে-পরিচয় কেমন করে পরিবেশন করা হল সেটিও সাহিত্যের একটি বড় দিক। এই লেখাগুলোয় সেই পরিবেশনের দিক দিয়ে কিছু ত্রুটি আছে। এগুলো পরিবেশন করা হয়েছে সাধারণত অত্যন্ত কাছের লোকদের সামনে —কবি তাঁর একান্ত ঘরের লোকদের কাছে ঘরের কাহিনী বলবেন বলেই যেন বসেছেন। তবে 'আলোচনা'য় ও 'সমালোচনা'য় বৃহত্তর সমাজ সম্বন্ধে কবির সচেতনতা বেড়েছে।

কিন্তু এইসব রচনার কথাগুলো অনেকটা হেলাফেলা করে বলা হলেও এগুলোর ভিতরে এমন সমস্ত চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে যা উত্তরকালে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা বলে' গৃহীত হয়েছে। যেমন, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম লেখাটি "মনের বাগান-বাড়ি"র কথাগুলো। এতে কবির প্রধান বক্তব্য এই : "যাহাকে তুমি ভালোবাস, তাহাকে ফুল দাও, কাঁটা দিও না, তোমার হৃদয়-সরোবরের পদ্ম দাও, পঙ্ক দিও না।" আমাদের জীবনের যা শ্রেষ্ঠ ধন, অশেষ তপস্যায় আমরা যা অর্জন করি, তাই আমাদের উপহার দিতে হবে জগৎকে—বিশ্ববিধাতাকে, পরে পরে আমরা দেখব এসব কবির শ্রেষ্ঠ ভাবনা।

প্রকাশ তেমন পূর্ণাঙ্গ হয় নি বলেই কবি এই রচনাগুলোর স্থান নির্দেশ করেছেন 'অচলিত সংগ্রহে'।

'আলোচনা'-র ও 'সমালোচনা'-র লেখাগুলো 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র লেখাগুলোর চাইতে মোটের উপর উঁচুদরের, অর্থাৎ প্রকাশে আরো উৎকর্ষ লাভ করেছে। 'সমালোচনা'য় অনেক জটিল সামাজিক সমস্যার ভিতরে কবি প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন—যেমন অনাবশ্যক, বাউল গান, সমস্যা, এক-চোখো সংস্কার, একটি পুরাতন কথা, প্রভৃতি লেখায়। সমাজ-জীবনে ঐতিহ্যের স্থান, আদর্শের মূল্য, সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন, এইসব জটিল চিন্তা সম্বন্ধে কবি এই বয়সে যে সচেতনতা দেখিয়েছেন তা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তবে এও লক্ষ্য করবার আছে যে কবির সেই সময়কার পরিবেশে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় ও নব্যহিন্দু সম্প্রদায়ে এইসব চিন্তা নানাভাবে আন্দোলিত

হয়ে চলেছিল। কবিকে এই যুগে মোটের উপর আদিব্রাহ্মসমাজের ও বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন নব্যহিন্দুসম্প্রদায়ের মতাবলম্বী দেখা যাচ্ছে। এমন-কি, বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-জাতীয়তার দিকেই এই বয়সে তাঁর প্রবণতা বেশি, একথা বলা যায়। 'জীবনস্মৃতি'তে এক জায়গায় কবি বলেছেন :

আমাদের পরিবারে যে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।

কবির জীবনীকার প্রভাতবাবু কবির এই উক্তিকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি, কেননা, আদিব্রাহ্মসমাজের মত যে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত ছিল নানাদিক দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র এই উক্তিটা দীর্ঘদিন আমরাও মেনে নিতে পারি নি। কিন্তু 'সমালোচনা' বইখানি যত্ন করে পড়ে দেখতে পেয়েছি, কবির উক্তি মূলত সত্য—জাতীয়তাবোধ, অর্থাৎ হিন্দু-ঐতিহ্য-চেতনা, এই কালে রবীন্দ্রনাথের ভিতরে যত প্রবল ছিল ব্রাহ্মসমাজের কোনো শাখার লোকদের মধ্যেই তার পরিচয় আমরা পাই না। তাঁর 'অনাবশ্যক' লেখাটি থেকে কিছুটা অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

পুরাতন দিনের একখানি চিঠি, একটি আংটি, একটি গানের সুর, একটা যা-হয় কিছু অত্যন্ত যত্নপূর্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুক্কায়িত নাই, এতবড় অপৌত্তলিক কেহ আছে কি? পৌত্তলিকতার কথা বলিলাম, কেননা, প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগতাতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা। একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীত-কালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহে তো কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীতকালের প্রতিমা। উহার কোনো মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীতকাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন কোনো লোক আছে কি যে তাহার পুরাতন দিবসের একটা কোনো চিহ্ন রাখিয়া দেয় নাই? আছে বৈ-কি! তাহারা অত্যন্ত কাজের লোক, তাহারা অতিশয় জ্ঞানী লোক! তাহাদের কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। যতটুকু

দরকার আছে কেবলমাত্র ততটুকুকেই তাহারা খাতির করে। বোধ করি দশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা মা-কে মা বলে, তাহার পর তাঁর নাম ধরিয়া ডাকে। কারণ, সন্তানপালনের জন্য যতদিন মায়ের বিশেষ আবশ্যক ততদিনই তিনি মা, তাহার পর অন্য বৃদ্ধার সহিত তাঁহার তফাত কি?

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যে সত্য-সত্যই বয়স হইলে মাকে মা বলেন না তাহা নহে। অনাবশ্যক মাকেও ইঁহারা মা বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অতীত মাতার প্রতি ইঁহাদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। মায়ের কাছ হইতে ইঁহারা যাহাকিছু পাইয়াছেন, অতীতের কাছ হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি পাইয়াছেন, তবে কেন অতীতের প্রতি ইঁহাদের এমনতর অকৃতজ্ঞ অবহেলা। অতীতের অনাবশ্যক যাহাকিছু, তাহা সমস্তই ইঁহারা কেন কুসংস্কার বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চান? তাঁহারা ইহা বুঝেন না, শুষ্ক জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক ধরা পড়ে না। আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালও নয় মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক, তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান লোকের মুখে হাসি আসে, এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র—কিন্তু আসলে কি করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দিরমধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীতদেবকে ভাঙিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্বপুরুষদের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে।...

অবশ্য কবির এইসব চিন্তায় অনেক দুর্বলতা আছে—তাঁর পরবর্তীকালের চিন্তা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই কালে কবির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এতখানি পক্ষপাত কম অর্থপূর্ণ নয়। মানুষের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এমন গূঢ় প্রাচীন-ঐতিহ্য-প্রীতি বার বার দেখা গেছে। (য়ুরোপীয় রেনেসাঁস, ফেরদৌসির প্রভাবে ইরানের রেনেসাঁস, এসব স্মরণীয়।) ব্যক্তিগত জীবনেও এমন গভীর প্রীতি সৃষ্টিধর্মের সহায়তা করে—যাঁরা বড় প্রেমিক নন কোনো ক্ষেত্রেই তাঁরা বড় স্রষ্টা হতে পারেন না। অবশ্য সেই প্রেমেরও বিকাশ

আছে। সেই প্রেমের দৃষ্টিতে একসময়ে অতীত ঐতিহ্য যে পরিমাণে অত্যাজ্য মনে হয় চিন্তার পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তার অনেক ইতর-বিশেষ হয়—রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই তা আমরা দেখব। কিন্তু জাতির ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের জন্য কবির যে গভীর মমতা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেটি মোটের উপর তাঁর মানসের ও সাহিত্যের একটি বড় সম্পদ। একালের ব্রাহ্মদের অর্থাৎ সংস্কারপন্থীদের মধ্যে এতটা সৃষ্টিধর্মী তিনি যে হতে পেরেছিলেন তার একটি গূঢ় কারণ হয়ত তাঁর এই সুগভীর প্রেম। জাতীয় জীবনে সংস্কারের প্রয়োজন খুব; কিন্তু সে-ক্ষেত্রে বিপদও কম নেই—সংস্কারের চিন্তা সহজেই উগ্র হয়ে প্রেমবিহীন হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া চিন্তার ক্ষেত্রে উল্টা-পাল্টা ব্যাপারও ঘটে, এক যুগ যে চিন্তার উপরে জোর দেয় অন্য যুগ তাতে বহু দোষ দেখে।

এই অচলিত নিবন্ধ-সংগ্রহগুলোর মধ্যে কবির অনেক বড় চিন্তা বীজ আকারে আমরা পাচ্ছি। এই সময় কবির বয়স একুশ-বাইশ বৎসর। প্রতিভাবানদের ভিতরে সাধারণত এই বয়সেই তাঁদের প্রতিভা যথেষ্ট স্ফূর্ত দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য সম্বন্ধেও এইসব নিবন্ধে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। তবে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা মোটের উপর ভাবালু বেশি। বসন্তরায় ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বসন্তরায়ের মূল্য কবি বেশি দিয়েছেন। তেমনি টেনিসনের ডি প্রোফণ্ডিস-কে মিল্‌টনের Paradise Lost-এর চাইতে মহত্তর বিবেচনা করেছেন।

মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর অল্প বয়সের বিখ্যাত আলোচনাও এই নিবন্ধ-সংগ্রহে আছে। পরবর্তীকালে অবশ্য কবি নিজেই তার অকিঞ্চিৎকরতার কথা বলেছেন। কিন্তু শুধু নবযৌবনের হঠকারিতা নয়, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি অত্যধিক মমতা তাঁর এমন বিচারবিভ্রাটের মূলে এই আমাদের মনে হয়েছে। বাস্তবিক ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয় যে রবীন্দ্রনাথ কোনো এক সময় ভাবতে পেরেছিলেন—হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে'র সাহিত্যিক মর্যাদা 'মেঘনাদবধে'র চাইতে অনেক বেশি। অবশ্য প্রবল পক্ষপাত এমন অন্ধতা এনে দিতে পারে। কেশবচন্দ্রের প্রতিও কবি যে দীর্ঘদিন সুবিচার করেন নি সে-কথা তিনি উত্তরকালে বলেন।

'সমালোচনা'র শেষ লেখাটি—একটি পুরাতন কথা—১২৯১ সালে লেখা। এর উৎপত্তি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তির প্রতিবাদসূত্রে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিটির মর্ম এই :

> যে ব্যক্তি আচারে হিন্দু কিন্তু চরিত্রে পাষণ্ড তাকে হিন্দু বলবো, না, যে আচারভ্রষ্ট কিন্তু কখনো কাউকে বঞ্চনা করে না, যথাসাধ্য ইন্দ্রিয়-সংযম করে, কখনো মিথ্যা কথা বলে না, যদি মিথ্যা কথা বলে তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করে যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেখানেই মিথ্যা কথা বলে থাকে, সেই ব্যক্তি হিন্দু ?

এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে আর প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডের 'ব্রাহ্মসমাজের সমর্থন' পরিচ্ছেদে। 'অচলিত সংগ্রহে' প্রকাশিত লেখাটিতে রবীন্দ্রনাথের মূল লেখাটির প্রতিবাদপূর্ণ ছত্রগুলি যথাসম্ভব বর্জন করা হয়েছে, এবং বর্জন করার ফলে লেখাটি যা দাঁড়িয়েছে তাকে একটি স্মরণীয় লেখাই বলতে হবে। কবির বক্তব্য মোটামুটি এই :

> যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন-কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোক যে-সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধি বিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়,—সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গম শিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মতো সরল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্দামার মধ্যে শতভাগে

বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধি বিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে।...সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ।...আমাদের জাতি নতুন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময় বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোনো মতেই কর্তব্য বোধ হয় না।... এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে।...এখনই যদি হৃদয়ের মধ্যে ভাঙাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা, তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

এই বাদপ্রতিবাদে কিছু ভুলবোঝাবুঝি ছিল। তবে মোটের উপরে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন দৃষ্টান্তের দিকে একটু বেশি নজর দিয়ে তাঁর বক্তব্য কিছু জটিল করেছিলেন; আর রবীন্দ্রনাথ অজটিল বীর্যবন্ত নৈতিক আদর্শের উপরে জোর দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় বিজ্ঞতা যথেষ্ট; কিন্তু তা স্বীকার করেও বলতে হবে, নতুন অজটিল বীর্যবন্ত নৈতিক আদর্শের মূল্য বেশি। আমাদের নব-উদ্বোধিত জাতীয় জীবনের জন্য এমন আদর্শের সমূহ প্রয়োজনের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। প্রবল ঐতিহ্য-চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথে যে রয়েছে প্রবল নৈতিক চেতনাও, প্রধানত এরই গুণে তাঁর প্রাগ্রসরতা ও সৃষ্টিধর্ম কখনো ব্যাহত হয় নি। কিন্তু ঐতিহ্য-চেতনার সঙ্গে নৈতিক চেতনার যোগ প্রায়ই ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে। এটি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক, কারোয়ারে লেখা, সে কথা বলা হয়েছে। এর কাহিনীটি ছোট। এর নায়ক এক সন্ন্যাসী। সেই সন্ন্যাসী চেয়েছে—জগতের সমস্ত স্নেহবন্ধন ও মায়াবন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির উপরে সে জয়ী হবে। এই মনোভাব নিয়ে দীর্ঘদিন এক অন্ধকার গুহায় কাটিয়ে যখন সে বাইরে এল তখন দেখলে—জগতের নানা ধরনের নরনারী তাদের তুচ্ছ ভাবনা ও কাজকর্ম নিয়ে

দিন কাটিয়ে চলেছে। একটা অস্পৃশ্য জাতির মেয়ে সবার কাছ থেকে ঘৃণা ও ভর্ৎসনা পেয়ে সন্ন্যাসীর কাছে এল। সন্ন্যাসীর কারো প্রতি অনুরাগও নেই ঘৃণাও নেই। সে তাকে আশ্রয় দিলে। কিন্তু কিছুদিনেই সন্ন্যাসী বুঝতে পারল এই অনাথা মেয়েটির মমতার বাঁধনে সে জড়িয়ে পড়ছে। তখন সে মেয়েটিকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেল। মেয়েটি খুঁজে খুঁজে সন্ন্যাসীকে বার করলে। মেয়েটিকে দেখে সন্ন্যাসী প্রথমে খুশী হ'ল, কিন্তু শীগগিরই সে মেয়েটিকে রাক্ষসী, পিশাচী, মায়াবিনী, প্রকৃতির গুপ্তচর ইত্যাদি বলে ভর্ৎসনা করে তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু আবার তাতে পরিবর্তন দেখা দিল। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য, নরনারীর প্রতিদিনের আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন, এসব তাকে মুগ্ধ করল। সে সেই মেয়েটির খোঁজে আবার ফিরে এল। কিন্তু এসে দেখলে তার সেই গুহায় মেয়েটির মৃতদেহ পড়ে আছে। সে শোকে আকুল হয়ে বললে :

বাছা, বাছা, কোথা গেলি! কি করলি রে—
হায় হায়, এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ।

প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরে যে চিন্তা রয়েছে সেটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম : বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।

কাজেই চিন্তার দিক দিয়ে এ লেখাটি বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু রস-সাহিত্যে কোনো রচনার মর্যাদা লাভ হয় চিন্তার গুণে যতটা তার চাইতে বেশি রূপসৃষ্টির গুণে। সেই রূপসৃষ্টির পথে কবি এই নাটকে খানিকটা এগিয়েছেন, যেসব সাধারণ নরনারীকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন তাদের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতরে তারা জীবন্ত; কিন্তু নায়ক সন্ন্যাসী তার চিন্তা ও চেষ্টার প্রচণ্ডতা নিয়েও মোটের উপর অদ্ভুত—আমাদের মনে ঠিক দাগ কাটে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও সে কিছু বেশি অদ্ভুত, কেননা, আমাদের দেশের সন্ন্যাসীরা সাধারণ মায়া-মমতার বাঁধন কাটাতে চায় বটে কিন্তু তারা ভগবানকে বা পরমাত্মাকে অবলম্বন করতে চায়, কেউ কেউ জগতের প্রতি

প্রেমপ্রীতিও দেখাতে চায়। কিন্তু এই সন্ন্যাসীটির মধ্যে তেমন সদর্থক কিছু নেই, তার মনোভাব কেবল নঙর্থক। সে দেখছে—জগৎ এক প্রকাণ্ড অর্থহীন ব্যাপার—

বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস মহা দুর্ভিক্ষ মাঝারে।
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।

তাই সে বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়েছে, তিল তিল করে জগতের ধ্বংস সাধন করেছে, আর অবশেষে তার ধারণা হয়েছে সেই সাধনায় তার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, অর্থাৎ, তার ভিতরে স্নেহ মমতা যা কিছু ছিল সব সে হত্যা করেছে। এই সন্ন্যাসী মোটের উপর মায়াবাদ সম্পর্কে প্রচলিত বিরুদ্ধমতের প্রতীক, অর্থাৎ মায়াবাদ সম্বন্ধে একটি idea, তার বেশি প্রাণসম্পদ তাতে নেই। আমাদের ধারণা হয়েছে গ্যেটের ফাউস্টের এক ধরনের প্রভাব এখানে দেখা যাচ্ছে। ফাউস্টও প্রথম জীবনে ছিল খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ্—সন্ন্যাসী, কিন্তু বহু পড়াশুনা করে সে বুঝেছিল "আসলে জানা যায় না কিছুই।" এই চেতনা তাকে এমন অসুখী করে যে সে আত্মহত্যা করবার সংকল্প করে। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের যেসব ছবি এতে আঁকা হয়েছে তাও ফাউস্টের অনুরূপ।—ফাউস্টের জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা বোঝা যায়, কেননা তার বেদনা গভীর কিন্তু এই সন্ন্যাসীর বিতৃষ্ণা অনেকটা মনগড়া। তার ভিতরে মতবাদের এই প্রবলতা আর প্রাণধর্মের দুর্বলতার জন্যই পরে জগতের প্রাত্যহিক জীবনের আনন্দরূপ তার চোখে যখন পড়ছে সেটি কিছু চিত্তাকর্ষক হলেও তেমন জোরালো কিছু হয় নি।

কাজেই এই নাটকের দাম চিন্তার দিক দিয়েই। সৃষ্টি হিসাবে এ দুর্বল। এই কালে কবির অন্যান্য লেখায়ও দেখা যাচ্ছে—চিন্তা ও আবেগ কবির ভিতরে প্রবল, কিন্তু এই দুইয়ের সুষ্ঠু মিশ্রণ তাঁর রচনায় তেমন ঘটে নি।

বউঠাকুরানীর হাট

বউঠাকুরানীর হাট কবির প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস হিসাবে এটি যে তেমন সার্থক হয় নি সেকথা কবি নিজেই

বলেছেন, আর পরে এই উপন্যাসের বিষয় নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ও পরিত্রাণ নাটক লেখেন। কিন্তু এতে কবি পরিকল্পনা যা করেছিলেন তাতে মহৎ সম্ভাবনা ছিল।

এর নায়ক যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য—দূরদৃষ্টিহীন ও নিষ্ঠুর স্বভাবের, তাঁর খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় প্রেমপ্রীতিপন্থী বৈষ্ণব, কাজেই ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই; প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য পিতার নিষ্ঠুর স্বভাব আদৌ পায় নি, সে বরং তার উল্টো—নিষ্ঠুরতা সে অন্তরের সঙ্গে অপছন্দ করে আর প্রীতি পরোপকার এসবের দিকেই তার চিত্তের প্রবণতা। এইজন্য সে পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়েছে। রাজার জামাতা রাজা রামচন্দ্র ঘোর স্থূলবুদ্ধি।—এই পরিকল্পনার সম্ভাবনা যে যথেষ্ট ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

এর রাজা বসন্ত রায়ের উপরে পড়েছে শ্রীকণ্ঠ সিংহের ছায়া, আর রাজকুমার উদয়াদিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে কবির এইকালের চরিত্রের খানিকটা। দুর্বল কিন্তু মহৎহৃদয় উদয়াদিত্য পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখাটির প্রশংসা করেছিলেন।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে"

নতুন-বৌঠাকরুনের তিরোধান

১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে কবির পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী তাঁর নতুন-বৌঠাকরুন কাদম্বরী দেবী সহসা আত্মহত্যা করেন। কবির জন্য এই ঘটনা হয়েছিল যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। তাঁর এই পরমাত্মীয়ার প্রসঙ্গ নানাভাবে প্রায় সারা জীবন কবির রচনায় দেখা দিয়েছে।

এঁর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রভাতবাবু বলেছেন: "আমাদের যতদূর জানা আছে তাহা (কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু) মহিলাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের পরিণাম।" এ-সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্ট বিবরণ আমরা শ্রীযুক্ত অমল হোমের কাছ থেকে পেয়েছি—তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোটদিদি বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে, বোধ হয় ১৯৪৬ সালে। বিবরণটি এই: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেইদিনের একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলো চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি কাদম্বরী দেবী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়।*

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোকে কবি যখন বিহ্বল তখন তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে লেখেন 'পুষ্পাঞ্জলি'—এই লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এতে কবির শোক-বিহ্বলতাই প্রকাশ পায় বেশি—তার ভিতর থেকে স্পষ্ট চিত্র যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে কাদম্বরী দেবীর পরম আন্তরিক আতিথেয়তা আর সেবাপরায়ণতা।—তিনি নিঃসন্তান ছিলেন।

গুরু শোকের আঘাতে মানুষের গভীর বিশ্বাসগুলোর ভিত্তি কেমন নড়ে যায় সে-সম্বন্ধে কবি 'পুষ্পাঞ্জলি'তে বলেছেন:

---

* ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছি, যে মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না, এবং তাঁর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী দেবী আরও একবার (রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়।…প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে, "এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম। কখনোই নহে।" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে, "আশ্চর্য কি! তেমন সুন্দর মুখখানি—কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি—সেও যে আর কিছু নয়, দুইমুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে, এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত। বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কী!" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজে নৌকা-ডুবি করিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে চায় না।

কিন্তু এই অবস্থায়ও কবি তাঁর জীবনের মূল আশ্রয়কে ত্যাগ করতে চান নি :

কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে। তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় মনে করিয়া ফেলি।…এ-সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না। সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রকৃতিগত অসাধারণ 'আস্তিকতা' লক্ষণীয়। তাঁর জীবনের অন্তিমেও এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে। কবির এই অনন্য-সাধারণ আস্তিক্য-ধর্মের সন্ধান নেন নি বলে আমাদের একশ্রেণীর সাহিত্যিক কবিকে নানা আবেগে আন্দোলিত একজন রোমান্টিক কবিরূপে দেখতেই বেশি ভালবাসেন।

শোকের এই কঠিন আঘাত শেষ পর্যন্ত কবির হৃদয়-মনে কেমন এক বেদনামধুর পরিণতি লাভ করল সে-সম্বন্ধে কবি 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন :

…এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে,

এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণ-পূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম। সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটা মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।

এই গভীর শোকে এমনভাবে আত্মস্থ হওয়ার ফলে কবির হৃদয় ও মন দুয়েরই সমৃদ্ধি ঘটল। তাঁর জগৎ-প্রীতি আরো গভীর আরো দৃঢ়মূল হ'ল, কেননা, বেদনার ভূমিকার উপরেই হ'ল তার অধিষ্ঠান। আমরা পরে পরে দেখব এই আনন্দবাদী কবির জীবন বিচিত্র বেদনায় দৃঢ়মূল।

মসীযুদ্ধ

১২৯১ সালের মাঝামাঝি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মসীযুদ্ধ হয় তার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এইকালে বেশ কিছুদিন ধরে কবিকে 'হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনবাদী'দের বিরুদ্ধে আরো অনেক মসীযুদ্ধ চালাতে হয়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে এই 'পুনরুজ্জীবনবাদে'র শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এই পুনরুজ্জীবনবাদ উৎকট আকার ধারণ করেছিল শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (তিনি নিজেকে কল্কি-অবতার বলেছিলেন) এবং তাঁদের ভক্তদের মধ্যে। রবীন্দ্র-জীবনীতে ও আমার 'বাংলার জাগরণে' তাঁদের মতবাদের কিছু বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।—আমরা দেখেছি এইকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী ছিলেন—হিন্দু-ঐতিহ্য-প্রীতি এইকালে তাঁর ভিতরে কারো চাইতে কম ছিল না। কিন্তু সেই প্রীতি যত গভীরই হোক তাঁর সহজাত প্রবল কাণ্ডজ্ঞানকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করবার সামর্থ্য তার ছিল না। কিন্তু এই 'হিন্দু-পুনরুজ্জীবনবাদী'দের কাণ্ডজ্ঞান শোচনীয়ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রও শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যার প্রতি বেশিদিন শ্রদ্ধাবান থাকেন নি। কবি এই সময়ে নবযুবক; বুদ্ধি ও কলম দুই-ই তাঁর নব তেজে উদ্দীপ্ত, আর বয়সের গুণে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াও তাঁর জন্য অরুচিকর ছিল না। সমসাময়িক জীবনের এমন ছোটখাট সমস্যা নিয়ে অনেক বড় সাহিত্যিককে সংগ্রাম করতে হয়েছিল; আর সেরকম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শক্তির অপব্যয় তাঁরা করেন নি এই মোটের উপর ইতিহাসের রায় দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রামও তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর জাতির জন্য শুভই হয়েছিল। এর ফলে তাঁর জীবন হয়েছিল আরও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ—জাতির প্রাত্যহিক জীবনের স্পর্শ এর ভিতর দিয়ে তাঁর বেশি লাভ হয়েছিল। আর তাঁর মতো তীক্ষ্ণধী ও মহৎহৃদয় ব্যক্তির হাত থেকে এমন আঘাত তাঁর জাতির সম্বিৎ-লাভ ত্বরান্বিত না করলেও তার সহায় হয়েছিল।

এই সংগ্রাম উৎকটতা পরিহার করে অল্প কয়েক বৎসরেই; কিন্তু আমরা পরে পরে দেখব, এমন সংগ্রামে কোনো না কোনো আকারে বার

বার কবিকে লিপ্ত হতে হয়েছে। এই অনন্তের আনন্দরূপের প্রেমিক কবি সারা জীবন ছিলেন প্রবলভাবে সংগ্রামশীলও।

এই মসীযুদ্ধ পদ্য ও গদ্য দুই ক্ষেত্রেই কবি চালান, আর এই সম্পর্কিত কোনো কোনো রচনার প্রচার তিনি পরবর্তীকালে রহিত করেন। এইকালে কবির বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা-পত্রের এই ক'টি ছত্র ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতার গুণে বিশেষ স্মরণীয় হয়েছে :

খুদে খুদে 'আর্য'গুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন "আমি কল্কি", গাঁজার কল্কি হবে বুঝি!
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি।

গদ্যে কবির ব্যঙ্গ-রচনা সাধারণত ছোট ছোট কৌতুক-নাট্যের রূপ পায় —তাঁর 'হাস্য-কৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে' এই সব রচনা দেখতে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য এসব কোনো উঁচুদরের সাহিত্যিক রচনা নয়। মোটের উপর গদ্যের চাইতে পদ্যে কবির ব্যঙ্গ-রচনা বেশি শক্তিশালী হয়েছে। গদ্যে তাঁর ব্যঙ্গ-রচনা বেশি শক্তিশালী হয় পরবর্তীকালে।

রাজর্ষি

'রাজর্ষি' প্রথম 'বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে। এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

…দুই-এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর দুই-এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণবাবুকে দেখিতে যাই। কলিকাতা ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল; ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না…… মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না তখন এই সুযোগে বালক-এর জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্ত-চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা এ কি! এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে

রাগের ভান করিয়া কোনো মতে তাহার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া 'রাজর্ষি' গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

এর কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :

সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একদিন একটি বালিকাকে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে আসা বলির রক্ত দেখে বিস্ময় ও ব্যথা প্রকাশ করতে দেখেন। সেই ঘটনা থেকে বলিদানের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন ও তাঁর রাজ্যে বলিদান নিষিদ্ধ করেন। এতে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি এটিকে জ্ঞান করেন সম্পূর্ণ ধর্মবিরুদ্ধ কাজ ও রাজার স্বেচ্ছাচারের পরিচায়ক। তিনি রাজার ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করান ও মোগল সৈন্যদের দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করান। রাজা গোবিন্দমাণিক্য রক্তপাতে অনিচ্ছুক হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। কিছুকাল রাজত্ব করার পরে নক্ষত্ররায়ের মৃত্যু হয়। তখন প্রজাদের আগ্রহে গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

এতে অনেক চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে ; কিন্তু তাদের মধ্যে চোখে পড়বার মতো হচ্ছে তিনজন—রাজা গোবিন্দমাণিক্য, রাজপুরোহিত রঘুপতি আর রঘুপতির রাজ্য ত্যাগ করার পরে যিনি রাজপুরোহিত হলেন সেই বিল্বন ঠাকুর। রাজা খুব মহদাশয়। বিল্বন ঠাকুরও মহদাশয় ব্যক্তি, সেই সঙ্গে সৎ-কর্মের অনুষ্ঠানে ক্লান্তিহীন—জাতিধর্মের বাছ-বিচার তাঁর কাছে আদৌ নেই। আর রঘুপতি একজন প্রবলসংকল্পবিশিষ্ট ব্যক্তি—তিনি ঠিক নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, কিন্তু প্রয়োজন হলে নিষ্ঠুর হতে তাঁর বাধে না। ধর্ম যে রূপ পেয়েছে তাঁর চিন্তায় তা অনতিক্রম্য। গোবিন্দমাণিক্য প্রেমপ্রীতি-পন্থী আর রঘুপতি চিরাচরিত-আচার-পন্থী।

প্রভাতবাবু 'রাজর্ষি'কে উপন্যাস হিসাবে যথেষ্ট মূল্যবান জ্ঞান করেছেন, কেননা, এর তিনটি প্রধান চরিত্র পরে পরে নানাভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। 'রাজর্ষি'র তিনটি মুখ্য চরিত্র যে বার বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে রবীন্দ্র-

সাহিত্যে দেখা দিয়েছে তা মিথ্যা নয়; তবু 'রাজর্ষি'কে উপন্যাস হিসাবে তেমন মূল্যবান জ্ঞান করা যায় না বলেই আমাদের ধারণা হয়েছে। এতে মহৎ চিন্তা আমরা অনেক পাই; কিন্তু সেইসব মহৎ চিন্তা সত্যকার রক্তমাংসের মানুষের রূপ গ্রহণ করে নি। 'প্রভাতসংগীত' ও 'ছবি ও গানে'র যুগের প্রবল ভাব-বিভোরতাই এই উপন্যাসের মধ্যেও আমরা দেখছি—বাস্তব জীবন বলতে যা বোঝায় তার দিকে কবির মন এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট হয় নি। উপন্যাস হিসাবে 'রাজর্ষি' 'বউঠাকুরানীর হাটে'র সমশ্রেণীর, তবে মহৎচিন্তা এতে আরো লক্ষণীয় হয়েছে। আরো একটি ব্যাপার এতে লক্ষ্য করবার আছে। যাতে বালকবালিকাদের মনোরঞ্জন হতে পারে এমন বহু ঘটনা ও কথা এতে আছে। এটি আজো একটি শ্রেষ্ঠ কিশোর-পাঠ্য বই।

মহৎচিন্তা যথেষ্ট পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের মনে খেলেছিল অল্প বয়সেই; এ ব্যাপারে ইংরেজ কবি শেলীকে তাঁর গুরু জ্ঞান করা যেতে পারে; কিন্তু সেসবের সত্যকার সাহিত্যিক রূপ পেতে দেরি হয়েছিল। 'রাজর্ষি'র, এমন-কি 'বিসর্জনের'ও, 'গোবিন্দমাণিক্য' মহৎ বা মহত্তর সাহিত্যিক রূপ পায় 'গোরা'র 'পরেশে' আর 'ঘরে-বাইরে'র 'নিখিলেশে'।—তবে একথা যথার্থ যে উচ্চমানের সাহিত্যিক সৃষ্টি সম্বন্ধে চেতনা তিনিই আমাদের মধ্যে উন্মেষিত করেছেন। পরে তাঁরই হাত থেকে 'পরেশ' ও 'নিখিলেশ'কে যদি আমরা না পেতাম তবে 'রাজর্ষি'র 'গোবিন্দমাণিক্য'কে নিয়েও আমরা কম গর্ব করতাম না।

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯৪ সালে। এই রচনাগুলো প্রথম 'বালকে' প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালে।

এতে ঠাকুরদাদা ষষ্ঠীচরণ ও নাতি নবীনকিশোরের মধ্যে তর্ক চলেছে সেকাল ও একালের মাহাত্ম্য নিয়ে। ঠাকুরদাদা স্বভাবত সেকালের রুচি বুদ্ধি চালচলন এসবের পক্ষপাতী আর নাতি স্বভাবত একালের মহত্ত্বে বিশ্বাসী।

এই চিঠিগুলোতে বিশেষ লক্ষণীয় ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি—ঠাকুরদাদা ও নাতি উভয়ের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক।

মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট চিন্তাও এতে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন, ঠাকুরদাদার উক্তি :

> কালের কি কিছু স্থিরতা আছে নাকি। আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্তী শৈলের মতো কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না। আমরা পরিবর্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।··· নহিলে আমরা পরিবর্তনের দাস হইয়া পড়ি, পরিবর্তনের খেলনা হইয়া পড়ি।

তেমনি, নাতির এই উক্তিটি :

> প্রকৃত স্বাধীনতা ভাবের স্বাধীনতা। বৃহৎ ভাবের দাস হইলেই আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত সুখ ও গৌরব অনুভব করিতে পারি···তখন একটা উঁচু সিংহাসন মাত্র গড়িয়া আমাদের চেয়ে কেহ উঁচু হইতে পারে না। সেই গৌরব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলেই আমাদের সহস্র বৎসরের অপমান দূর হইয়া যাইবে, আমরা সকল বিষয়ে স্বাধীন হইবার যোগ্য হইব।
>
> আমাদের সাহিত্য যদি পৃথিবীর সাহিত্য হয়, আমাদের কথা যদি পৃথিবীর কাজে লাগে, এবং সে-সূত্রেও যদি বাংলার অধিবাসীরা পৃথিবীর অধিবাসী হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে গৌরব জন্মিবে—হীনতা ধুলার মতো আমরা গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিব।

এই 'চিঠিপত্রে' তরুণ কবিকে দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের একটা নতুন মহিমা লাভ সম্বন্ধে একান্ত আস্থাবান। তেমন একটা মহিমা যে অচিরাগত স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বাংলার লাভ হয়েছিল সেটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অবশ্য তারপর বাংলায় নেমে এসেছে দুর্দিন। সেই দুর্দিন কেমন করে সুদিনে রূপান্তরিত করা যায় সেটি একালের বাঙালিদের সামনে একটি বড় সমস্যা। সেই সমস্যার উপরে কবির চিন্তা কতটা আলোকপাত করেছে তার সঙ্গেও পরে পরে আমাদের পরিচয় হবে।

কড়ি ও কোমল

কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালের কার্তিক মাসে। তখন কবির বয়স সাড়ে পঁচিশ বৎসর। সেই বৎসর বৈশাখ মাসে কবি দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) কবির সঙ্গে দেখা করেন তাঁদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। তিনি একটি চিঠিতে কবি সম্বন্ধে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা উপভোগ্য ও অর্থপূর্ণ। তাঁর বর্ণনাটি এই :

বঙ্গসাহিত্যজগতের উঠন্ত রবি রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে··· বিগত কল্য···গিয়াছিলাম। ঠাকুরবাড়ির প্রকাণ্ড পুরীতে প্রবেশ করিয়া দোতালার সিঁড়ির মুখেই রবিঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নয়ন মুগ্ধ, মন আনন্দসাগরে ডুবিল। কোনো ইংরাজি পুস্তকে অমর কবি মিল্‌টনের দেবমূর্তি দেখিয়াছ কি? দেখিয়া থাকিলেই সেই মূর্তিতে রবিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে। দেহ-ছন্দ সুদীর্ঘ, বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর, মুখাকৃতি দীর্ঘ, নাসা চক্ষু ভ্রূ সমস্তই সুন্দর, যেন তুলিতে আঁকা। গুচ্ছে গুচ্ছে কয়েকটি কেশতরঙ্গ (curls) স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। পরিধানে ধুতি। কেন বলিতে পারি না রবিঠাকুরের অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া বোধ হইল যেন এই অঙ্গে গৈরিক বসন অধিক শোভা ধারণ করিত। উনবিংশ শতাব্দীর Albert ইত্যাদি কেশরক্ষার ফ্যাশনের মধ্যে দীর্ঘ কেশ দেখিবার জিনিস বটে এবং যে তাহা রক্ষা করে তাহাকে সাহসী পুরুষ বলিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলাপ হইল। রবিঠাকুরের বয়স অল্প, তেইশের অধিক হইবে না।* কিন্তু স্বভাব স্থির। কলেজে থাকিতে মিল্‌টনকে তাঁহার সহপাঠিগণ 'Lady' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, রবিঠাকুরকেও সেই আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। স্বর অতি কোমল ও সুমিষ্ট রমণীজনোচিত। রবিঠাকুরের গানের কথা শুনিয়াছিলাম কিন্তু গান শুনি নাই। তাঁহাকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করা হইল। সাধাসাধি নাই, বনবিহঙ্গের ন্যায় স্বাধীন উন্মুক্ত কণ্ঠে অমনি গান ধরিলেন। গানটি এই :

* এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঁচিশ বৎসর।

'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।'*

এই চিঠিখানিতে রবীন্দ্রনাথকে নবযৌবনেও দেখা যাচ্ছে লক্ষণীয়ভাবে শান্ত—সেই শান্তি তাঁর ব্যক্তিত্বকে সেই বয়সেই বিশিষ্টতা দিয়েছে। এটি মনে রাখবার মতো।

এই কাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেল ফুল, পায়ে একজোড়া চটি। মনে আছে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে গেছি কিন্তু এর বেশি পরিচ্ছন্নতা নেই......এই আত্মবিস্মৃত বে-আইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমল-এর কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই রীতির কবিতা তখনও প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য-বিচারকদের কাছ থেকে কটু ভাষায় ভর্ৎসনা সহ্য করেছিলুম। সেসব যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে। আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক......কড়ি ও কোমল-এর কবিতা মনের অন্তঃস্তরের উৎসের থেকে উছলে উঠেছিল। তার সঙ্গে বাহিরের কোনো মিশ্রণ যদি ঘটে থাকে তো সে গৌণ ভাবে।

এই আমার প্রথম কবিতার বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে।

'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজিয়ে প্রকাশ

* এই চিঠিখানির জন্য আমরা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে ঋণী। রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃঃ ২১২ দ্রঃ।

করেন আশুতোষ চৌধুরী (১৮৬০-১৯২৪)। পরে ইনি হাইকোর্টের জজ হন ও স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। এঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হয় তাঁর দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রার কালে। কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হয় ১২৯৩ সালের শ্রাবণে। এঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তখন কড়ি ও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই-সকল লেখায় তিনি ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানব-জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে।......'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এই চতুর্দশপদী কবিতাটি তিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিতাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্মকথাটি আছে।

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—এটি শুধু 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যপ্রচেষ্টার ভূমিকারূপেও গণ্য হবার যোগ্য। সে কথা কবিও বলেছেন। কবিতাটির নাম 'প্রাণ'। কিন্তু প্রাণ বলতে এখানে প্রাণ মন হৃদয় সবই বোঝাচ্ছে। এই প্রাণের অন্য নাম জীবনানন্দ—ব্যক্তিগত জীবনের আনন্দ ও সমষ্টিগত জীবনের আনন্দ। এই প্রাণের জয়গানে কবি কখনো ক্লান্তি বোধ করেন নি।

এই কবিতায় কবির সাধটি খুব সহজ সরল—এবং সেইজন্যই মর্মস্পর্শী—ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আর চোদ্দ লাইনের পরিমিত আয়তনের মধ্যে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে বলে এর আবেদন শক্তিশালী হয়েছে। চোদ্দ লাইনের এমন ভাবঘন কবিতাকে সাধারণত বলা হয় সনেট। তবে সনেট সাধারণত জটিলবন্ধ—তার মিল, পংক্তির ও ভাবের স্তরবিন্যাস, সবই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতাগুলোতে সেই জটিলতা অনেকটা পরিহার করা হয়েছে। তবে তাঁর চতুষ্পদীগুলো যথেষ্ট ভাবঘন আর কবিতা হিসাবে উৎকৃষ্ট, তাই সেগুলোকেও সনেট বলাই সংগত।

এই কবিতায় দেখা যাচ্ছে, মানুষের যে প্রতিদিনের জীবন—আশা আনন্দ বেদনা এসবের দ্বারা হিল্লোলিত—কবি সেই জীবনের ভাগী হতে চাচ্ছেন,

আর বিশেষভাবে চাচ্ছেন সেই জীবনের ভাগী হয়ে অমর গান রচনা করতে। কিন্তু সে-সামর্থ্য যদি তাঁর না হয় তবু তিনি তাঁর চারপাশের মানুষদের আনন্দদানের জন্য কবিতা লিখবেন ও কালে বিলীন হয়ে যাবেন। তাঁর কবিতাও যদি তেমনিভাবে বিলীন হয়ে যায় তাতে তিনি দুঃখিত হবেন না। তিনি যে মানুষকে অল্পকালের জন্যও আনন্দ দিতে পেরেছেন, তাদের থেকে প্রীতি পেয়েছেন, তারও সার্থকতা তাঁর কাছে কম নয়।

আমাদের এই মরজীবনের মধ্যেই অমৃত রয়েছে মানুষের প্রেম-প্রীতিতে, তার মহৎ উদ্যমে, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্যে—এই চিন্তা কালে কালে কবির মধ্যে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এই চিন্তার আভাস তাঁর অল্পবয়সের রচনায়ও বিদ্যমান। কবির সাধ এবং কবির বিনয় দুই-ই চিত্তগ্রাহী হয়েছে এই কবিতাটিতে।

এর পরের দুইটি কবিতা 'পুরাতন' ও 'নূতন' কবির নতুন-বৌঠাকরুনের স্মৃতি-বিজড়িত। এই দুইটি কবিতা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে রচিত। সেই মৃত্যু কবির জন্য 'অশনিপাতে'র মতো নিদারুণ হয়েছিল; কিন্তু কবি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছেন, কালচক্র কি অমোঘ নিয়মে আবর্তিত হয়, আর তার ফলে—

বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।

পুরাতনকে তাই বিদায় দিতে হয় আর নতুনকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়—এই-ই বিশ্ব-নিয়ম। নতুনকে তাই কবি সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাচ্ছেন অন্তরের কোণে এই বেদনাটুকু নিয়ে যে—

সেও চলে যাবে কবে, গীতগান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

আর শান্তচিত্তে পুরাতনকে বলছেন—

হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

অনন্ত বলতে এখানে মোহিতবাবু শূন্য বুঝেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনন্ত কখনো শূন্য নয়। প্রভাতবাবুও 'পুরাতন'কে এই বিদায় দেওয়ার সুরটি ঠিক ধরতে পারেন নি, আর তার ফলে এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন : "আসল কথা, তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) শোক বা সুখ কোনোটিই স্থায়ী রেখাপাত করিত না।" প্রভাতবাবু অবশ্য রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছে থেকে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছেন। কিন্তু তাহলেও বলতে হবে—তিনি এক্ষেত্রে ভুল করেছেন। এ-সম্পর্কে গ্যেটের একটি উক্তি থেকে প্রচুর আলোক পাওয়া যাবে—Only he who has been the most sensitive can become the hardest and coldest of men, for he has to encase himself in triple steel...and often his coat of mail oppresses him (যিনি সবচাইতে অনুভূতিপ্রবণ কেবল তিনিই হতে পারেন সবচাইতে কঠিন ও নির্বিকার, কেননা, তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত করা···আর অনেক সময় এই বর্ম হয় তাঁর জন্য পীড়াদায়ক)।—পুরাতনকে বিদায় দিতে কবি যে বেদনাবোধ করছেন—তাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক—তার পরিচয় রয়েছে এই দুটি কবিতারই কয়েকটি শব্দে ও বাক্যে। 'যোগিয়া' কবিতাটিতেও বেদনামাখা পুরাতন স্মৃতির কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া পরে পরে আমরা দেখব কবির অন্তর কত কোমল ও স্নেহময়।

'কড়ি ও কোমলে' বহু রকমের কবিতা ও গান স্থান পেয়েছে—তার অনেকগুলো স্বদেশ-মঙ্গলমূলক। কিন্তু কবিতা হিসাবে খুব বিশিষ্ট ও উৎকৃষ্ট হয়েছে এর চতুর্দশপদী বা সনেটগুলোই—বিশেষ করে যেগুলোতে কবি নারী-মাধুর্য সম্বন্ধে তাঁর প্রথম চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এই কবিতাগুলোর উচ্চমূল্য সম্বন্ধে আমাদের সমালোচকরা মোটের উপর একমত।

এই কবিতাগুলো সম্পর্কে খুব লক্ষণীয় হয়েছে এই ব্যাপারটি—নারীর দেহ-মাধুর্যের বর্ণনা এতে মনোরম হয়েছে ; কিন্তু আদিরসাত্মক কবিতা বলতে যা বোঝায় এই কবিতাগুলো একই সঙ্গে তা হয়েছে ও হয় নি। নারীর দেহ-মাধুর্যে কবির গভীর আনন্দ এগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে ; কিন্তু তার সঙ্গেই প্রকাশ পেয়েছে নারী সম্পর্কে তাঁর অপূর্ব সম্ভ্রম এবং পবিত্রতাবোধও। কবি বয়সে নবীন ; তাঁর প্রিয় কবি যাঁরা, যেমন জয়দেব, বিদ্যাপতি, কালিদাস, তাঁদের আদিরসের কবিতা পুরোপুরি আদিরসাত্মক ; কিন্তু এই কবি আপন প্রকৃতির ধর্মে নবযৌবনেই একই সঙ্গে অনুভব করেছেন নারী-দেহের অপূর্ব মাধুরী আর নারী সম্পর্কে অপূর্ব পবিত্রতা। পরে দেখা যাচ্ছে মাধুর্যের

চাইতে সম্ভ্রম ও পবিত্রতা-বোধের দিকেই কবির দৃষ্টি বেশি গেছে। আমাদের কোনো কোনো সমালোচক এতে প্রত্যক্ষ করেছেন কবির মনের উপরে তাঁর পরিবেশের নৈতিক শুচিতাবোধের জবরদস্তি। কিন্তু কবিকে এইভাবে বোঝা ভুল বোঝা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নরনারী-নির্বিশেষে ব্যক্তির জীবনের যে অসীম মর্যাদা কবির কাছে, মনে হয়, তার প্রভাবে সহজভাবে সংযমিত হয়েছে তাঁর ভোগাকাঙ্ক্ষা আর দেখা দিয়েছে এই অসাধারণ দায়িত্ববোধ। তা এই সম্ভ্রমের জন্ম যেমন করেই হোক কবির অন্তরে এ এক সত্যবস্তু। তাঁর কাব্যে এর মহত্তর পরিণতি আমরা পরে পরে দেখব।

এই সনেটগুলোতে কবির প্রকাশ-সামর্থ্য হঠাৎ এমন উচ্চ স্তরে আরোহণ করেছে যে তা দেখে চমৎকৃত হতে হয়—ভাববিভোরতার কুয়াশার স্তর কাটিয়ে কবি যেন হঠাৎ সূর্যালোকিত সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন—সেখানে সব রূপময়, সব বিশিষ্ট, তাই অশেষ-আনন্দপ্রদ।

আরো একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই কবিতাগুলোর মধ্যে আছে। এর জগৎ আমাদেরই পরিচিত সমাজ ও সংসার—সেই সংসারের এক কোণে নবপ্রণয়ীযুগলের ঠাঁই হয়েছে, সেখানে তারা নতুন প্রেমাকুল জীবন যাপন করছে। নায়িকার মধুময় সংকোচ আমাদের সুপরিচিত। কিন্তু পরিচিত পরিবেশ এখানে একান্ত হয়ে এই নবীন প্রণয়ের বিশ্বজনীন রূপ আচ্ছন্ন করে নি। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে কবিভ্রাতা বলে সম্বোধন করেছিলেন তাঁর 'সোনার তরী'তে সেই কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মূল্যবান সনেটগুলোয় কিন্তু 'বাঙালীয়ানা' অনেক জায়গায় কিছু বেশি প্রকট হয়েছে। জীবন-বোধও তাতে অনেক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিসরের।—উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক সৃষ্টিতে প্রাদেশিকতা, অর্থাৎ পরিবেশ-চেতনা, চাই-ই, কিন্তু সেই সঙ্গে সার্বজনীনতাও পুরোপুরি চাই।

কিন্তু এর সবগুলো কবিতাতে প্রকাশ যে তেমন উচ্চাঙ্গের হয়েছে তা নয়, বরং কোনো কোনোটিতে ভাববিভোরতার প্রভাব সুস্পষ্ট। বোধহয় কবি সেইজন্য বলতে চেয়েছেন যে তাঁর পরিণত রচনার সূচনা 'মানসী'র কাল থেকে।

এর 'মঙ্গল-গীত' কবিতাটি সুদীর্ঘ। সেই দীর্ঘতা সহজেই এর শিল্প-সৌন্দর্যের জন্য কিছু হানিকর হয়েছে। কিন্তু এর শেষের এই ক'টি চরণে

ব্যক্ত হয়েছে এই নবীন বয়সেও মানব-মঙ্গল কবির অন্তরে কী বড় জায়গা দখল করেছিল সেই কথাটি। এটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি কবিতা-পত্র :

আমার এ গান যেন পশি তোর কানে
মিলায়ে মিশায়ে যায় সমস্ত পরানে।
তপ্ত শোণিতের মতো
বহে শিরে অবিরত,
আনন্দে নাচিয়া ওঠে মহত্ত্বের গানে।

এ গান বাঁচিয়া থাকে যেন তোর মাঝে,
আঁখিতারা হয়ে তোর আঁখিতে বিরাজে।
এ যেন রে করে দান
সতত নূতন প্রাণ,
এ যেন জীবন পায় জীবনের কাজে।

যদি যাই, মৃত্যু যদি নিয়ে যায় ডাকি,
এই গানে রেখে যাব মোর স্নেহ-আঁখি।
যবে হায় সব গান
হয়ে যাবে অবসান,
এ গানের মাঝে আমি যেন বেঁচে থাকি।

কবির এ একটি অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, এবং তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা কালে পূর্ণ হয়েছে বলা যায়।

এর যেসব উৎকৃষ্ট চতুর্দশপদীর বা সনেটের কথা আমরা বলেছি সেগুলো ভিন্ন আরো কতকগুলো ভালো চতুর্দশপদী এতে আছে, যেগুলোতে 'সত্য', 'ঈশ্বর', 'বিশ্বের কর্তৃত্বস্থানে বসে অন্ধ নিয়তি না কোনো কল্যাণ-শক্তি', এইসব প্রশ্ন বেশ সংহত আকার ধারণ করেছে। সেগুলোকে কবির পরিবেশের প্রতিধ্বনি জ্ঞান করলে ভুল করা হবে, কেননা, সেসব প্রশ্নে আন্তরিকতা যথেষ্ট। বিশ্বব্যাপী আনন্দ সম্বন্ধে এক মরমী চেতনা অল্প বয়সেই কবির মনে জেগেছিল—তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে—

সেই চেতনা এইসব গূঢ় প্রশ্ন নবযৌবনেই কবির মনে জাগিয়ে চলেছে, এই ধারণাই বরং সংগত মনে হয়। যথাসময়ে এর সুপরিণতি আমরা দেখব।

মানসী

'কড়ি ও কোমলে' আমরা নানা রকমের কবিতা দেখেছি, আর সেসবের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় হচ্ছে প্রেম, মানব-মঙ্গল আর জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্নগর্ভ কবিতাগুলো। 'মানসী'তেও তেমনি নানা ধরনের কবিতা স্থান পেয়েছে, কিন্তু সেসবের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় প্রেম সম্বন্ধে কবিতাই। প্রেমের বহুদিকে এইকালে কবির মনোযোগ যে আকৃষ্ট হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছে। প্রেম ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও এতে যেসব উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে সেসবেরও কিছু কিছু পরিচয় দিতে আমরা চেষ্টা করব।

এই কাব্যে আরও লক্ষণীয় কবির শিল্পচাতুর্য। 'কড়ি ও কোমলে'ও কবির এই ক্ষমতার নবস্ফুরণ আমরা দেখেছি। 'মানসী'তে তাঁর শিল্পচাতুর্য আরো চোখে পড়বার মতো হয়েছে। ছন্দের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও এতে কবি করেছেন।

'কড়ি ও কোমলে' আমরা দেখেছি প্রিয়াতে কবির সুনিবিড় আনন্দ। 'কড়ি ও কোমলে' কবির প্রিয়া ব্যক্তিত্ববর্জিত নন, তবে তাঁর বড় পরিচয় এই যে তিনি কবির প্রতি সুপ্রসন্ন—তাঁর সেই প্রসন্নতা কবির জন্য হয়েছে যেন এক দৈব আশীর্বাদ, সেই আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে কবি দেবতার মতো উপভোগ করছেন প্রিয়ার দেহমনের দিব্য মাধুর্য। কিন্তু 'মানসী'র সূচনাতেই দেখা যাচ্ছে প্রিয়ার সঙ্গে কবির সম্পর্কে কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছে—কবির প্রতি পূর্বের সেই প্রসন্নতা প্রিয়ার চোখে-মুখে আর ব্যক্ত হয় না। এর ফলে কবির অন্তরে সহজেই অস্বস্তি দেখা দিয়েছে—তাঁর কল্পনায় সেই অস্বস্তি মাঝে মাঝে সংকটের আকার ধারণ করছে। তাতে কবি মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকটা সান্ত্বনা পাচ্ছেন এই কথা মনে স্থান দিয়ে যে প্রিয়াতে ও তাঁতে আসলে মনের অমিল ততটা ঘটে নি।

'মানসী'র সূচনার ক'টি কবিতায় প্রেম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা মোটের উপর প্রেমের হালকা দিক; তাই এগুলোতে বেশি লক্ষণীয় হয়েছে কবির নতুন প্রকাশচাতুর্যই; যেমন:

বেল-কুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর খোলা

অথবা

চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া

অথবা

আবার দুটি নয়নে লুটি
হৃদয় হরে নিবে কে?...

কিন্তু সূচনার ক'টি কবিতার পরেই আমরা পাচ্ছি 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটি। প্রেম সম্বন্ধে এটিকে জ্ঞান করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে শক্তিশালী কবিতা—তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর অন্যতম।

কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রিয়াকে একান্তভাবে পাবার আগ্রহ কবির ভিতরে খুব প্রবল হয়েছে—সেই প্রাবল্যে কবির সমস্ত সত্তা যেন আন্দোলিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাসনার প্রাবল্যই কবির ভিতরে সত্য হয় নি, কবির চিত্তের অসাধারণ সচেতনাও তাঁর মধ্যে তুল্যরূপে ক্রিয়াশীল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে কবির দুর্বার বাসনা 'মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো' সংযমিত হয়েছে, আর কবি নিজেকে বোঝাতে পারছেন:

সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস।
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে।
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,

এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে !

এই কবিতায় একই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বাসনার উদগ্রতা আর তার অসাধারণ সংযমন। এমন সৌভাগ্য মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। গ্যেটের মতে আত্মজয় অতি কঠিন ব্যাপার, মানুষের সজাগ ইচ্ছাশক্তি যেন তার জন্য যথেষ্ট নয়, এ ব্যাপারে যাঁদের সিদ্ধিলাভ ঘটে তাঁদের বলা যেতে পারে দৈবানুগৃহীত। যাই হোক, কবির ক্ষেত্রে এই যে অপূর্ব সংযমন সম্ভবপর হয়েছে, প্রেম সম্বন্ধে কোনো রোমান্টিক, অর্থাৎ জীবনক্ষেত্র থেকে পলাতক, ধারণার বশীভূত হয়ে তাকে হালকা করে দেখলে আমরা সত্যাশ্রয়ী হব না, আর তাতে করে ক্ষতিগ্রস্তই আমরা হব।—কবি মোহিতলাল তাঁর আলোচনায় (প্রথম খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা) প্রেম সম্বন্ধে Quiller-Couch-এর একটি বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে প্রেমের যে-রূপের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে তা মোহকর নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা ধ্বংসধর্মী ভিন্ন আর কিছু নয়।···Love the invincible destroyer—destroying the world for itself—itself too at last ; Love voluptuous, savage, perfidious, true to itself, though rooted in dishonour—extreme, wild, divine, merciless as a panther on its prey—জীবনে এবং সাহিত্যে এই বর্বর ধ্বংসধর্মী প্রেমের সাক্ষাৎকার আমরা সময় সময় লাভ করি (টলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা'র 'ভ্রন্‌স্কি'-র কথা স্মরণীয়) ;

মানুষের চিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবার ক্ষমতাও এই প্রেমের যে আছে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় এই ধরনের প্রেম সম্বন্ধে Quiller-Couch-এর ভঙ্গির দার্শনিকতা করতে গিয়ে যে ধরনের চিন্তা-ভাবনার পরিচয় দেওয়া হয় তা রোমান্টিকতা—জীবন ও সত্যের অভিসারী তা নয়, তা আসলে খেয়ালী। মোহিতবাবু কিন্তু সেই খেয়ালী ধ্বংসধর্মী প্রেমকেই জ্ঞান করেছেন স্বাভাবিক আর 'নিষ্ফল কামনা'য় প্রেমের যে নতুন সৃষ্টিধর্মী রূপ ব্যক্ত হয়েছে তাকে জ্ঞান করেছেন egoistic—'মানবতাবিরোধী আত্মধর্মীয়'। তা মতভেদ তো সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ—অদ্ভুত মতবিরোধও। আমরা পাঠকদের অনুরোধ করব রবীন্দ্রনাথ প্রেমের যে নতুন সম্ভাবনা দেখেছেন সে-সম্বন্ধে অবহিত হতে। বলা বাহুল্য প্রেম সম্বন্ধে এই ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ ও বিশ্ববোধ ওতপ্রোতভাবে

এই কবিতার ছন্দও লক্ষণীয়। এই ছন্দে কবি আর কোনো কবিতা লেখেন নি। তাঁর গভীর আবেগ ও গভীর চিন্তা দুয়েরই যোগ্য বাহন হয়েছে এই ছন্দ। একটি দুর্বল বা অনাবশ্যক চরণ এতে নেই, সেটিও লক্ষণীয়।

প্রেমের অবস্থা-বৈগুণ্য বা সংকট সম্বন্ধে আরো কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা 'মানসী'তে আছে, যেমন 'নারীর উক্তি' 'পুরুষের উক্তি' 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম'। নারীর উক্তিতে প্রেমিকার ধারণা হয়েছে তার প্রেমিকের অন্তরে প্রেমের উষ্ণতা পূর্বের মতো আর নেই। প্রেমিকা স্বভাবত তাতে খুব ব্যথিত—তার সেই ব্যথা কবি নিপুণ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন এর অনেক ছত্রে, যেমন :

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জান না তাহা—আমি তাহা জানি।

অথবা

কোনো কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।

নীরবে চরণ ফেলে চুপিচুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

অথবা

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না ?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি ? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।

এসব অবশ্য প্রেম সম্বন্ধে তেমন কোনো গভীর কথা নয়। কিন্তু এসব প্রাত্যহিক জীবনের সত্য, আর প্রাত্যহিক জীবনের সত্য যে এমন হৃদ্য রূপ পেয়েছে সেজন্য এসব মূল্যবান।

প্রতিদিনের প্রেম সম্বন্ধে একটি গভীর সত্যও রূপ পেয়েছে এতে :

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

একালের প্রিয়ার মুখেই এই উক্তি শোভন, কেননা, একালের প্রিয়া বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বশালিনী।

'পুরুষের উক্তি' কবিতাটিতে প্রেমিক বলছে, প্রিয়ার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের ক্ষণে তাকে অবলম্বন করে তার মনে সৌন্দর্যের এক দিব্যমূর্তি জেগেছিল—

তখন উষার আধো আলো
পড়েছিল মুখে দু-জনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।

* * *

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

কিন্তু

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যা-বায় করে ওঠে হায় হায়
অরণ্য মর্মরি ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় একি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই।
অথবা যে রত্ন তরে এসেছিনু আশা করে,
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

প্রেমিক ক্রমে আরও বুঝতে পারলে :

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখি কাঁদে এই বাসনার টানে।

এমনভাবে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া দুঃসহ। কিন্তু এমন সংকটের সম্মুখীন হয়েও রবীন্দ্রনাথের প্রেমিক হতাশ হচ্ছে না। তার প্রিয়া পুরোপুরি মানবীই—দেবী নয়—এই নিয়তি সে স্বীকার করে নিয়ে বলছে :

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এসো থাকি দুই জনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্প-অর্ঘ্যভার।

রোমান্টিক কবিদের মতো কবি যে তাঁর প্রেমের স্বপ্নের এমন পরিণতি দেখে হতাশ হন নি, বরং এই নবীন বয়সেই প্রেমের সার্থকতা সম্বন্ধে এমন পরিণত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন, এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবির এই ধরনের চিন্তা তাঁর বহু লেখায় আমরা পাব।

'ব্যক্ত প্রেম' কবিতাটি সম্বন্ধে 'রবি-রশ্মি'তে চারুবাবু মন্তব্য করেছেন, 'এই কবিতাটিকে কোনও কুলত্যাগিনী প্রণয়িপরিত্যক্ত প্রেমিকার বিলাপ

বলা যাইতে পারে।' কিন্তু তাতে যে কবিতাটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয় তা বোঝা যায় কবিতাটির প্রথম স্তবকের শেষ ছত্র থেকে—'শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন ?'

আমাদের মনে হয়েছে এর কথাটি এই : একটি কুমারী একটি যুবককে মনে মনে ভালোবাসে ; সেই ভালোবাসা তার জীবনের দৈনন্দিন কর্মে কোনো বাধা উপস্থিত করে নি বরং তার প্রতিদিনের ছোটখাটো কাজের মধ্যে তাকে এক গভীর গোপন আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু কালে তার সেই ভালোবাসার কথা যুবকটি জেনেছে এবং অন্যেরাও জেনে ফেলেছে, অথচ যুবকটি তরুণীকে বিবাহ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। এতে তরুণীটি নিজেকে লাঞ্ছিতা বোধ করছে, আরো বিশেষ করে এইজন্য যে যে-প্রেম তার অন্তরে ছিল গুপ্ত তা এমন ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। এ-সম্পর্কে তরুণীর অভিযোগ 'মানিকের মতো'ই দীপ্ত ও তীক্ষ্ণরশ্মি :

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

প্রেম যখন প্রথম কারো হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় তখন সেই প্রেমিক বা প্রেমিকা, বিশেষ করে প্রেমিকা, অন্যের কাছে তা প্রকাশ করতে খুব কুণ্ঠা বোধ করে। ভগবৎ-প্রেম সম্বন্ধেও এই ভাব দেখতে পাওয়া যায়, যেমন :

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়
কেহ কিছু নারে কহিতে। (ক্ষণিকা)

এই কবিতার যে এই ধরনের ছত্রগুলো—

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,
পল্লবের সুচিকন ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি ধুলায় হায় যাই গড়াগড়ি

এসবে বিড়ম্বিতা নবঅনুরাগিণীর ক্ষোভ তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে—কোনো সত্যকার 'পতন' ব্যক্ত হয় নি।

এটি আমাদের দেশেরই চিত্র—যেখানে পূর্বরাগ আজো নিন্দিত। কবির যৌবনকালে তা তো খুবই নিন্দিত ছিল।

এর 'গুপ্তপ্রেম' একটি অপূর্ব প্রেমের কবিতা। প্রেমিকা কুরূপা, তাই তার অন্তরে যে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে সে-কথা তার প্রেমাস্পদকে জানাতে কুণ্ঠার আর অন্ত নেই। সেই কুণ্ঠা অপূর্ব ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে এর অনেক ছত্রে, যেমন :

যার নবনী-সুকুমার কপোলতল
কী শোভা পায় প্রেমলাজে গো;
যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

অথবা

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরিয়া উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ-আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

অথবা

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না তো অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
তাহারো চেয়ে সে যে মহীয়ান।

প্রেমের প্রভাবে কুরূপায় এত রূপ ফোটে জগতের খুব কম কবিই তা এমন করে দেখাতে পেরেছেন। আমাদের কবি যে পেরেছেন তার বড় কারণ আমাদের দেশের শত শত বৎসরের ভক্তিনিবেদনের ঐতিহ্য, আর সেই ঐতিহ্যে কবির সুগভীর অনুরাগ।

এর 'বধূ' কবিতা খুব জনপ্রিয়। গ্রামের অল্পবয়স্কা মেয়ের শহরে বিয়ে হয়েছে, শহরের অপরিচিত পরিবেশে সে আনন্দবোধ করছে না; এতে তার

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার উপরে অসন্তুষ্ট, কেননা তাদের ধারণা, শহর গ্রামের তুলনায় অনেক ভালো, কিন্তু সেই ভালো জায়গায় এসেও নববধূ যে খুশী হতে পারছে না সে কেবল তার গ্রাম্য স্বভাবের দোষে। গ্রামের উদার আকাশ, মাঠঘাট, এসবের অভাব নববধূ খুব অনুভব করছে ; স্নেহ-সমবেদনা-হীন শহরকে তার মনে হচ্ছে কারাগারের মতো নিরানন্দ—

ইটের 'পরে ইট মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা।

তার মায়ের কথা, সন্ধ্যা হলে মায়ের মুখে যেসব উপকথা সে শুনত সেসব, তার মনে পড়ে এবং মনে পড়ায় সে খুব বিমনা হয়। মাঝে মাঝে তার মনে হয় তার বর্তমান নিরানন্দ বন্দীদশা থেকে মুক্তি যখন নেই তখন এ জীবনের চাইতে দিঘির জলে মরণ অনেক ভালো।

শহরের নানা বাধা-নিষেধের জীবনের মধ্যে এসে মুক্ত আলোবাতাসে মানুষ গ্রামের মেয়ের মনের ভাব কেমন হয় সেই ছবি চমৎকার আঁকা হয়েছে এতে। অঙ্কনের সেই চমৎকারিত্বের কথা ভেবে আমাদের কোনো কোনো সমালোচক এই কবিতাটির উচ্চ সাহিত্যিক মূল্য নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তা বোধ হয় পুরোপুরি করা যায় না এই প্রধান কারণে যে এতে প্রাদেশিকতা অর্থাৎ আমাদের দেশের ও সমাজের বিশেষ পরিবেশ, বেশি ফুটেছে, সে তুলনায় সার্বজনীনতার দিকটা কম লক্ষণীয় হয়েছে। 'খেয়া'র 'বালিকা-বধূ' কবিতাটির সঙ্গে এই কবিতাটির তুলনা করলে তা ভালো বোঝা যাবে।

'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গ' যে শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সংখ্যা খুব বেশি নয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পুরীতীর্থযাত্রী-বাহী দুইখানি জাহাজ প্রবল ঝড়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায়; তাতে প্রায় 'আটশ' লোকের প্রাণহানি ঘটে। সেই নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষে এই কবিতা রচিত।

প্রকৃতির ভীষণতা ও নির্মমতার কথা কবির যেসব লেখায় ব্যক্ত হয়েছে সেই সব লেখায় তাঁর মূল প্রশ্ন এই ধরনের :

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব!

সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব !
ঐ যে জন্মের তরে জননী ঝাঁপায়ে পড়ে
কেন বাঁধে বক্ষ 'পরে সন্তান আপন !
মরণের মুখে ধায়, সেথাও দিবে না তায়,
কাড়িয়া রাখিতে চায় হৃদয়ের ধন !

* * *

এ বল কোথায় পেলে, আপন কোলের ছেলে
এত করে টানে।
এ নিষ্ঠুর জড়-স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।
নৈরাশ্য কভু না জানে, বিপত্তি কিছু না মানে
অপূর্ব অমৃতপানে অনন্ত নবীন,
এমন মায়ের প্রাণ যে বিশ্বের কোনোখান
তিলেক পেয়েছে স্থান সে কি মাতৃহীন ?

নবীন কবির প্রকাশ-সামর্থ্য লক্ষণীয়।

এই প্রশ্নই এই কবিতার রস বা ভাববস্তু। কবিতাটির সূচনায় জড়-প্রকৃতির ভীষণতার একটি শক্তিশালী বর্ণনা রয়েছে। সেখানে রুদ্র-ভীষণের একটা রসরূপ যেন ফুটে উঠেছে। কিন্তু আসলে তা আনুষঙ্গিক। সৃষ্টিতে জড়ের ভয়াবহতা সম্বন্ধে প্রশ্নই কবির মূল কথা। কবির জীবনের শেষের দিকের বিখ্যাত 'পৃথিবী' কবিতায়ও প্রকৃতির ভীষণতা অপূর্ব রূপ পেয়েছে। কিন্তু তারও অন্তরাত্মায় রয়েছে কবির এমন ব্যথিত প্রশ্ন।

এর 'নিন্দুকের প্রতি নিবেদন' কবিতাটিকে প্রভাতবাবু ও চারুবাবু কবির একটি দুর্বল রচনা জ্ঞান করেছেন। কিন্তু আসলে কবির এইজাতীয় রচনার মধ্যে এটি সবচাইতে শক্তিশালী ও স্মরণযোগ্য। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'কড়ি ও কোমলে'র কোনো কোনো কবিতার জন্য কটুভাষায় কবিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন, কবি তার উল্লেখ করেছেন। এই কবিতাটিতে কবি সেই কটু ভর্ৎসনার উত্তর দিয়েছেন মনে হয়। কিন্তু কটুভাষার প্রত্যুত্তরে

কবি কোনো কটুভাষা ব্যবহার করেন নি ; বরং তাঁর প্রতিপক্ষকে শান্ত ও সংযত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন :

তোমার দেবার যদি কিছু থাকে
তুমিও দাও না এনে !
প্রেম দিলে সবে নিকটে আসিবে
তোমারে আপন জেনে।

*   *   *

এতই কোমল মানবের মন
এমনি পরের বশ,
নিষ্ঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।

*   *   *

ঘৃণা জ্বলে মরে আপনার বিষে,
রহে না সে চিরদিন,
অমর হইতে চাহ যদি, জেনো
প্রেম সে মরণহীন !

এই কবিতায় নির্মম আঘাতের জন্য কবির বেদনা-কাতরতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাঁর অপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ও প্রকাশ পেয়েছে :

কত প্রাণপণ দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি ?

এসব চরণ অবিস্মরণীয়। কবি কোমল অন্তঃকরণের, তাই এমন অপ্রত্যাশিত ও রূঢ় আঘাতে গভীরভাবে আহত হওয়া তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এই বয়সে আপন অন্তরাত্মায় নির্ভয়তাও যে তিনি কতখানি লাভ করেছেন তাই-ই এই কবিতার শান্ত কথাগুলোর ভিতরে লক্ষ্য করবার বিষয়। এই গুণেই এটি কবির একটি বিশিষ্ট রচনা হয়েছে।

পরিবেশের এমন প্রাগ্রসরতা-বিরোধী দশায় কবির আত্মপ্রত্যয় ও নির্ভয়তা প্রকাশ পেয়েছে 'মানসী'র আরো অনেকগুলো কবিতায়।

সেসবের কতকগুলো ব্যঙ্গধর্মী, যেমন, 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর' 'ধর্মপ্রচার' 'দুরন্ত আশা' 'নববঙ্গদম্পতীর প্রেমালাপ' প্রভৃতি, আর 'পরিত্যক্ত' ও 'ভৈরবী গান'-এ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখে কবি একই সঙ্গে বেদনাবোধ করেছেন ও নিজের লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রভাতবাবু বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়াধর্মিতার জন্য কবির দুঃখ ও বেদনাবোধ তাঁর 'পরিত্যক্ত' ও 'ভৈরবী গান' কবিতা দুটিতে ব্যক্ত হয়েছে। 'পরিত্যক্ত' কবিতা সম্পর্কে তাঁর মত গ্রহণ করার যোগ্য; কিন্তু 'ভৈরবী গান' কবিতাটি সম্বন্ধে তাঁর মত বিশেষিত করবার প্রয়োজন আছে।

'পরিত্যক্ত' কবিতাটিতে কবি তাঁর শ্রদ্ধেয় পূর্ববর্তীদের লক্ষ্য করে যা বলেছেন মোটের উপর তা এই :

একদা জাগিনু, সহসা দেখিনু
প্রাণমন আপনার;
হৃদয়ের মাঝে জীবন জাগিছে
পরশ লভিনু তার।

* * *

স্বদেশের কাছে দাঁড়ায়ে প্রভাতে
কহিলাম জোড়করে—
"এই লহ, মাতঃ, এ চিরজীবন
সঁপিনু তোমারি তরে!"

* * *

কোথা গেল সেই প্রভাতের গান,
কোথা গেল সেই আশা,
আজিকে বন্ধু, তোমাদের মুখে
এ কেমনতর ভাষা!

* * *

তোমরা আনিয়া প্রাণের প্রবাহ
ভেঙেছ মাটির আল,

তোমরা আবার আনিছ বঙ্গে
উজান স্রোতের কাল।

নিজের জীবন মিশায়ে যাহারে
আপনি তুলেছ গড়ি
হাসিয়া হাসিয়া আজিকে তাহারে
ভাঙিছ কেমন করি?

কিন্তু তাঁদের এমনতর আচরণে কবি আপন ব্রত থেকে স্খলিত হবেন না এই তাঁর সংকল্প। এই আন্তরিক সংকল্প এই কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে, জাতীয় জীবনেও গভীরভাবে অর্থপূর্ণ করেছে :

বন্ধু, এ তব বিফল চেষ্টা
আর কি ফিরিতে পারি?
শিখরগুহায় আর ফিরে যায়
নদীর প্রবল বারি?
জীবনের স্বাদ পেয়েছি যখন,
চলেছি যখন কাজে,
কেমনে আবার করিব প্রবেশ
মৃত বরষের মাঝে?

'ভৈরবী গান' কবিতাটিতে দেশের পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের শুধু প্রাগ্রসরতা-বিরোধিতার কথাই কবি ভাবছেন না, সমস্ত উদ্যমের পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনেও মাঝে মাঝে যেসব সন্দেহ উপস্থিত হয় তার কথাও চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন :

যদি কাজ নিতে হয়, কত কাজ আছে,
একা কি পারিব করিতে।
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে।
কেন অকূল সাগরে জীবন সঁপিব
একেলা জীর্ণ তরীতে।

মোহিতবাবু 'ভৈরবী গানে' টেনিসনের Lotos-Eaters কবিতার, বিশেষ করে তার Choric song-এর, ছায়া দেখেছেন। টেনিসনের কবিতার কোনো কোনো চরণের সঙ্গে 'ভৈরবী গানে'র কোনো কোনো চরণের কিছু কিছু মিল যে আছে তা মিথ্যা নয়। কৌতূহলী পাঠকরা এই ছুটি কবিতা মিলিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এই দুই কবিতার মধ্যে প্রকৃতিগত প্রভেদ রয়েছে—সেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। Lotos-Eaters-এর গ্রীক যোদ্ধারা ক্লান্তি ও মানসিক অবসাদের পরিচয়ই বেশি দিচ্ছে, সেই অবসাদের ফলে সমস্ত উদ্যম, এমন-কি পরিজনের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার সাধও, তারা বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু 'ভৈরবী গান' কবিতায় কবির দেশের লোকদের মনে এবং কবির নিজের মনেও তাঁদের উদ্যমের ভবিষ্যৎ সার্থকতা সম্বন্ধে যেসব সন্দেহ জেগেছে আর তার ফলে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার কথা অগ্রগণ্য হতে চাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সেই পরিচিতের ও অভ্যস্তের মায়া কবি অতিক্রম করতে পারছেন আর সামনে চলার সংকল্পই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছেন :

ওগো, থামো, যারে তুমি বিদায় দিয়েছ
তারে আর ফিরে চেয়ো না।
ওই অশ্রু-সজল ভৈরবী আর
গেয়ো না।
আজি প্রথম প্রভাতে চলিবার পথ
নয়নবাষ্পে ছেয়ো না।

* * *

ওগো এর চেয়ে ভালো প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণ-কঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

কবির এমন দ্বিধা তাঁর 'ভৈরবী গান' কবিতাটিকে বিশেষ উপভোগ্য ও লক্ষণীয় করেছে। কবি শিল্পী যত বড়, বাস্তবধর্মী যে তারও চাইতে বেশি এই কবিতাটি তারও একটি প্রমাণ।

'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতাটি বিখ্যাত। কালিদাসের 'মেঘদূত' এক নতুন কান্তি ধারণ করেছে একালের পরমসৌন্দর্যোপাসক বাঙালি কবির প্রতিভায়। এই কবিতাটি সম্বন্ধে মোহিতবাবুর আলোচনা বহুদিক দিয়ে ভালো হয়েছে।

কিন্তু প্রতিভার স্বধর্ম অনুকরণ নয়, স্বীকরণ। যেমন বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে তেমনি কালিদাসের 'মেঘদূত' সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সেই স্বীকরণ-বৃত্তিকে সক্রিয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে (বর্জিত অংশে) তিনি বলেছেন :

> ...তখন বিদ্যাপতি অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদ অবাধে পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই, কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বালককালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহই কিছু আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা এক সময়ে আপনিই কাটিয়া গেল, কিন্তু পদগুলির গভীর সৌন্দর্য আমার অন্তঃকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে।

কালিদাস সম্পর্কে তাঁর ভিতরে সেই স্বীকরণ কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ কোথাও তিনি করেছেন মনে পড়ে না। কিন্তু তেমন স্বীকরণ বা শোধন কালিদাস সম্পর্কে সত্যই তাঁর ভিতরে ঘটেছে, কেননা, মূল 'মেঘদূতে' শুধু যে কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেম ও বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে তাই নয়, তাতে মাঝে মাঝে যে রুচির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাকে স্থূল, এমন-কি কদর্য, না বলে উপায় নেই। (এর মূলে হয়ত তাঁর কালের বিশেষ প্রভাব।) আমাদের কবি কিন্তু অবলীলাক্রমে সেসবের স্পর্শ কাটিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন কামনার ও সৌন্দর্যের মোক্ষধামে :

> অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্যপুষ্পবনে
> নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
> সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
> মণিহর্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
> কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহবেদনা।
> মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
> শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশিরেখা
> পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়।

কালিদাসের 'মেঘদূতে'র বহু ধরনের সৌন্দর্য-বর্ণনায় মধ্যে সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ ও চিত্তগ্রাহী হচ্ছে বিরহিণী যক্ষবধূর বর্ণনা। সে শশিলেখার মতোই সুন্দর শুচি ও আনন্দদায়ক। কবি 'মেঘদূতে'র সেই বহুমূল্য রত্নটির প্রতি যোগ্য সমাদর দেখাতে ভুল করেন নি এবং এতেই প্রকাশ পেয়েছে বহু-অদ্ভুতত্ব-ঘেরা পুরাতনকে অর্থপূর্ণ নতুন প্রাণ ও দেহ দান করবার তাঁর অপূর্ব ক্ষমতা। বলা বাহুল্য এই ক্ষমতা খুব উঁচুদরের কবি-প্রতিভাতেই দেখা যায়। তাই পুরাতনকে রূপ দিতে গিয়ে অনেকেই ভাববিলাসী হন, সার্থক কিছু দাঁড় করাতে পারেন তাঁরাই যাঁরা শুধু শিল্পী নন—দ্রষ্টাও।

এর পরের কবিতা 'অহল্যার প্রতি'। কবির বিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতার পূর্ব-সূচনা এটি। অহল্যার কাহিনীতে কবি দেখেছেন পতিত বা অনুর্বর ক্ষেত্রে কৃষি-কর্মের সূচনা। বোলপুরে এটি লেখা—তখন বোলপুরের ডাঙা জায়গায় আশ্রমের গাছগুলো নতুন বেড়ে উঠছে। সেই চেতনাও হয়ত এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

সূচনায় আমরা বলেছি 'মানসী'তে প্রেমের কবিতার প্রাধান্য। সেই-সব প্রেমের কবিতায় প্রেমের স্বপ্ন আর প্রতিদিনের বাস্তব জীবনে প্রেমের রূপ এই দুইয়ের ঘাত-প্রতিঘাত আমরা দেখেছি। 'মানসী'র আরো কয়েকটি প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে এইবার আমরা আলোচনা করব।

'মানসী'র 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটিকে বলা যায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে একটি নিঃসঙ্গ কবিতা। একটি কিংবদন্তী অবলম্বন করে এই কবিতাটি রচিত। কথিত আছে ভক্তকবি সুরদাস একসময়ে এক বণিকের যুবতী স্ত্রীর রূপলাবণ্যে অত্যন্ত মুগ্ধ হন; কিন্তু অচিরে তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে, তখন তিনি দুইটি সূচ দিয়ে তাঁর দুই চোখ বিদ্ধ করে নষ্ট করে ফেলেন। কবি একসময়ে এই কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন 'আঁখির অপরাধ'।

সংকীর্ণ ও উগ্র Puritanism (কঠোর নীতি-ধর্মের আনুগত্য) এই কিংবদন্তীতে রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন সৌন্দর্যোপাসক কবি এই উৎকট নীতিবোধের কাহিনী নিয়ে কেমন করে কবিতা রচনা করতে পারলেন এই ভেবে কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু সুরদাসের মুখে যে-সত্য কবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তার কথা ভাবলে বোঝা যায় কবির সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর এই কবিতার অসামঞ্জস্য ঘটে নি।

আমরা অনেক কবিতায় দেখেছি কবির অসাধারণ সৌন্দর্য-প্রেম—শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, নারীর রূপযৌবনের মাধুর্যও কবির পরম আনন্দের বিষয় হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই আমরা দেখেছি—সংযম, পবিত্রতাবোধ, এসবের দিকে কবির অন্তরের পক্ষপাত—সৌন্দর্যের ভিতরে তিলমাত্র অশুচিতার স্পর্শ কবির গভীর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। কবির সৌন্দর্যবোধের আত্মাস্বরূপ সেই শুচিতাবোধ এই কবিতায় রূপায়িত হয়েছে। তাঁর সেই শুচিতাবোধ এই কবিতার কয়েকটি ছত্রে এক ভীষণ-মনোহর রূপ পেয়েছে :

খুলে দাও মুখ আনন্দময়ী,
আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল,
উদ্যত যেন বাজ।

অথবা

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত
প্রভাতরশ্মিসম ;
লও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন
এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই
ফুটেছে মর্মতলে ;
নির্বাণহীন অঙ্গারসম
নিশিদিন শুধু জ্বলে।

শুচিতার মর্যাদা সম্বন্ধে এমন তীক্ষ্ণ চেতনা কাব্যে কমই চোখে পড়ে। এই কবিতায় সুরদাসরূপী কবি আরো বলেছেন : জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য বিচিত্রভাবে আমাদের হৃদয় হরণ করছে, আমরাও নিরন্তর সে-সবের দ্বারা অভিভূত হচ্ছি ; কিন্তু শুধু এই বিচিত্র সৌন্দর্য-তরঙ্গে আন্দোলিত হলে আমাদের চলবে না, আমাদের অবলম্বন হওয়া চাই কোনো শাশ্বত সম্পদ :

সবে মিলে যেন বাজাইতে চায়
আমার বাঁশরি কাড়ি,

পাগলের মতো রচি নব গান,
নব নব তান ছাড়ি।

*　　　*　　　*

চারিদিকে ঘিরে করে আনাগোনা
কল্পমূরতি কত,
কুসুমকানন বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মত!
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী
বীণা খসে যায় পড়ি
নাহি বাজে আর হরিনাম গান
বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা
পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল
অকূল লবণ-নীরে!

বলা যায় কবি এইকালে হরির বা ব্রহ্মের বিশেষ অন্বেষণ, বিশেষ উপলব্ধির উপরে, জোর দিয়েছেন—হরিকে নইলে জীবন অনাথ, জীবনের পিপাসা মিটবার নয়, এই চিন্তা তাঁতে প্রবল। কিন্তু কবির প্রৌঢ় জীবনে দেখা যায়, প্রতিদিনের স্নেহপ্রীতির, এমন-কি মোহের মধ্যেও ব্রহ্মের বা পরম-কাঙ্ক্ষিতের সন্ধান তিনি পাচ্ছেন—সেই পরম-কাঙ্ক্ষিতের বিশেষ উপলব্ধির উপরে তিনি জোর দিচ্ছেন না।

এ বিষয়ে আরো আলোচনা পরে পরে হবে।

এই কবিতায় বাসনা-কামনার কদর্যতাকে সুরদাস, অর্থাৎ কবি, কঠিন আঘাত হেনেছেন। তেমন আঘাত খেয়ে তাঁর সৌন্দর্যবোধ যেভাবে নির্মল হয়েছে সেটি তাঁকে পরমার্থের সন্ধান দিচ্ছে :

তবে তাই হ'ক,　　　হয়ো না বিমুখ,
দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি।
হৃদয়-আকাশে　　　থাক না জাগিয়া
দেহহীন তব জ্যোতি!

বাসনামলিন আঁখি-কলঙ্ক
ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার-হৃদয় নীল-উৎপল
চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা
হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব
অনন্ত বিভাবরী।

অন্ধ হওয়ার ফলে সুরদাসের হৃদয় বা জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে, তাঁর সেই অন্ধকার জগৎকে তিনি নীল-উৎপলরূপে উপহার দেবেন এই দেবীর শান্তিরূপিণী পবিত্র মূর্তির পায়ে যে পবিত্র শান্তিরূপিণী মূর্তি আজ তাঁর চোখে পড়েছে। সেই পবিত্র মূর্তির মধ্যেই তিনি দেখবেন তাঁর হরিকে ও এইভাবে অন্ধতার 'অনন্ত বিভাবরী'র মধ্যে আলোকে জেগে থাকবেন। অন্য কথায়, বাসনা-কলুষ-মুক্ত যে সৌন্দর্যবোধ তা তাঁকে দেবে হরির বা অমৃতের সন্ধান।

কবির জীবনের এই স্তরে দেখা যাচ্ছে, ভক্তসাধারণের মতনই শুচিতার মহিমায় একান্ত বিশ্বাসী তিনি। সেই সঙ্গে অবশ্য সৌন্দর্যে তাঁর আস্থা, তার দিকে তাঁর আকর্ষণও, অত্যন্ত প্রবল।

'মানসী'র কয়েকটি প্রেমের কবিতা, যেমন 'বর্ষার দিনে', 'ভালো করে বলে যাও' ও 'সন্ধ্যায়', বিশেষভাবে সংগীতধর্মী—প্রেম সম্বন্ধে একটি ভাবাবেশ বা ভাবমুহূর্ত কবির প্রধান বর্ণনার বিষয়। 'মানসী'র কবিতাগুলো সাধারণত সংগীতধর্মী (lyrical) বেশি, তারও মধ্যে এইসব কবিতা বিশেষভাবে সংগীতধর্মী। পরে পরে দেখা যাবে রবীন্দ্রকবিতার এই সংগীতধর্মিতা আরো বেড়েছে, সেসব রচনা আরো ভাবসমৃদ্ধ হয়েছে।

এর 'শূন্যগৃহে' কবিতায় কবি মানুষের স্নেহপ্রেমের সঙ্গে জগতের 'লৌহবক্ষ' নিয়মের কি সম্বন্ধ পুনরায় সেই প্রশ্ন তুলেছেন। যাদের আমরা ভালোবাসি সেই আমাদের আপনার জন, পুত্রকন্যা, তাদের হারালে আমাদের জীবন যায় না বটে, কিন্তু জীবনের সুখ চলে যায়। কবি প্রশ্ন করেছেন :

সেইটুকু মুখখানি, সেই দুটি হাত,
সেই হাসি অধরের ধারে,

সে নহিলে এ জগৎ শুষ্ক মরুভূমিবৎ,
নিতান্ত সামান্য এ কি বিশ্বব্যাপারে ?

বিশ্ববিধানে এর ভালো উত্তর না পেয়ে কবি ব্যথিতচিত্ত। তিনি পুনরায় প্রশ্ন তুলেছেন :

এ আর্তস্বরের কাছে রহিবে অটুট
চৌদিকের চিরনীরবতা ?
সমস্ত মানব-প্রাণ বেদনায় কম্পমান
নিয়মের লৌহবক্ষে বাজিবে না ব্যথা।

কবির 'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলোয় ও সেই যুগে তাঁকে এই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ ব্যাপৃত দেখব।

'জীবনমধ্যাহ্ন' কবিতাটিতে কবি বিশ্বের স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথা নতুন করে ভাবছেন। তাঁর মনে পড়ছে, প্রথম বয়সে যখন তাঁর জীবন লঘু ছিল, যখন তাঁর মধ্যে কোনো পাপবোধ ছিল না, তখন ঈশ্বর, বিশ্বজগৎ, বিশ্ববিধাতার প্রতাপ, এসবের কথা কিছুই তিনি ভাবেন নি। কিন্তু তারপর :

কুটিল হইল পথ, জটিল জীবন,
বেড়ে গেল জীবনের ভার,
ধরণীর ধূলি মাঝে গুরু আকর্ষণ
পতন হইল বারবার।

এর ফলে নিজের উপর আর তাঁর বিশ্বাস নেই, তাঁর দর্প চূর্ণ হয়ে ধূলির সঙ্গে মিশেছে। আজ তাই তিনি নিখিল-নির্ভর বিশ্বপতির পানে তাকাচ্ছেন আর বিশ্বজগৎ কোন্ পথে চলেছে, তিনিই বা কোন্ পথে চলেছেন, সেসব বুঝতে চাচ্ছেন। কিন্তু বুঝতে গিয়ে বিরাট বিশ্বসংসার দেখে, সেই বিশ্বসংসারের প্রাণধারা থেকে কেমন করে তিনি প্রাণ পাচ্ছেন তা বুঝতে পেরে, চমৎকৃত হচ্ছেন আর অন্তরে অন্তরে অনুভব করছেন প্রশান্ত গভীর এই যে বিশ্বপ্রকৃতি তার মহাপ্রাণসাগরে স্নান করে তিনিও ধূলিম্লান পাপতাপধারা থেকে মুক্তি পাচ্ছেন আর বিশ্বের নিশ্বাস লেগে তাঁর জীবনকুহরে মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজছে।

বিরাট বিশ্বজগতের পাবনী শক্তি সম্বন্ধে চেতনা, তার সঙ্গে তাঁর কল্যাণময়

যোগ, আমরা কবির জীবনে বার বার দেখব। বলা বাহুল্য এ এক নতুন সম্পদ তিনি আমাদের দেশের জীবনে এনেছেন।

১২৯৪ সালের বৈশাখ থেকে ১২৯৭ সালের ১১ই কার্তিক পর্যন্ত রচিত কবিতা 'মানসী'তে স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে অবশ্য কবির অন্যান্য লেখাও যে চলে তা আমরা দেখব। 'মানসী'র কবিতাগুলো রচনার কালে কবি কিছুদিন বাংলার বাইরে গোলাপের দেশ গাজীপুরে আর বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরে ও খিড়কিতে বাস করেছিলেন—বিলেতেও তাঁর কিছুদিন কাটে—রবীন্দ্র-জীবনীতে এসবের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। এইসব স্থানের তেমন বিশেষ কোনো প্রভাব যে 'মানসী'র কবিতাগুলোর উপরে পড়েছিল তা মনে হয় না। বরং মুখ্যভাবে তাঁর কবি-জীবনের একটা স্তরের চিহ্নই এইসব কবিতায় রয়েছে। 'মানসী'র সঙ্গে এর পরের কাব্য 'সোনার তরী'র একটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

আর দুইটি কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করে আমরা 'মানসী'র আলোচনা শেষ করব। সেই দুটির একটি 'অনন্ত প্রেম', অপরটি 'উচ্ছৃঙ্খল'। 'অনন্ত প্রেমে' প্রেমের বিশ্বজনীনরূপ কবির দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে; তিনি দেখছেন, নানা যুগে নানা দেশে প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে ভালোবেসেছে, তাদের জীবনের গতি বিচিত্র হয়েছে, তাদের মিলন-বিরহও বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। সেই অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে কবি নিজেকে আর তাঁর প্রিয়াকে বিদ্যমান দেখছেন। শুধু তাই নয়, তিনি উপলব্ধি করছেন তাঁর আর তাঁর প্রিয়ার প্রেমের মধ্যে সকল যুগের প্রেম, সকল যুগের প্রেমের কাহিনী, একটি অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রেমের যে বিশ্বজনীন রূপের কথা কবি এই কবিতাটিতে বলেছেন সেটি প্রেম সম্বন্ধে মোটের উপর একটি আনন্দকর কল্পনা—পুনর্জন্মবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, এসবের অনুষঙ্গ লাভ করে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কবি তাঁর প্রিয়াতে সব প্রেমের, সব প্রেমকাহিনীর, যে একটা বড় সার্থকতা দেখেছেন সেটি প্রেম সম্বন্ধে একটি বড় সত্য। যখন একজনকে আমরা সর্বান্তঃকরণে ভালো-বাসতে পারি তখন আমাদের অন্তরের সেই সঞ্জীবিত প্রেম জগতের সকলের সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে, আমাদের প্রীতির যোগ গভীর করে। যেমন গ্যেটে বলেছেন:

একজনকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারলেই যথেষ্ট, তখন সবাইকে মনে হবে প্রীতির যোগ্য। প্রশংসা ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধেও একথা খাটে। জগতে কত প্রশংসার সামগ্রী আছে সেকথা আমরা বুঝি যখন একজনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রশংসা করতে পেরেছি।

এর 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতাটিতে যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে সে ভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে কখনো কখনো আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি বলতে চেয়েছেন: প্রকৃতিতে যেমন নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে তেমনি তার ব্যতিক্রমও আছে; 'ঝড়' প্রকৃতিতে সেই ধরনের ব্যতিক্রম; তা মুহূর্তের জন্য আসে কিন্তু অনেককিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। সেই ঝড়ের মতো ব্যাপার মানুষের মনের মধ্যেও আছে—তার সাধারণ নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। কেউ এর সমাদর করে না, বিস্মিত চোখে ক্ষণকাল চেয়ে দেখে মাত্র।

কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী'কে অনেকটা এই ভাবের একটি জাঁকালো রূপ জ্ঞান করা যেতে পারে।—বলা বাহুল্য উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে একটা আত্মবোধের দিকও আছে।

আমরা দেখেছি এই বয়সেই কবি নিজে যথেষ্ট শান্ত; শান্তই থাকতে চান তিনি; কিন্তু মানুষের মনের ভিতরকার 'ঝড়ে'র রূপটিও স্পষ্টভাবেই দেখেছেন:

> প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ,
> প্রতিদিন ফুটে ফুল।
> ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
> সৃজনের এক ভুল।
> দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
> ফুকারিয়া উভরায়
> আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়।

একালের সাহিত্যে মানুষের এই মনের ভিতরকার 'ঝড়' বেশি স্বীকৃতি পেয়েছে—তার মহিমা বেশি গাওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানদৃষ্টির সঙ্গে এর যোগ ঘটলে কিছু ভালো ফল ফলতে পারত। কিন্তু তা তেমন হয় নি। ফলে এটি রোমাণ্টিক অর্থাৎ রুগ্‌ণ মানসিকতার পরিচায়ক হচ্ছে বেশি। মানুষের মনের এই দিকের কথা কবি তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তেও বলেছেন।

গ্যেটের মতো রবীন্দ্রনাথও একই সঙ্গে কবি আর মনীষী; জগতের কল্যাণও তাঁর গভীর ভাবনার বিষয়। কবির যৌবনের কাব্য 'মানসী'তেই সেসবের পরিচয় আমরা পেলাম। পরে পরে তাঁর এইসব শক্তির সমৃদ্ধতর পরিচয় আমরা পাব।

'মানসী'তে কবির শিল্পনৈপুণ্যও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বাংলার একালের কাব্যের ইতিহাসে সেসবও লক্ষণীয়। কিন্তু আমাদের প্রধান বিষয় কবির মানস, কবির জীবন ও জগৎ-চেতনার পরিচয়, কবির শিল্পনৈপুণ্য তার আনুষঙ্গিক—তার বেশি নয়। তাছাড়া শিল্পনৈপুণ্য কবির অনুভূতি, রুচি, শিক্ষা, এসব ভেদে বদলায়। তার স্বতন্ত্র মূল্য নেই বলা যেতে পারে—যেমন দেহমনের স্বাস্থ্যেরই সত্যকার মূল্য, প্রসাধনের মূল্য সে তুলনায় অনেক কম। শিল্পনৈপুণ্যকে কিছুটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে গিয়ে আমাদের রবীন্দ্রোত্তর অনেক কবি বিড়ম্বিতই হয়েছেন বেশি, সেই ব্যাপারটিও মনে রাখবার মতো।

প্রাচীন কাব্যরসিকদের কাঙ্ক্ষিত রস ও কলানৈপুণ্য একালে মূল্য হারায় নি। তবে একালে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির ব্যক্তিত্বের প্রশ্ন—কবির জীবন ও জগৎ-চেতনার বিশেষ পরিচয়। রসোত্তীর্ণ হলেই রচনা সাহিত্য হয়। কলানৈপুণ্যও সমাদরের বস্তু। কিন্তু মহৎ সাহিত্যে বিশেষভাবে দেখা যায় মহৎ জীবন-চেতনা ও জগৎ-চেতনা। মহৎ সাহিত্য আমাদের শুধু প্রীত করে না, আমাদের জীবনকে মহৎ চেতনায় নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে। যুগে যুগে সেই নতুন উদ্বোধনের সমূহ প্রয়োজন, নইলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বদ্ধজলায় পরিণত হয়। কালিদাস-উত্তর সংস্কৃত কাব্য তার একটি দৃষ্টান্ত নয় কি?

আর একটি কথা: ইয়োরোপীয় কাব্য ও কবিদের থেকে কি ধরনের আনুকূল্য কবির লাভ হয়েছিল?

'সোনার তরী'র কবিতাগুলোর আলোচনার পরে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে ভালো হবে।

মায়ার খেলা

এটি একটি গীতিনাট্য—'মানসী'র যুগে, ১২৯৫ সালে 'সখী সমিতি'র জন্য রচিত হয়েছিল।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চারুবাবু বলেছেন : "কবির কৈশোরের কাব্য 'কবি-কাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়ে'র মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত দেখিয়াছি, সেই তত্ত্বটিই এখানেও দেখিতে পাই,—নিকটে কামনার ধন থাকিতেও ভ্রান্ত হইয়া তাহাকে দূরে খুঁজিতে যায় মানুষ, পরে কোথাও না পাইয়া যখন ফিরিয়া আসে তখন সে নিকটকেও হারায় ও হায় হায় করে।" এর এই ব্যাখ্যা মোটের উপর গ্রহণযোগ্য, তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে শান্তার কথা অনেকটা বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু 'মায়ার খেলায়' যেমন চঞ্চলা 'প্রমদা' তেমনি অচঞ্চলা 'শান্তা'ও একটি বিশিষ্ট চরিত্র—তার প্রেমের নিষ্ঠা তার সুখের নেশায় বা চোখের নেশায় বিভ্রান্ত প্রেমিককে জীবনের পথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো।

এই রচনাটি সম্বন্ধে কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন :

> 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত, 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।

এই রচনাটি সংগীতরূপেই বিশেষভাবে উপভোগ্য—কথা ও সুর দুই দিক দিয়েই। প্রেম ও প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে এতে চিন্তা যা ব্যক্ত হয়েছে তা পরে পরে পূর্ণতর রূপ পেয়েছে।

রাজা ও রানী

এটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক, 'মানসী'র যুগে ১২৯৬ সালের বৈশাখে এটি রচিত হয় বোম্বাইয়ের সোলাপুরে। গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয় সেই বৎসরেই। পরে এটি স্থানে স্থানে পরিবর্তিত হয়।

আরো বহু পরে কবি এটি আগাগোড়া বদলে 'তপতী'রূপে দাঁড় করান। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে হবে।

সংক্ষেপে এর কাহিনীটি এই :

> জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব তাঁর সুন্দরী মহিষী সুমিত্রার প্রতি একান্ত আসক্ত—সেই প্রেমের জীবন ভিন্ন আর কিছুই যেন তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ নয়; ফলে রাজকার্য অবহেলিত হচ্ছে,—রাজ্যে অরাজক অবস্থা দেখা দিয়েছে :

রানীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে, রাজার প্রতাপ
ভাগ করি লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতীদেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জর কাতর
কাঁদে প্রজা।

কিন্তু মন্ত্রী সে প্রসঙ্গ তুললে রাজা তাঁকে এড়িয়ে চলেন। তাঁর বাল্যসখা ব্রাহ্মণ দেবদত্ত তাঁর মতিগতি ফেরাতে পারলেন না। রাজ্যের এমন অরাজক অবস্থার কথা শেষে রানীর কানে পৌছল। রানী বিচলিত হলেন ও বিদেশী কাশ্মীরী সামন্তদের অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে রাজাকে অনুরোধ করলেন। রাজা প্রথমে রানীর কথায় কান দিলেন না, তারপর রাজ্যের অবস্থা একটু বুঝতে চেষ্টা করে দেখলেন, বিদেশী অমাত্যদের শাসন করা কঠিন কাজ। কাজেই সেই চেষ্টা তিনি ত্যাগ করলেন। রানী এতে মর্মাহত হলেন, কেননা তিনি শুধু রাজার প্রেয়সী হতে চান না, রাজ্যের রানী হতে চান—দুঃখী প্রজাদের মাতা হতে চান।

রানী জালন্ধর রাজ্য থেকে পালিয়ে কাশ্মীরে গেলেন ও তাঁর ভ্রাতা যুবরাজ কুমারসেনের সাহায্যে কয়েকজন বিদ্রোহী সামন্তকে বন্দী করে রাজা বিক্রমদেবের দর্শন চাইলেন। রানীর জালন্ধরত্যাগে রাজা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্রোহী অমাত্যদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে নেমেছিলেন। রানীকে এমন ভাবে ফিরে আসতে দেখে তাঁর রোষ নির্বাপিত হ'ল না। তিনি রানীর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মত হলেন। রানী ও রানীর ভ্রাতা কাশ্মীরে ফিরে গেলেন। রাজা বিক্রমদেব রানীর ভ্রাতাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করলেন—যুদ্ধেই এখন তাঁর আনন্দ। কাশ্মীরের সিংহাসনে তখন কুমারসেনের পিতৃব্য চন্দ্রসেন। তিনি ও তাঁর অতি ক্রূরস্বভাবা পত্নী রেবতী কাশ্মীরের রাজ্য নিজেদের করে নেবার জন্য কুমার চন্দ্রসেনকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন না, বরং তাঁকে বিক্রমদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বললেন। ত্রিচূড়ের রাজকন্যা ইলার সঙ্গে কুমারসেনের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হয়েছিল।

কিন্তু এই অবস্থায় ত্রিচূড়রাজও কুমারসেনকে সাহায্য করলেন না, বরং তাঁকে ইলার কথা ভুলে যেতে বললেন। কুমারসেন ও রানী সুমিত্রা অরণ্যে আত্মগোপন করলেন। কিন্তু কুমারসেনকে ধরিয়ে দেবার জন্য কাশ্মীরের প্রজাদের উপরে বিক্রমদেবের কাশ্মীরী সামন্তেরা ও সৈন্যেরা ঘোর অত্যাচার চালাল। সেই অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে কুমারসেন সিদ্ধান্ত করলেন তিনি আর পালিয়ে বেড়াবেন না, নিজের শির ছিন্ন করে তাঁর ভগিনী সুমিত্রাকে দিয়ে বিক্রমদেবের কাছে তা উপহার পাঠাবেন।

এদিকে ত্রিচূড়রাজ বিক্রমদেবকে অনুরোধ করলেন তাঁর কন্যা ইলাকে গ্রহণ করতে। ইলার সঙ্গে বিক্রমদেবের যে কথাবার্তা হ'ল তা থেকে তিনি বুঝলেন সরলা ইলা কুমারসেনের প্রতি একান্ত অনুরক্তা। চন্দ্রসেনের পত্নী রেবতীর হিংস্র প্রকৃতির পরিচয় পেয়েও বিক্রমদেব নিজের আচরণের নৃশংসতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। তিনি সংকল্প করলেন সর্বজনপ্রিয় কুমারসেনকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসাবেন।

কিন্তু তাঁর সংকল্প বৃথা হ'ল। শিবিকাযোগে রানী সুমিত্রা বিক্রমদেবের শিবিরে উপস্থিত হলেন ও স্বর্ণথালে কুমারের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে রাজাকে বললেন :

> ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
> কাননে কান্তারে শৈলে—রাজ্য ধর্ম দয়া
> রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জিয়া, যার লাগি
> দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
> মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
> লহো মহারাজ ধরণীর রাজবংশে
> শ্রেষ্ঠ সেই শির। আতিথ্যের উপহার
> আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
> মনস্কাম, এবে শান্তি হোক, শান্তি হোক
> এ জগতে, নিবে যাক নরকাগ্নিরাশি,
> সুখী হও তুমি!

এর পর রানী ঊর্ধ্বস্বরে বললেন :

জাগো, জগৎজননী,
দয়াময়ী, স্থান দাও কোলে।

এই বলে রানী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ও সেই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁর মৃতদেহের সামনে নতজানু হয়ে বিক্রমদেব বললেন :

দেবী, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির-অপরাধী করে? ইহজন্ম
নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

'রাজা ও রানী'কে কবি বলেছেন তাঁর 'প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা'। এতে বহু ধরনের চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে।

এই নাটকটি সম্পর্কে চারুবাবু লিখেছেন : এটি সম্বন্ধে কবির সঙ্গে তাঁর একবার কথা হয়েছিল। তিনি নাটকটির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, তাতে কবি বলেছিলেন :

হ্যাঃ! ওটা আবার নাটক নাকি! একটা মেলোড্রামা, কাটা মুণ্ডু নিয়ে একটা বাড়াবাড়ি কাণ্ড!

কবির এই মন্তব্যে নাটকটিকে যে খুব কড়াভাবে বিচার করা হয়েছে তা মিথ্যা নয় ; কিন্তু একটু ভাবলে বোঝা যায়, এই-ই মোটের উপর নাটকটির একটি যথার্থ মূল্যায়ন। এই নাটকে বহু চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে ; ছোটখাট চরিত্রগুলো এতে ভালোই উৎরেছে ; কিন্তু এর প্রধান চরিত্র-গুলোতে অতি-নাটকীয়তা অসংগতভাবে প্রশ্রয় পেয়েছে। রাজা বিক্রমদেবের নবীন বয়সের ভোগাকাজ্ক্ষা মাঝে মাঝে সুচিত্রিত হয়েছে এতে ; কিন্তু বেশির ভাগ জায়গায় তাঁর কথা ও আচরণ অতি-নাটকীয় হয়েছে। চন্দ্রসেনের পত্নী রেবতীকে নির্ভেজাল ডাইনীরূপে দাঁড় করানো হয়েছে— তিনি লেডি ম্যাকবেথকেও হার মানান। রানী সুমিত্রার চরিত্র প্রথমদিকে ভালো ফুটেছে, কিন্তু শেষের দিকে অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। কুমারসেন ও ইলার কাহিনী একটি সহজ সরল প্রেমকাহিনী হিসাবে

উপভোগ্য, কিন্তু মূল নাটকের ভিতরে অনেক বেশি জায়গা দখল করেছে। কাশ্মীররাজের পুরাতন ভৃত্য শংকরের চরিত্রও ভাবালু হয়েছে অনেক বেশি।

নাটকটির যে মুখ্য বিষয়—প্রেমাকাজ্ক্ষায় সংযমের প্রয়োজনীয়তা—সেটি কবি তাঁর এইকালের কবিতায় চমৎকার রূপ দিতে পেরেছেন, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু নাটকে, অর্থাৎ নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে, তিনি এতটা অকৃতকার্য হলেন কেন? এর দুটি কারণ আমাদের মনে হয়েছে: প্রথমত, এর বিষয়টি আত্মকেন্দ্রিক বেশি, কাজেই নাটকের জন্য তেমন প্রশস্ত নয়; দ্বিতীয়ত, প্রধানত বৈষ্ণব কাব্য-কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত কবির এতদিনের ভাব-কল্পনা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁকে আনুকূল্য করলেও নাটকের ক্ষেত্রে তেমন সহায় হতে পারে নি।

বিসর্জন

কবি তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসের প্রথমাংশ ও শেষের দিকের কয়েকটি পরিচ্ছেদ থেকে উপকরণ নিয়ে তাঁর 'বিসর্জন' নাটক দাঁড় করান—১২৯৬ সালের শেষের দিকে সাজাদপুরে নির্জন বাসকালে। সেই নির্জনবাসে এই নাটকটিকে রূপ দেওয়ার গভীর আনন্দ এর উৎসর্গ-পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। এটি প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালে, কিন্তু বহুলভাবে পরিবর্তিত হয় ১৩০৩ সালে। ১৩০৬ সালেও এর কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে পরেও এই নাটকে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু বর্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'বিসর্জন' নাটকটিকে যে আকারে পাওয়া যাচ্ছে তা মোটের উপর ১৩০৩ ও ১৩০৬ সালের সংস্করণ—গ্রন্থপরিচয়ে একথা বলা হয়েছে। 'রাজর্ষি'র অনেক চরিত্র এতে নেই, আর রানী গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, ও চাঁদপাল এতে কবির নতুন সৃষ্টি।

এর একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবি নিজে দিয়েছেন তাঁর একটি 'শান্তিনিকেতন' ভাষণে। চারুবাবুর গ্রন্থে সেটি উদ্ধৃত হয়েছে। কবির মতে, এই নাটকে দুই শক্তির মধ্যে সংগ্রাম চলেছে—প্রাচীন প্রথার শক্তি আর প্রেম ও করুণার শক্তি। বৃদ্ধ সম্মানিত ও শক্তিশালী পুরোহিত রঘুপতি হচ্ছে সেই প্রাচীন প্রথার—নিষ্ঠুর জীববলির—প্রতিনিধি, আর প্রেম ও করুণার শক্তির প্রতিনিধি হচ্ছে বালিকা ভিখারিনী সমাজে অখ্যাতা অপর্ণা। কিন্তু নগণ্য

অপর্ণাই প্রতাপশালী রঘুপতির বিরুদ্ধে জয়ী হ'ল। তার পালিত ছাগশিশু মন্দিরের লোকেরা কেড়ে এনে দেবীর কাছে বলি দিয়েছে এজন্য তার অন্তরে যে গভীর বেদনা বেজেছে সেটি সহজেই মহৎহৃদয় রাজা গোবিন্দ-মাণিক্যকে প্রেম ও করুণার সত্যে উদ্বুদ্ধ করলো, মন্দিরের সেবক ও রঘুপতির পালিতপুত্র কোমলহৃদয় জয়সিংহকে অচিরে জীববলির অবাঞ্ছিতত্ব সম্বন্ধে অনেকটা সচেতন করে তুললো, আর শেষে প্রতাপে অন্ধ কঠিন-হৃদয় রঘুপতিকেও নির্মম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রেম ও করুণার পথেই নিয়ে এল।

সহজেই মনে হতে পারে কবির অপর্ণা একটি বাস্তব মানুষের চরিত্র ঠিক হয় নি, হয়েছে বরং একটি idea-র, ভাবের, প্রতীক। কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে সেই ব্যাপারটি ঘটে নি। কবির সৃষ্ট অপর্ণার অন্তরে প্রেম ও করুণার শক্তি এতখানি প্রাণবন্ত হয়েছে যে তার সেই অনাড়ম্বর কিন্তু অব্যর্থ শক্তির সামনে প্রাচীন সংস্কারের সব বাধা সহজেই ভেঙে পড়েছে। অপর্ণা যে একটি মহৎ চিন্তার প্রতীক মাত্র না হয়ে একটি প্রাণবন্ত সত্য হয়েছে এই-জন্যই 'বিসর্জন' কবির একটি মহৎ সাহিত্যিক সৃষ্টি হতে পেরেছে। গ্যেটের ইফিগেনিয়া-র সঙ্গে এর তুলনা চলে। অবশ্য 'বিসর্জনে'র শেষের অংশে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি এই দুইটি বড় চরিত্রেই ভাবালুতা প্রশ্রয় পেয়েছে—জয়সিংহে তো পেয়েছেই। বোঝা যাচ্ছে ভাববিভোরতার কাল কবির কেটে যায় নি। কিন্তু অপর্ণার উপলব্ধির সত্যতা এর সর্বত্র যথেষ্ট প্রাণসম্পদ ছড়িয়ে দিয়ে একে ভাবাতিশয্য থেকে রক্ষা করতে পেরেছে।

'বিসর্জন' কবির একটি সত্যকার প্রাণসমৃদ্ধ রচনা—আর সেই প্রাণ মহত্ত্বের অভিসারী। তাই এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে না মনে হয় যদিও সমালোচকরা এর বহু ত্রুটি খুঁজে বার করতে পারেন।

'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জন' কবির এই দুইটি নাটক অল্পকালের ব্যবধানে রচিত। অথচ সার্থকতার দিক দিয়ে দুটিতে পার্থক্য কত! মনে হয় এর বড় কারণ, বিষয়ের পার্থক্য। 'বিসর্জনে'র বিষয়টি 'রাজা ও রানী'র তুলনায় ব্যাপকভাবে জীবনধর্মী, আর সমাজের একটি দৃঢ়মূল প্রথার বিরুদ্ধে, অথবা সমাজের বহুকালের অন্ধ গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, কবি তাঁর সমস্ত অন্তরকে সচেতন করে তুলতে পেরেছেন বলে এই রচনায় একটি স্বাস্থ্যপূর্ণ

মানস শক্তির সঞ্চার হয়েছে। এর পূর্বে কবি খেয়ালী অথচ প্রতাপশালী 'পুনরুজ্জীবনবাদী'দের বিরুদ্ধে যেসব মসীযুদ্ধ চালিয়েছিলেন তাঁর 'বিসর্জন' নাটককে জ্ঞান করা যেতে পারে সেসবের এক সুমহৎ পরিণতি। বিশ্বজগৎ পরিচালিত হচ্ছে যে শক্তির দ্বারা তা অজ্ঞেয়, নির্মম; 'করুণাময়' 'জ্ঞানময়' এসব বিশেষণে তাকে বিশেষিত করা যায় না;* 'পুনরুজ্জীবনবাদী'দের এই-সব কথার উত্তরে কবির এক দৃপ্ত প্রাণময় প্রত্যয়ের ঘোষণা এই 'বিসর্জন'।

মন্ত্রি অভিষেক

এটি একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ১২৯৭ সালে ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে এমারেল্ড নাট্যশালায় তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আপত্তিপ্রকাশ উপলক্ষে যে বিরাট সভা আহূত হয় সেই সভাস্থলে কবি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর বক্তব্য কি লেখাটির সূচনাতেই তার উল্লেখ রয়েছে।

এই লেখাটি সম্বন্ধে কবি পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন :

> যখন 'মন্ত্রি অভিষেক' প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তারপরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে।···দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলছি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি-দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রাজনৈতিক চিন্তা হিসাবে এতে কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় কবি দেন নি; ইংরেজের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সেকালের শিক্ষিত বাঙালিরা

---

* দ্রঃ 'বিসর্জন', দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে পাপপুণ্য সম্বন্ধে রঘুপতির দীর্ঘ উক্তি। সেই সঙ্গে দ্রষ্টব্য 'বাংলার জাগরণে' উদ্ধৃত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শশধর তর্কচূড়ামণির বাদ-প্রতিবাদ (পৃঃ ১৩৬-১৩৯)।

যে গভীর শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করতেন আর দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রবীণ নেতা রাজনারায়ণ বসুর যে ধরনের চিন্তা ছিল,* মোটের উপর তাই-ই রূপ পেয়েছে এতে। কিন্তু এর এই কথাগুলো বিশেষ অর্থপূর্ণ :

ভারতবর্ষে ইংরাজে এবং ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘর্ষ, এবং ইংরাজ এখানে প্রভুপদে প্রতিষ্ঠিত, ক্ষমতামদে মত্ত, সুতরাং স্বভাবতঃ ইংরাজের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব ভারতবর্ষে তেমন স্ফূর্তি পায় না, বরঞ্চ তাহার ক্ষুদ্রতা নিষ্ঠুরতা ও দানবভাব অনেক সময়ে সজাগ হইয়া ওঠে।

এদিকে ইংরাজি সাহিত্যে আমরা ইংরাজি চরিত্রের উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাই, অথচ সাক্ষাৎসম্পর্কে ইংরাজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই না—এইরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার উপর আমাদের অবিশ্বাস ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছিল। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মনে অল্পদিন হইল ইংরাজের উনবিংশ শতাব্দীর স্পর্ধিত সভ্যতার উপর এইরূপ একটা ঘোরতর সংশয় জন্মিয়াছে। সমস্ত ফাঁকি বলিয়া মনে হইতেছে। সকলে ভীত হইয়া মনে করিতেছেন আমাদের প্রাচীন রীতিনীতির জীর্ণ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লওয়াই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে সহৃদয়তা ও অকৃত্রিমতা নাই।...এমন সময়ে হিউম্, ইউল্, বেডর্বর্ন কন্‌গ্রেস্‌কে অবলম্বন করিয়া আমাদের সেই নষ্ট বিশ্বাস উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা যে নূতন শিক্ষা নূতন সভ্যতার আশ্রয়ে আনীত হইয়াছি তাহার প্রতি বিশ্বাস বলিষ্ঠ হইয়া তাহার সুফলসকল স্বেচ্ছাপূর্বক অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিব এবং এইরূপে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে। আমরা ইতিহাসে এবং সাহিত্যে ইংরাজের যে মহৎ আদর্শ লাভ করিয়াছি সেই আদর্শ মূর্তিমান ও জীবন্ত হইয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর করিয়া দিবে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে যতই সাধু প্রসঙ্গ ও সৎশিক্ষা থাক্

* বাংলার জাগরণ ১২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা এক হিসাবে মৃত, কারণ যে-সকল মহাপুরুষেরা সেই সাধুভাব-সকলকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে পুনশ্চ প্রাণলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর বর্তমান নাই; কেবল শুষ্ক শিক্ষায় অসার জীবনকে চৈতন্যদান করিতে পারে না। আমরা মানুষ চাই।

দেখা যাচ্ছে জাতীয়তার অভিমানের চাইতে সত্যাশ্রয়িতা কবির বড় অবলম্বন। কবি বলেছেন তিনি রাজপুরুষদের চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলেন গরম ভাষায়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এর ভাষা 'গরম' মনে হয় না। তবে এর অন্তরে প্রবাহিত হচ্ছে একটি তীক্ষ্ণ শ্লেষের ধারা—ইংরেজ শাসকদের ঔদ্ধত্য আর দেশের শিক্ষিতসমাজের একান্ত ইংরেজনির্ভরতা এই দুয়েরই সম্পর্কে কবির সহাস্য কিন্তু সুতীক্ষ্ণ সেই শ্লেষ। সেইদিক দিয়ে লেখাটি খুব উপভোগ্য। তবে এর প্রধান বক্তব্য স্পষ্টত সেকেলে হয়ে পড়েছে, তাই এর সাহিত্যিক মূল্য সত্ত্বেও কবি এর স্থান নির্দেশ করেছেন 'অচলিত সংগ্রহে'।

কংগ্রেসের 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বহনে'র প্রতি কবি যতই কড়া ভাষা ব্যবহার করুন তাঁর বাস্তব-বোধের গুণে তার মূল্য সম্বন্ধে তিনি যে অন্ধ ছিলেন না তার পর্যাপ্ত পরিচয় বহন করছে এই সুলিখিত রচনাটি। এর একটি ক্ষুদ্র শ্লেষাত্মক অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

> …তোমরা যে অতিরিক্ত আরো গুটিকতক দেশীয় লোক মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিতেছ তার উদ্দেশ্য কি?…যদি বল উদ্দেশ্য বিশেষ কিছু নাই, আমরা দেশীয় মন্ত্রির কোন আবশ্যক বোধ করিতেছি না; কেবল, তোমরা কিছুদিন হইতে বড় বিরক্ত করিতেছ তাই অল্পস্বল্প খোরাক দিয়া তোমাদের মুখ বন্ধ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। আজই তাহার প্রমাণ। আজ আমরা এই শহরের যত বক্তা এবং যত শ্রোতা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাশয্যা হইতে কায়ক্লেশে গাত্রোত্থান করিয়া ভগ্নক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি উত্থাপন করিতে আসিয়াছি; শরীর যতই সুস্থ এবং কণ্ঠস্বর যতই সবল হইতে থাকিবে আমাদের আপত্তি ততই অধিকতর তেজ ও বায়ুবল লাভ করিতে থাকিবে সন্দেহ নাই।

কবির শ্লেষের এই নিপুণ প্রয়োগ পরবর্তীকালে বীরবলের খুব কাজে লেগেছিল।

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি

১৮৯০ সালের আগস্ট মাসে কবি তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিন মাসের টিকিট নিয়ে য়ুরোপে যান। তাঁর বন্ধু লোকেন্দ্র পালিতও তাঁদের সঙ্গে যান। ১৮৯০ সালের ২২শে আগস্ট থেকে ৪ঠা নভেম্বর পর্যন্ত কবির সমুদ্র ও য়ুরোপ ভ্রমণের ডায়ারি এতে আছে। এই ডায়ারির কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। পূর্বের য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রের সঙ্গে তুলনায় এই রচনাটি যে অনেক বেশি পরিণত ও মনোজ্ঞ তা বুঝতে দেরি হয় না। অল্প কয়েকটি কথার আঁচড়ে বিচিত্র চিত্তাকর্ষক চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এতে। এই ভ্রমণ অবলম্বন করে য়ুরোপীয় জীবনযাত্রা-আদি সম্বন্ধে তিনি যে স্বতন্ত্র আলোচনা করেন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে 'সমাজ' গ্রন্থে।

২৬ আগস্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যন্ত কেটে গেল (সী-সিকনেসে)। জগতে ঘটনা বড়ো কম হয় নি—সূর্য চার বার উঠেছে এবং তিন বার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ উদ্ধার পর্যন্ত বিচিত্র কর্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেছে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড়ো বড়ো ব্যাপার সবেগে চলছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হয়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনও মুহূর্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড়ো রকমের একটা মুহূর্ত বলব, না এর প্রত্যেক মুহূর্তকে একটা যুগ বলব স্থির করতে পারছি নে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছনো গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠলুম।

...বামে চষা মাঠ; সাদা সাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুকরো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোটো ছোটো শহর দেখা দিচ্ছে। চার্চচূড়া-মুকুটিত

সাদা ধবধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে।

৮ সেপ্টেম্বর।...বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবজি। কেবলই যেন বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে।...এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদানপ্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্য যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্য দেবে!...মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী?

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র—দেখে প্রবাসদুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে কিছু বাহুল্যপরিমাণে পেয়ে থাকি। [কবির পোশাকের জন্য।]

২৩ সেপ্টেম্বর। আজকাল সমস্ত দিনই প্রায় জিনিস-পত্র কিনে দোকানে ঘুরে কেটে যাচ্ছে। বাড়ি ফিরে এলেই আমার বন্ধু বলেন, এস বিশ্রাম করি গে। তার পরে খুব সমারোহে বিশ্রাম করতে যাই। শয়নগৃহে প্রবেশ করে বান্ধবটি অনতিবিলম্বে শয্যাতল আশ্রয় করেন, আমি পার্শ্ববর্তী একটি সুগভীর কেদারার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসি। তার পরে কোনো বিদেশী কাব্যগ্রন্থ পাঠ করি, না হয়, দু-জনে মিলে জগতের যত কিছু অতলস্পর্শ বিষয় আছে, দেখতে দেখতে তার মধ্যে তলিয়ে অন্তর্ধান করি। আজকাল এই ভাবে এতই অধিক বিশ্রাম করছি যে, কাজের অবকাশ তিলমাত্র থাকে না। ড্রয়িংরুমে ভদ্রলোকেরা গীতবাদ্য সদালাপ করেন, আমরা তার সময় পাই নে, আমরা বিশ্রামে নিযুক্ত। শরীর রক্ষার জন্যে সকলে কিয়ংকাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণাদি করে থাকেন, সে হতেও আমরা বঞ্চিত, আমরা এত অধিক বিশ্রাম করে থাকি। রাত দুটো বাজলো, আলো নিবিয়ে দিয়ে সকলেই আরামে নিদ্রা দিচ্ছে, কেবল আমাদের দুই হতভাগ্যের ঘুমোবার অবসর নেই, আমরা তখনো অত্যন্ত দুরূহ বিশ্রামে ব্যস্ত।

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটখাটো একসিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম, এটা প্যারিস একসিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে, কারোলু ড্যুরাঁ নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সন্তস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে—কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্ভাসিত।

দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চিররহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল।

হতে পারে কবি তাঁর 'বিজয়িনী' রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন উপরি-উক্ত বসনহীনা মানবীর ছবি দেখে।

নগ্ন মানবদেহের সৌন্দর্যের অকুণ্ঠিত প্রশংসা কবি তাঁর আরো কয়েকটি রচনায় করেছেন। কবির দৃষ্টির একান্ত অনাবিলতা লক্ষণীয়।

চিত্রাঙ্গদা

'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাট্যকাব্য, ১২৯৯ সালের ভাদ্রে, অর্থাৎ 'সাধনা'র যুগে, এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি প্রথম রূপ পেয়েছিল 'সাধনা' প্রকাশিত হবার পূর্বে—১২৯৮ সালের ভাদ্র-আশ্বিনে। এর বিশেষ যোগও 'সাধনা'র যুগের পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গেই—যখন বিশেষভাবে নরনারীর প্রেমের নানা সমস্যার সম্মুখীন কবি হয়েছিলেন।

এই নাটক সম্বন্ধে কবি-লিখিত ভূমিকাটির মধ্যেই রয়েছে এর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। সেই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার সবটাই আমরা উদ্ধৃত করছি :

> অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্র মাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌদ্র হবে প্রখর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে—তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগূঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্‌ভ ফলসম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল, সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তাহলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের

জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তখনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িষ্যায় পাণ্ডুয়া বলে একটি নিভৃত পল্লীতে গিয়ে।

নারীর মাধুর্যের সুনিবিড় আকর্ষণ আর সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রবল চেতনা এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব এর পূর্বে কবির মধ্যে আমরা দেখেছি। তাঁর 'কড়ি ও কোমলে', 'মানসী'তে, 'রাজা ও রানী'তে এর নানা ছবি নানা ইঙ্গিতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। কামনা ও সংযমের সেই দ্বন্দ্ব 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যে আরো ব্যাপক আরো কল্পনাসমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সেই দ্বন্দ্ব এখানে দাঁড়িয়েছে নারীর রূপযৌবনের অপূর্ব ইন্দ্রজাল আর তার প্রকৃত মানবিক মূল্য এই দুইয়ের ভিতরকার একটি কঠিন বিরোধের রূপ নিয়ে। কবির কথায়, নারীর রূপলাবণ্যের মায়া তার চারিত্রিক মূল্যের, তার যথার্থ মানবিক মূল্যের, যেন সতিন।

এর কাহিনীটি মহাভারতের—সে কথা কবি বলেছেন। সেটিকে যে-ভাবে তিনি দাঁড় করিয়েছেন সংক্ষেপে তার পরিচয় এই :

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব এই বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কখনো কন্যা জন্মাবে না। কিন্তু কালে সেই রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হ'ল। রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন—শেখালেন ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা তার অভ্যস্ত পুরুষের বেশে একদিন শিকারে বেরিয়ে দেখলে সংকীর্ণ বনপথ রোধ করে এক চীরধারী মলিন পুরুষ ভূমিতে শয়ান রয়েছে। চিত্রাঙ্গদা তাকে উঠতে বললে, কিন্তু সে কোনো-রূপ সাড়া দিলে না দেখে অধীর রোষে ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে তাকে তাড়না করলে। তখন সেই চীরধারীর

সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীব্রবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
……ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে।

সেই পুরুষ স্নিগ্ধ কৌতুকের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার বালকমূর্তির পানে তাকালে। তখন সেই পুরুষের 'আপনাতে-আপনি-অটলমূর্তি' দেখে চিত্রাঙ্গদার ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল :

সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

এর পর চিত্রাঙ্গদা পুরুষের বেশ ত্যাগ করে 'রক্তাম্বর কঙ্কণ কিংকিণী কাঞ্চি' এসবে যথাসম্ভব ভূষিত হয়ে অর্জুনের সম্মুখবর্তিনী হ'ল ও তাকে স্বামীরূপে কামনা করলে। অর্জুন বললে :

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

এমন লাঞ্ছনা পেয়ে নিদারুণ মর্মদাহে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের শরণাপন্ন হ'ল তার কুরূপের অভিশাপ ঘুচিয়ে অন্তত একদিনের জন্য তাকে অতুলনীয় রূপলাবণ্যে ভূষিত করতে। মদন বললেন—তথাস্তু। বসন্তও বললেন :

তথাস্তু। শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা একবর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

চিত্রাঙ্গদার অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে অর্জুনের মুগ্ধ হতে দেরি হ'ল না। সে চিত্রাঙ্গদার মুখে শুনলে চিত্রাঙ্গদা মহাবীর অর্জুনেরই জন্য তপস্যা করছে। তখন অর্জুন বললে :

অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।

নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হ'ক, সত্য হ'ক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে ক'রো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

তখন চিত্রাঙ্গদা বললে অর্জুন তো দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করছেন, সেই ব্রত ভঙ্গ করে কেমন করে তিনি রমণীকে কামনা করতে পারেন :

ধিক্, পার্থ, ধিক্ !
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত। মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ?

* * *

এত ক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

তার উত্তরে অর্জুন বললে :

খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী।

অর্জুনকে দীর্ঘ সময় প্রতিহত করা চিত্রাঙ্গদার পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। চিত্রাঙ্গদা তা চাচ্ছিলও না। অর্জুনের গম্ভীর আহ্বানে সে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করলে।

নিবিড় প্রণয়লীলায় তাদের সময় কেটে চলল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা তৃপ্তি পেলে না। সে কিছুতেই ভুলতে পারল না যে, যে অপরূপ রূপযৌবনের

মায়ায় সে অর্জুনকে আকর্ষণ করেছে তা মদন ও বসন্তের ক্ষণিক দান, তার নিজের কোনো স্থায়ী সম্পদ নয়—এ চেতনার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া তার পক্ষে কঠিন হ'ল যে তার রূপযৌবনের ইন্দ্রজাল যেন তার সতিন, তাকে অতিক্রম করে তার প্রিয়তমের সোহাগ সে-ই ভোগ করছে। অর্জুনও এই নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলায় অচিরে ক্লান্তিবোধ করলে, সে চিত্রাঙ্গদাকে বললে :

এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বললে :

কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত,—সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষ-চোখে!

অর্জুন লোকমুখে চিত্রাঙ্গদার যে পরিচয় পাচ্ছিল তাতে তার সম্বন্ধে তার কৌতূহল বেড়ে চলেছিল। সেই 'স্নেহে রাজমাতা' ও 'বীর্যে যুবরাজ' তার কল্পনায় এক মহিমময় নারীত্বের রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বার বারই তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে পুরুষ নারীতে চায় শোভা-সৌন্দর্য ছলাকলা, কর্ম-কীর্তি বীর্য-বল এসব তারা নারীতে চায় না।

এমনিভাবে বর্ষ যাপন করে শেষরাত্রে চিত্রাঙ্গদা নিজের সত্য পরিচয় দিলে, বললে, সে-ই মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা, তার অপরূপ রূপলাবণ্য

যা এতদিন দেখা গিয়েছিল সেসব দেবপূজার জন্য আহৃত ফুলের মতো, সেই সুন্দর ফুলে সে তার হৃদয়বল্লভ অর্জুনের পূজা করেছে, কিন্তু সেই ফুলের মতো 'সম্পূর্ণ সুন্দর' সে তো নয়, তার দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে, দৈন্য আছে, আজন্মের অনেক অতৃপ্ত পিপাসা রয়েছে, তবে সেই সঙ্গে আছে একটি অক্ষয় অমর রমণীহৃদয়ও :

দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

নাটকের শেষে দাম্পত্যজীবনে নারীর সত্যকার ভূমিকা সম্বন্ধে এই মনোরম উক্তিটি আমরা পাচ্ছি :

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

এই নাটকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অভিযোগ প্রবল হয়েছিল। অভিযোগকারীদের মধ্যে দুই-একজন খ্যাতনামা কবিও ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখলাম কবি এতে নারীর রূপযৌবনের সম্মোহন, সেই সম্মোহনে প্রেমিকের আনন্দ, এসবের কথা যতটা বলেছেন তার চাইতে অনেক বেশি

বলেছেন নারীর মানবিক মূল্যের কথা—চারিত্রশক্তিতেই নারীর আত্মার যে স্থায়ী পরিচয় ব্যক্ত হয় তার কথা একালে নারীর ব্যক্তিত্ব অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীর রূপলাবণ্যের মায়ার চাইতেও তার চারিত্রিক মূল্যের উপরে কবির এই জোর দেওয়ায় তাঁর সজাগ সত্যদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।—কবির চিন্তার নূতনত্ব আর ভারতীয় সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড়তর পরিচয় তাঁর এমন লাঞ্ছনাভোগের মূলে এই আমাদের ধারণা হয়েছে।

একটি কথা বলা যেতে পারে—কবি যে নারীর রূপ-যৌবনের ইন্দ্রজাল আর তার চারিত্রিক মূল্য এই দুইয়ের মধ্যে একটা বড় রকমের বিরোধ দেখেছেন সেটি অনেকটা নতুন চিন্তা, পূর্ববর্তী কবিদের রচনায়, যেমন বৈষ্ণব-পদাবলীতে ও গ্যেটের রোমকগাথায় (Roman Elegies) এমন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তার উত্তরে বলা যায়, একালে নারীর ব্যক্তিত্ব অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে তার রূপ-যৌবনের আকর্ষণ আর তার সত্যকার মানবিক সম্পদ এই দুইয়ের ভিতরকার বিরোধ একালে স্বীকৃতির দাবি বেশি করছে। সেই বিরোধের মীমাংসা কবি যেভাবে করতে চেয়েছেন তাতে রূপ ধরে উঠেছে তাঁর ও এইকালের বহুমূল্য মানবমহিমাবোধ। চিত্রাঙ্গদা একালের নারীর প্রতিনিধি—তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার চারিত্রিক বীর্যে, সেই সঙ্গে সে সহজ নারীত্বে ভূষিত।

অর্জুনকে এতে আমরা দেখছি প্রধানত নারীর অতুল রূপ-যৌবনে মুগ্ধ। কিন্তু সেই মুগ্ধতার ভিতরেও মাঝে মাঝে তার দিব্য চারিত্রিক বীর্য উঁকি দিয়েছে।

কবির দেহ ও মন দুয়েরই অতুল যৌবন মহৎ প্রতিফলন লাভ করেছে তাঁর এই চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যে। সেইদিক দিয়ে এর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে সর্বকালের পাঠকদের জন্য।

এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাসমূহের অন্যতম।

'সাধনা'র সূচনা

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বহু সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেসবের মধ্যে ১২৯৮ সালে অগ্রহায়ণ থেকে প্রকাশিত 'সাধনা'

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিন বৎসর এর সম্পাদক ছিলেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর চতুর্থ বৎসরে এর সম্পাদক হন কবি নিজে। কিন্তু বরাবরই এর প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন কবিই। অনেক বিলাতি সাময়িক পত্রের অভিনিবিষ্ট পাঠক ছিলেন তিনি। 'সাধনা'কে একটি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য-পত্রিকারূপে দাঁড় করাবার সাধনা হয়েছিল তাঁর একথা বলা যায়। এর সংখ্যাগুলোয় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হ'ত কবিতা, ছোটগল্প, সমাজ রাজনীতি শিক্ষা সাহিত্য বাংলা ব্যাকরণ ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ, উল্লেখ-যোগ্য সাময়িক সংবাদ, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, সাময়িক সাহিত্যের আলোচনা এবং শেষের দিকে গ্রন্থ-সমালোচনা। এইসব রচনার মোটা অংশই আসত কবির অশ্রান্ত লেখনী থেকে। 'সাধনা'য় প্রকাশিত কবির অনেক লেখাই পরে তাঁর বিশিষ্ট রচনারূপে তাঁর বিভিন্ন রচনা-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে—সে-সবের সঙ্গে অচিরে আমাদের পরিচয় হবে। 'সাধনা'র লেখাগুলো যে কবির যত্নার্জিত সেকথা তিনি বলেছেন তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে।

'সাধনা' পরিচালনার কালে জমিদারি পরিচালনার কাজেও তিনি নিবিড়-ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। সাহিত্যিক কর্তব্য আর সাংসারিক কর্তব্য কোনোটিরই প্রতি অযত্ন কখনো দেখাননি তিনি। দুই-ই যে তাঁর জীবনের কাজ এ চেতনা তাঁতে দেখা দিয়েছিল যদিও জমিদারির কাজে মাঝে মাঝে ক্লান্তিও তিনি বোধ করতেন। এইকালে যুবক প্রমথ চৌধুরীকে তিনি লিখেছিলেন :

> ...কত কর্তব্য কাজই হয়ে ওঠে না—আত্মীয়দের কত অভিমান সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্চে যখন যে কর্তব্য স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণু ভাবে বহন করা। যে অবস্থার দ্বারা পরিবৃত হওয়া যায় সেই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত উপস্থিত কর্তব্য সেইগুলো পালন করা। তাই আমি প্রতিমাসে নতশিরে 'সাধনা'র লেখা লিখে যাচ্চি এবং প্রতিদিন জমিদারির সমস্ত খুচরো কাজ মনোযোগপূর্বক করছি। তুমি কি মনে কর এতে আমি কোনো সুখ পাই? আজকাল আমি চিঠিও যা লিখি সেও আমার কর্তব্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক সময় কষ্ট বোধ হয়—কিন্তু আমার মনে হয় মোটের উপর আমার পক্ষে এই সবচেয়ে ভাল। কল্পনা

নামক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো আমার মনের পক্ষে ভালো একসারসাইস্ নয়।

শেষ ছত্রটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এই যুগে কবির বিভিন্ন লেখা থেকে বোঝা যায় যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যতন্ময়তা তাঁর ভিতরে কত প্রবল হয়েছিল। কিন্তু এই গভীর সৌন্দর্যতন্ময়তার মধ্যে 'সাধনা' সম্পাদনার সূত্রে দেশের সঙ্গে তাঁর যে যোগ ঘটেছিল তাকে তিনি খুব সম্ভাবনাময় জ্ঞান করেছিলেন। তার পরিচয় রয়েছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর এই পত্রটিতে—পত্রের তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ :

যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই 'সাধনা'টা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে।' ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব—নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার 'সাধনা'র প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় 'সাধনা' আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না—এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

'সাধনা'র মতো সাময়িকপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকেও তিনি লিখেছিলেন :

অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই-এক জন নতুন নতুন বুলি বের করচেন। একে তো বাঙালির বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয় তারপরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েছে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বসুর কোনো কোনো রচনা এখানে কবির লক্ষ্যস্থল হয়েছে পরে তা জানা যাবে।

'সাধনা' এমন ব্যাপকভাবে জীবনধর্মী হয়েছিল বলেই সবদিক দিয়ে এটি একটি উচ্চ মর্যাদার সাময়িকপত্র হতে পেরেছিল। কবির সুপরিণত সাহিত্যিক শক্তি, অর্থাৎ প্রকাশের শক্তি, সেই ব্যাপক জীবনচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করেছিল—সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো বটেই, জীবনের ক্ষেত্রেও।

ভাইমারে রাজমন্ত্রিরূপে নিযুক্ত হয়ে গ্যেটে নবযৌবনে কর্মোদ্যমের এই স্মরণীয় প্রশস্তি রচনা করেছিলেন :

হে প্রতিদিনের উদ্যম, দান করো
বেঁচে থাকার শ্রেষ্ঠ আনন্দ—জীবনের সুপরিণতি।
শূন্যগর্ভ স্বপ্ন? নয় কখনো নয়।
রিক্ত শাখা—সে তো সাময়িক :
চাই পত্র-পুষ্প-ফল—
আমার সৃষ্টিধর্মের সার্থকতা।

গ্যেটেরই মতো কর্মে আস্থা ছিল রবীন্দ্রনাথের যদিও 'রাজকীয় আলস্যে'র স্তুতি তিনি কম গান নি। আর গ্যেটের সঙ্গে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের জীবনে কর্মের আয়োজন হয়েছিল বিচিত্রতর—বিপুলতর কি না তা অবশ্য বলা কঠিন, কেননা নিষ্ঠাপূর্ণ রাজকার্যে ও বিজ্ঞানসাধনায় গ্যেটের বহু সময় ব্যয়িত হয়েছিল।

যাদের প্রকৃতি গভীর ও অনেক পরিমাণে অকৃত্রিম স্বাভাবিক জীবনধারায়

এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মে অনুরাগ ও আস্থা তাঁদের মধ্যে যেন সহজাত। প্রকৃতিতে অকৃত্রিম হবার প্রয়োজনের কথা এইকালে কবির বিভিন্ন রচনায় বার বার ব্যক্ত হয়। চন্দ্রনাথ বসু তাঁর একটি পত্রে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'য়ুরোপীয় ছাঁচের প্রকৃতি' দেখা যায়,—তার উত্তরে কবি বলেছিলেন :

> নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তের সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই। কারণ, আজকাল আমরা যেন একটি যুগপরিবর্তনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আছি। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বল্লালসেন হইয়া উঠিয়া নিজ নিজ ঘরগড়া আদর্শ অনুসারে হিন্দু অহিন্দু শ্রেণী নির্ণয়পূর্বক তাহাই কেবল গলার জোরে দেশের লোকের উপর জারি করিবার চেষ্টা করিতেছি। আশ্চর্য নাই কালক্রমে পরিবর্তনবিপ্লব শান্ত হইয়া বুদ্ধি স্থির হইলে দেখা যাইবে যথার্থ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত য়ুরোপীয় প্রকৃতির তেমন বিরোধ নাই, কেবল বর্তমানকালের হীনদশাগ্রস্ত ভারতের নির্জীব গোঁড়ামি ও কিম্ভূতকিমাকার বিকৃত হিন্দুয়ানীই যথার্থ অহিন্দু।*

দেখা যাচ্ছে এইকালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিঘাত যেমন সবল তেমনি অব্যর্থলক্ষ্য ; অর্থাৎ বাস্তবের বোধ তাঁর স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। কৃত্রিমতার উপাসক প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি এইকালে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

উৎকৃষ্ট কবিতা, উৎকৃষ্ট ছোটগল্প, উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ—এইসব 'সাধনা'র যুগে রবীন্দ্রপ্রতিভার স্মরণীয় দান। কবিতার আলোচনা দিয়ে আমরা এই অপূর্ব সৃষ্টিধর্মী যুগের পরিচয়ের সূত্রপাত করছি।

সোনার তরী

'মানসী'তে কবির সমৃদ্ধ রচনাচাতুর্যের ও নবীন মনীষার পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'সোনার তরী'তে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো গভীর হৃদয়াবেগ, আরো জীবনধর্মিতা। 'মানসী'র ও 'সোনার তরী'র পরিবেশের পার্থক্য সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন

> মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের

* রবীন্দ্রজীবনী, পৃঃ ২৮২, ১ম খণ্ড।

উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুনুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করি নি। নতুনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারই এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া।…কিন্তু 'সোনার তরী' লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নতুনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ, তার ভাষা চিনি তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানা শোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়…আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতি নয় মানুষের বিচিত্র জীবনও 'সোনার তরী'র যুগে কবিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। সেই দুইয়েরই আবেদনের বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে এই কবিতাগুলোর পাঠ থেকে।

১২৯৮ সালের ফাল্গুন থেকে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত রচিত কবিতা 'সোনার তরী'তে স্থান পেয়েছে। ১৩০০ সালেই 'সোনার তরী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এর প্রথম কবিতাটি স্বনামধন্য। এর ব্যাখ্যা নিয়ে একসময়ে বাংলার সাহিত্য-জগতে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু সেই সব এখন অলস কৌতূহলের বিষয়।

এই কবিতার তাৎপর্য সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এই আশা থাকে যে, আমারও ওই সঙ্গে স্থান হইবে, কিন্তু সংসার আমাদিগকে দুইদিনেই ভুলিয়া যায়। একবার ভাবিয়া দেখ, কত লক্ষ কোটি বিস্মৃত মানবের জীবনপাতের উপর আমাদের প্রত্যেকের জীবন গঠিত।...আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে। যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়। যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নামধাম সুখদুঃখ লইয়া কোন বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে।...'এ পারেতে ছোট খেত, আমি একেলা'—একলা—নয়ত কী। আমরা প্রত্যেকেই যে একলা—আমাদের প্রত্যেকের চারিদিকে যে অতলস্পর্শ স্বাতন্ত্র্যের ব্যবধান আছে তা কে অতিক্রম করবে।

এই কবিতার অবশ্য অন্যান্য ধরনের ব্যাখ্যাও হতে পারে—কবিও তা করেছেন।

কিন্তু শুধু ভাব নিয়ে কবিতা নয়, তার রূপটিও তার এক অতি বড় সম্পদ। কবিতাটির সেই রূপের কথা ভাবতে গেলে দেখা যায়, কবি বর্ষার দিনে পদ্মার চরের এক নিঃসঙ্গ চাষীর ছবি এঁকেছেন। বর্ষার প্রারম্ভে পদ্মার চরে এক-প্রকার ধান হয় তাকে জলিধান বলে। চর বর্ষায় ডুবে যাবার আগেই

চাষীরা সেই ধান কেটে আনে। তেমন ধান-বোঝাই নৌকো আর চরের ধানকাটা নিঃসঙ্গ চাষী, খরস্রোতা পদ্মা, বহু-ব্যাপক বাদল দিন, এই সবের এক চিত্তহারী ছবি কবিতাটিতে ফুটেছে। কবিতার ভাষা ও ছন্দের উপরেও পড়েছে বর্ষার দিনের ছায়া।

তরুছায়া=তরুর মূর্তি বা গাছের চেহারা।—কবিতাটি লেখা হয়েছিল ফাল্গুন মাসে। যে সম্পর্কে কবি বলেছেন :

> …যেদিন বর্ষার অপরাহ্নে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙি নৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে সে দিনটা সন তারিখ মাস পার হয়ে আজো আমার মনে আছে। সেই দিনেই 'সোনার তরী' কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই।

কবিতাটির নানা ধরনের 'ভুল' যাঁরা সগর্বে নির্দেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি কৃষিবিভাগের বড় চাকুরে ছিলেন। এই কবিতার ব্যাখ্যা সম্পর্কে কবি উত্তরকালে তাঁকে যে প্রতিঘাত করেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে :

> মনে আছে এগ্রিকালচারাল বিভাগীয় দ্বিজুবাবু বিদ্রূপ করেছিলেন শ্রাবণ মাসে ধানের অসাময়িকতা উল্লেখ করে।

অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভে যে পদ্মার চরে জলিধান হয় কৃষিবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বিজেন্দ্রলালের তা জানা ছিল না।

এর 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', এগুলো রূপকথা—রূপকথার ভঙ্গিতেই বলা হয়েছে, কিন্তু বলা হয়েছে চিত্তাকর্ষক ভাষায়। 'মানসী'তে সেই ভাষার পরিচয় আমরা পেয়েছি, 'সোনার তরী'তে তা আরো সমৃদ্ধ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে—উপমা, পদলালিত্য, ছন্দ, সবকিছুতে সেই সমৃদ্ধির পরিচয়। চরণের হৃদ্য বিন্যাস, কবিতার সামগ্রিক সুগঠন, পূর্ণাঙ্গ প্রায়-বিহ্বলকারী রূপ-কল্পনা, এখন থেকে প্রায়ই আমাদের চোখে পড়বে। রবীন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণপরিণত রূপের জগতে এখন আমরা প্রবেশ করেছি।

অবশ্য সেই জগৎ বিচিত্রবর্ণ—বহুরূপী। সেই সব রূপের কোন্‌টি অথবা কোন্ কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তা গভীর বিচার-বিতর্কের বিষয়।

এর 'তোমরা ও আমরা' কবিতাটিতে নারীর ও পুরুষের সাধারণ চালচলন, ধরনধারন, ভাবভঙ্গি, এই সবের পার্থক্য হৃদয়গ্রাহী রূপ পেয়েছে :

আমরা মূর্খ কহিতে জানি নে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি।

তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে—
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

পুরুষ স্বভাবত স্থূলবুদ্ধি, অসংস্কৃত, আর কথায় অপটু, আর নারী স্বভাবত মাধুর্যময়ী, মোহিনী—এই সব উপভোগ্য হয়েছে এই কবিতাটিতে। অবশ্য উপভোগ্যতার অতিরিক্ত সম্পদ এতে খোঁজা সংগত হবে না।

এর 'বর্ষাযাপন' কবিতাটি থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যা গভীর ভাবে সুসংগত সেই বৈষ্ণব-কবিতা কবির কত প্রিয় ছিল। তাঁর সুবিখ্যাত ছোটগল্পগুলোয় তাঁর বিশেষ কোন্ মনোভাব—কোন্ আনন্দ কোন্ বেদনা—ব্যক্ত হয়েছিল তারও পরিচয় এই কবিতাটিতে আছে।

এর 'হিং টিং ছট্' অতি প্রসিদ্ধ—রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে শক্তিশালী ব্যঙ্গ-কবিতা এটি। এটি চন্দ্রনাথ বসুকে লক্ষ্য করে লেখা সেদিনে অনেকেই এই কথা বলেছিলেন; আজও অনেকের সেই ধারণা। কবি কিন্তু সেকথা স্বীকার করেন নি। এটি যে সাধারণভাবে সেকালের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের লক্ষ্য করেই লেখা তা যথার্থ; তবে কবিতায় শুধু সাধারণ কথাই থাকে না, বিশেষ কথাও থাকে;—প্রতিক্রিয়াপন্থায় চন্দ্রনাথ বসুর মতো খ্যাতনামা লেখকের উৎসাহ-প্রাচুর্য হয়ত কবির মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল যদিও চন্দ্রনাথ কবির যথেষ্ট গুণগ্রাহীও ছিলেন।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে মোহিতবাবুর মনোভাব উপভোগ্য। প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সমর্থনে—সমর্থনেই বলতে হবে—তিনি উদ্ধৃত করেছেন গ্যেটের এই উক্তি: Superstitions are the poetry of Life. তিনি ভুলে গেছেন

কবির আক্রমণের লক্ষ্য নিরীহ নিরুপদ্রব নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণ নয়, তাঁর আক্রমণ-স্থল অন্ধ কুসংস্কারের ধ্বজা উত্তোলন করে যারা নতুন করে দিগ্বিজয়ে বেরুতে চাচ্ছে তারা। এমন দলের প্রতি গ্যেটের অবজ্ঞা চিরদিন প্রবল ছিল। অজ্ঞ মূঢ় জনসাধারণের জন্য কবির বেদনা কত গভীর ছিল তার পরিচয় নানা ভাবেই আমরা পাব।

বাংলার এই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের কবি বলেছেন 'যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা'। গুরুদের শেখানো বিজ্ঞানের কি অদ্ভুত অর্থ এই চেলারা করেছিল তার পরিচয় আছে কল্পনার 'উন্নতি-লক্ষণ' কবিতার এই সব ছত্রে :

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীনশাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি, আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজম্ শক্তি,
তিলকরেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণবলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।

তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের,—
অন্তত গ্যানো-খণ্ড,
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ডভণ্ড।

…কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ি।

ভাবা যেতে পারে কবি এসব উপেক্ষাও করতে পারতেন। কিন্তু উপেক্ষা যে করেন নি এতেই পরিচয় রয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তব-বোধের—তাঁর প্রাণ-বত্তারও। প্রাণবানের সংগ্রামশীল না হয়ে উপায় নেই।

'সোনার তরী'র 'পরশ-পাথর' একটি বিখ্যাত রূপক কবিতা—রূপকটির অর্থ সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ আছে।

কেউ কেউ এর এই ব্যাখ্যা করেছেন : খ্যাপা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অথবা ধর্ম দর্শন এসবের মতো কোনো মহৎ অনুসন্ধানের প্রতীক। যাদের ভিতরে সেই অনুসন্ধানের স্পৃহা প্রবল হয় তাদের দশা হয় পাগলের মতো—নিজেদের সুখ-সুবিধা আরাম-আয়েশ একেবারে বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের সেই অজানা মহৎ-কিছুর সন্ধানে ফেরে। যা তাদের অভীষ্ট তার সন্ধান কখনো কখনো তারা পায়, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে তাকে তারা অনেক সময়ে হারিয়ে ফেলে। যখন সেই চেতনা তাদের হয় তখন তারা হায় হায় করতে থাকে। ভগ্ন জীর্ণ জীবন নিয়ে আবার তারা তাদের কাঙ্ক্ষিতের সন্ধানে ফেরে—কিন্তু বৃথা সেই ফেরা।

কিন্তু এই ব্যাখ্যার ত্রুটি এই যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-আদির মতো কোনো গভীর বিষয়ের অনুসন্ধান যাঁরা করেন তাঁরা বাইরে খ্যাপার মতো হলেও অন্তরের দিক দিয়ে খেয়ালী বা ঢিলেঢালা আদৌ নন; কাজেই খ্যাপার যে দশা হয়েছিল তার অন্যমনস্কতা ও খেয়ালীপনার জন্যে সেই ধরনের বিড়ম্বনা-ভোগ তাঁদের সাধারণত ঘটে না। যে খ্যাপার ছবি কবির লেখনীতে ফুটেছে তাতে সন্ধানের তীব্রতা রয়েছে, কিন্তু গতানুগতিকতা ও অন্যমনস্কতা তার চরিত্রের বড় লক্ষণ।

এর রূপকটির এই ব্যাখ্যা বরং সংগত মনে হয় : আমাদের দেশের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা সম্বন্ধে বীতস্পৃহ যে বৈরাগ্যবাদ খ্যাপা হচ্ছে তার প্রতীক—সেই বৈরাগ্যবাদ সংসার-জীবনের প্রেম ও সুখ-সৌন্দর্য এসব উপেক্ষা করে চলেছে মুক্তিরূপ পরশ-পাথরের সন্ধানে। সেই পরশ-পাথর তার লাভ হয় না। সংসারের প্রতিদিনের জীবনের মধ্যেই স্নেহ-প্রেম-সখ্য প্রভৃতিতে যে অমৃত লুকানো রয়েছে, যা মানুষের জীবনকে সোনা করে দেয়, অন্যমনস্কভাবে জীবন কাটাতে কাটাতে তারও স্পর্শ সে পায়, কিন্তু অনির্দেশ্য মুক্তির সন্ধানেই সে রত, তাই জীবনের এই সব ছোটোখাটো কিন্তু আসলে অসামান্য সুখ-দুঃখ-আনন্দের অভিজ্ঞতার প্রতি সে অমনোযোগই দেখিয়ে থাকে। অনির্দেশ্য মুক্তির পিছনে সারা জীবন এমন বৃথা ছুটে শেষে তার চৈতন্য হয় প্রাত্যহিক জীবনেরই ভিতরকার অমৃত সম্বন্ধে। কিন্তু জীবন তো তার বৃথা ব্যয়িত হয়ে গেছে; কাজেই অনুশোচনাই হয় তার ভাগ্য। ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ তার দশা। তবে কবি তার এমন সর্বস্বপণ সন্ধানকে উপহাস করেন নি, বরং তার প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেছেন।

'সোনার তরী'র বহু কবিতায় বৈরাগ্যবাদের প্রতি কবির এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

এর 'বৈষ্ণব-কবিতা' অতিশয় জনপ্রিয়। গঠনের দিক দিয়েও এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা—গভীর হৃদয়াবেগ এতে ব্যক্ত হয়েছে অথচ ভাষা বাহুল্য-বর্জিত। এর কতকগুলো চরণ ব্যাপক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, যেমন :

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি;
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

অথবা

আমাদেরি কুটির-কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব-কবিতা বা বৈষ্ণবপদাবলী কেন কবির এত প্রিয় সেকথা অনতিবিস্তারে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়। সাহিত্যের এক বড় কাজ সব-কিছুর মানবিক মূল্যের উপরে, মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে সেসবের সম্বন্ধের উপরে, আলোকপাত করা। বাংলা সাহিত্যে সেই আলোকপাত রবীন্দ্রনাথের দ্বারা খুব ব্যাপকভাবে হয়েছে।

বৈষ্ণব-প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যাতারা অবশ্য কবির কথা পুরোপুরি মেনে নেবেন না। আর তাঁদের বক্তব্যের মধ্যেও বোঝবার কথা আছে। তবে পাঠক ও রসিক-সাধারণ কবির মতেই যে সায় দেবেন তাতে সন্দেহ নেই।

এর 'দুই পাখি' কবিতাটিও খুব জনপ্রিয়। ছেলেবেলায় বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মনোভাব কেমন ছিল সেকথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই কবিতাটির উল্লেখ করেছেন।

নানাভাবে-সীমাবদ্ধ মানুষ আর উন্মুক্ত উদার বিশ্বপ্রকৃতি এই দুয়ের মধ্যে যে একই সঙ্গে রয়েছে দ্বন্দ্ব আর আকর্ষণ শুধু তাই নয়, মানুষের নিজের ভিতরেই যে আছে যা সীমাবদ্ধ আর যা সীমাবদ্ধ নয় এই দুয়ের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সেই কথাটি কত মনোরম করে বলা হয়েছে এর এই সব ছত্রে :

বনের পাখি বলে—আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখি বলে—খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখি বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখি বলে—নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।

বনের পাখি বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই ?
খাঁচার পাখি বলে—হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই ।

'সোনার তরী' কাব্যের কয়েক বৎসর পরে লেখা 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' শীর্ষক কবিতায় এই ভাবটি অন্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

এর 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে দেশের মায়াবাদী প্রবণতার ব্যর্থতার ছবি আঁকা হয়েছে। এ সম্পর্কে কবির বক্তব্য পূর্ণতর সাহিত্যিক রূপ পেয়েছে এই কাব্যেরই শেষের দিকের সনেটগুলোয়।

এর 'যেতে নাহি দিব' কবির একটি বিশেষ জনপ্রিয় কবিতা। অল্প কয়েকটি কথায় বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের একটি অকৃত্রিম ছবি ফুটে উঠেছে এখানে, আর তারই সঙ্গে জগতের বিপুল ধ্বংসপ্রবণতার মধ্যে কোমল মানব-হৃদয়ের স্নেহ-প্রেমের স্থান কি সে সম্বন্ধে কবির মর্ম-নিঃসৃত ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য। জগতের নির্মম ধ্বংসপ্রবণতা আর মানুষের স্নেহ-প্রীতি-করুণা এই দুইয়ের ভিতরকার কঠিন অসামঞ্জস্যের প্রশ্ন কবি 'মানসী'র কতকগুলো কবিতায় তুলেছেন। সেই প্রশ্নের একটি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ উত্তর তিনি তাঁর এই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় দিয়েছেন :

—তবু প্রেম বলে,
"সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার-লিপি।" তাই স্ফীত বুকে
সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে, "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্বকথা।
মৃত্যু হাসে বসি। মরণ-পীড়িত সেই
চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ন নয়ন-'পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান।

কবির বক্তব্য তাহলে দাঁড়াল : নির্মম ধ্বংস জগতে আছে ; কেন আছে তা বোঝবার সাধ্য আমাদের নেই, কিন্তু তারই পাশে আছে অন্তরের ঐকান্তিক স্নেহ-প্রেম। তাও মিথ্যা নয়। ধ্বংসের হাতে চিরলাঞ্ছিত এই প্রেম পরাভব স্বীকার করে না, বার বার লাঞ্ছিত হয়েও সে তার প্রেমধর্মে আস্থাবান—সেই আস্থাতেই মানুষ পায় জীবনের স্বাদ।

জীবন সম্বন্ধে এইরূপ গভীর বোধ ও বিশ্বাস কবিকে শক্তি দিয়েছে মায়াবাদের মতো দেশের দৃঢ়মূল সংস্কারের শিকড় ধরে টান দিতে। তাঁর পূর্বে ব্রাহ্ম নেতারা, বিশেষ করে কবির পিতা মহর্ষিদেব, এই প্রতিবাদের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু কবির কথায় যে গভীর হৃদয়াবেগ মিশেছে আর দীর্ঘকাল ধরে তিনি যে তাঁর উপলব্ধ সত্য নানারূপে প্রকাশ করেছেন তার ফলে অন্তত আমাদের একালের সাহিত্যে মায়াবাদের প্রভাব শিথিল হয়েছে। দেশের ভাব-জীবনে এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট দান—হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

বাঙলার বৈষ্ণবরাও মায়াবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসকে তাঁরা কম মর্যাদা দেন নি। সেজন্য মায়াবাদের প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি।

গঠনের দিক দিয়ে কবিতাটিকে কিঞ্চিৎ দুর্বল বলা যেতে পারে। কবির কিছু কিছু উক্তি হৃদয়াবেগধর্মী ও কল্পনাপ্রবণ বেশি হয়েছে—সে তুলনায় সত্যাশ্রয়ী কম হয়েছে। এর পূর্বের 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় কিন্তু হৃদয়াবেগ সত্যাশ্রয়িতার সঙ্গে সুসংগত হয়েছে।

এর 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি পুরীতে সমুদ্র দেখে লেখা। আদিতে সব ছিল জল—তরঙ্গসমাকুল—সেই জলরাশি ও তরঙ্গভঙ্গের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে স্থলের উৎপত্তি হয়েছে, এই বৈজ্ঞানিক তথ্য এর গোড়াকার কথা। পৃথিবীর সেই স্থলভাগের উৎপত্তিরই মতো নানা ব্যথা-বেদনার ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয়-সিন্ধু থেকে নব নব ভাব-জগতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে, এই কবির নিজস্ব বক্তব্য এই কবিতায়। পৃথিবীর স্থলভাগের উৎপত্তির যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক গবেষণাসম্মত কিনা তার চাইতে বড় ব্যাপার মানুষের নব নব ভাবরাজ্যের সৃষ্টির কথা কবি যা বলেছেন সেইটি। কবির হৃদয়সিন্ধু থেকে এমন নতুন নতুন ভাবের জগতের পত্তন যে ক্রমাগত হয়ে চলেছে পরের কয়েকটি কবিতায় তা আমরা দেখব।

এর 'প্রতীক্ষা' কবিতাটিতে জীবন ও মৃত্যুর সম্বন্ধ কবির ভাবনা ও বর্ণনার বিষয় হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এটি একটি বড় বিষয়—জীবন ও মৃত্যুর সম্বন্ধকে কবি নানাভাবে দেখেছেন। পরে আমরা দেখব কবি মৃত্যুকে সম্বোধন করেছেন 'ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা' এই বলে।

এই 'প্রতীক্ষা' কবিতায়ও দেখা যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সম্বন্ধ যে অতি গূঢ়, মৃত্যুর হাতে জীবন যে লাভ করে এক রহস্যময় সার্থকতা, সেদিকে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে :

তখন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি
কোন্ শূন্যপথে,
অচৈতন্য প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে
অন্ধকার রথে ?
যেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চির-কুমারী,—
আলোক-পরশ
একটি রোমাঞ্চরেখা আঁকে নি তাহার গাত্রে
অসংখ্য বরষ ;
সৃজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈববশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে,
সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়া
বন্ধনবিহীন,
কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধূ
নূতন স্বাধীন।

ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি
তৃণে পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ-সূর্যালোক, এই স্নেহ, এই গেহ,
এই পুষ্পপাতা।

ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে
আত্মীয়স্বজন,
অন্ধকার বাসরেতে হবে কি দুজনে মিলি
মৌন আলাপন।

তোর স্নিগ্ধ সুগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমূর্তি
অসীম নির্ভর ;
নির্নিমেষ নীল নেত্র, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজুট,
নির্বাক অধর ;
তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি
তুচ্ছ মনে হবে,
সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে ?

তবু জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে একটি বড় দ্বন্দ্ব রয়েছে সেইটিই এই কবিতায় কবির মুখ্য কথা হয়েছে। আর কবি খেলার মতো অচিরস্থায়ী, অনির্ভর-যোগ্য জীবনেরই পক্ষপাতী হয়ে মৃত্যুকে বলছেন :

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বী'পরে
মুহূর্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখাশোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে, তার পর দণ্ড-দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমাশূন্য
মহাপরিণাম,
যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,

তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দু-দিন হতে
করিয়ো না চুরি।

বিষয়-গৌরব, রূপ-কল্পনা, বিষয়ানুগ ছন্দ, ভাষার পরিমিতি ও ঔজ্জ্বল্য, কবিতার বিভিন্ন অংশের সুসংবদ্ধতা, এই সব গুণে এটি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে গণ্য হবার যোগ্য। আমাদের পরমপ্রিয়, পরমকাঙ্ক্ষিত জীবনের উপরে পড়ে আছে মৃত্যুর বিশাল ছায়া—সেই চেতনা কবিতাটিকে যথেষ্ট করুণ করেছে। কবির কোন্ প্রিয়জনের শোক কবিতাটি রচনার মূলে, তা জানা যায় নি।

এর 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি সুদীর্ঘ এবং সুপ্রসিদ্ধ।

এই কবিতাটি লেখার অব্যবহিত পূর্বে নাটোরের মহারাজের নিমন্ত্রণে কবি নাটোরে যান। কিন্তু সেখানে খুব দাঁতের বেদনায় কষ্ট পান। কবির পত্নী, কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী, এঁরা তখন ছিলেন বোম্বাইয়ের সোলাপুরে। নাটোরের মহারাজের কর্মচারী যদুনাথ লাহিড়ীর যত্নে কিছু সুস্থ হয়ে কবি শিলাইদহে ফেরেন ও ১৮ ডিসেম্বরের (১৮৯২) এক চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লেখেন :

> যেমন বজ্র পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, তেমনি পরস্পর দূরে থাকলে যথাসময় কোনো আওয়াজ পাবার যো নেই ; নিঃশেষ হয়ে গেলে পর তখন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এতদিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পৌঁছল ?···এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয়ভাবনা ভর্ৎসনা নানারকম শোনা যাচ্ছে। তখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোর এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপসর্গ ন দেবায় ন ধর্মায় গেল!'···ব্যায়াম করে আজকাল কোনো ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভালো রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে।

বুঝতে পারা যাচ্ছে চিঠিখানির আসল লক্ষ্য কবিপত্নী। বেনামীতে লেখা বলে অভিমানের সুর আরো জমেছে।

এর পরদিন অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর তারিখে কবি প্রমথ চৌধুরীকে যে চিঠি লেখেন তাতে দেখা যায় একটি কবিতা তিনি দাঁড় করিয়েছেন এবং দাঁড় করিয়ে অনেকখানি মানসিক তৃপ্তি বোধ করছেন। এই কবিতাটি হচ্ছে 'মানসসুন্দরী', এর নীচে তারিখ দেওয়া আছে ৪ পৌষ, ১২৯৯।

দেহ যখন কিছু অপটু আর আপনার জন যখন দূরে তখন কবি তাঁর আজন্ম-সাধন-ধন কল্পনালতা কবিতাকে জ্ঞান করেছেন পরম আপনার, তাঁর জীবনের প্রথমা প্রেয়সী, আর তাকে দেহধারিণী পরমপ্রিয়ারই মতো জ্ঞান করে তার একান্ত সমাদর, শুশ্রূষা, তার সঙ্গে নিবিড়তম মিলন উপভোগ করতে চাচ্ছেন। কবিতা-সুন্দরীর মানবীরূপের অপূর্ব লীলা কবি কল্পনা করেছেন :

অয়ি প্রিয়া,

চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি-স্তরেস্তরে
সরস সুন্দর ;—নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধ'রো, আনন্দ-আভায়
বড়ো বড়ো দুটি চক্ষু পল্লব-প্রচ্ছায়
রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাসে,
নিতান্ত নির্ভরে।

*　　*　　*

যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে
বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে
নির্ঝরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি
কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী
মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি।

কবির এই কল্পনালতা কবিতাসুন্দরী যে তাঁর বহুকালের একান্ত পরিচিতা সেকথা কবি এইকালের একটি চিঠিতে ব্যক্ত করেন এইভাবে :

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো (৫।৬ বৎসর) বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল—তখন থেকে আমাদের পুকুরের ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের একতলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল, তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত—কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়—আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি—আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।

কবির বাল্যের সেই চপল খেলার সঙ্গিনী এখন যৌবনে কি মূর্তি ধারণ করেছেন সে সম্বন্ধে কবি বলছেন :

কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু, সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম ; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত ; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো ; প্রীতিস্নেহ
গভীর সংগীত-তানে উঠিছে ধ্বনিয়া

স্বর্ণবীণাতন্ত্রী হ'তে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি।

এই কবিতাসুন্দরী সম্বন্ধে কবি বলেছেন, তার ঠাঁই হয়েছে চিরদিনের জন্য সেই অন্তর-গৃহে—

যে গুপ্ত আলয়ে
অন্তর্যামী জেগে আছে সুখদুঃখ লয়ে,
যেখানে আমার যত লজ্জা আশা ভয়
সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয়
এত সুকুমার।

কবিতাসুন্দরীকে কবি আরো বলেছেন তাঁর 'জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী'। পরে আমরা দেখব একে কবি সম্বোধন করেছেন তাঁর জীবন-দেবতা বলে।

কবিতাসুন্দরী সম্বন্ধে কবির কখনো মনে হচ্ছে পরজন্মে সে হবে তাঁর প্রেমময়ী জায়া—অপূর্ব প্রেমে সেবায় মাধুর্যে তাঁর জীবন ধন্য করে দেবে।

কবিতাসুন্দরীকে শুধু মানবী প্রিয়ারূপে কল্পনা করেই কবি যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাচ্ছেন তাই নয়, সে যে 'রহস্যমধুরা' সে বিষয়েও কবি পুরোপুরি সচেতন :

নাই বা বুঝিনু কিছু, নাই বা বলিনু,
নাই বা গাঁথিনু গান, নাই বা চলিনু
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি
টানিয়া বাহিরে। শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়,
শুধু তরঙ্গের মত ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে, বাঁচিব মরিব
শুধু, আর কিছু করিব না। দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

কিন্তু কবিতাসুন্দরী 'কখনো বা ভাবময় কখনো মূরতি' হলেও আজ কবি আনন্দ ও তৃপ্তি পাচ্ছেন তাকে পরমলাবণ্যময়ী পরমপ্রেমময়ী মানবী প্রিয়ারূপে দেখে—যে তাঁকে গভীর সান্ত্বনা দিতে পারে তাঁর 'অর্থহীন অস্তিত্বে'। অসীম আনন্দবোধের সঙ্গে দুঃখব্যর্থতাবোধও যে এইকালে কবির মধ্যে কম ছিল না তা বোঝা যাচ্ছে।

কবি এর প্রায় আড়াই বছর পূর্বে প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছিলেন: 'আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহ-মিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল'। তাঁর এই 'মানসসুন্দরী' কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে তাঁর সেই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষারই এক প্রবল রূপ। কবির সাময়িক অসুস্থতা ও নির্বান্ধবতা অংশত এর জন্য দায়ী কিনা তা ভাবা যেতে পারে।

এর ভিতরে তাঁর কবি-প্রকৃতির একটি দিকের—তাঁর উদ্দাম হৃদয়াবেগের—এক অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা পেলাম। সে পরিচয় উপভোগ্যও। কিন্তু ভাববিভোরতা সমগ্র কবিতাটিতে কিছু বেশি প্রকাশ পেয়েছে বলে কবিতা হিসাবে এর মূল্যের কিছু হানি হয়েছে—এই আমাদের ধারণা। এর পরে 'পুরস্কার' কবিতাটিতে আমরা দেখব—ভাববিভোরতা তাতেও প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জীবনধর্মী গুণের সমবায়ে সমগ্র কবিতাটি একটি উচ্চশ্রেণীর কবিতা হয়েছে।

এর 'অনাদৃত' কবিতাটি ১২৯৯ সালের ফাল্গুনে উড়িষ্যায় লেখা। কয়েক মাস পরে সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একখানি চিঠিতে এর এই ব্যাখ্যা কবি দেন:

> মনে কর্ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল—সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হ'ল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই ব'লে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল—কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল,

কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে—গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাকৃগে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনও দেখে নি। সে ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়—এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হ'ল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি—আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা-কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল দিতে হয় নি।' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিত-ভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতা-গুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারছে না—তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো

দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই কালে কবির সমসাময়িকেরা তাঁর লেখার সমাদর যে করেন নি তা নয়; তবে নতুন ভাব ও রূপের কবিতা পুরোপুরি সমাদৃত হতে সব দেশেই সময় লেগেছে। আর প্রায় প্রত্যেক বড় কবিই তাঁর সমসাময়িকদের সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করেছেন।

নিজের সম্বন্ধে কবির আস্থা লক্ষণীয়।

এই কবিতাটির এই সব চরণ চমৎকার ব্যঞ্জনাভরা :

কোনোটা হাসির মত কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়ন-জল,
কোনোটা শরম-ছল
বধূর গালে।

এর 'দেউল' কবিতাটির এই ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন :

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে—সেই সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বদ্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়—ঠাকুরের অভিষেকজলে মেজে স্যাঁৎসেতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

এর 'নদীপথে' কবিতাটি নদীপথে বা খালপথে এক ঝড়বৃষ্টির দিনে রচিত। এটি সম্বন্ধে প্রভাতবাবু বলেছেন :

> কবিতাটিকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে দেখিতে কোনো দোষ নাই। রবীন্দ্রনাথ যে-প্রকার স্নেহশীল তাঁহার মনে এরূপ উদ্‌বেগ ও ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক ; সুতরাং কবিতাটিকে তাহার বাচ্যার্থেই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এর 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটিতে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কবির 'হৃদয়-সিন্ধুতলে নব নব মহাদেশে'র সৃষ্টি হয়ে চলেছে। 'মানসী'র 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটিতে (সেটি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অন্যত্র স্থান পেয়েছে) নতুন-জাতি-গঠনের সংকল্পের পরিচয় ছিল ; 'বিশ্বনৃত্যে' দেখা যাচ্ছে কবির ভিতরে সেই সংকল্প প্রবলতর হয়ে চলেছে :

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে।
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে।

জগৎ-মাতানো সংগীত-তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে।
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যাতরাস
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা এ।

'মানসসুন্দরী' কবিতাটিতে আমরা দেখেছি কবির এক অসাধারণ সৌন্দর্য-বিভোরতা। তার প্রায় তিন মাস পরে লেখা এই 'বিশ্বনৃত্যে' দেখা যাচ্ছে জাতির এক নবজাগরণমন্ত্রে কবির হৃদয়মন উদ্বোধিত।

এর 'দুর্বোধ' একটি প্রেমের কবিতা—অনেকটা 'মানসী'র প্রেমের কবিতারই ধরনের। এতে যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার কথা তেমন নয়। এর প্রেমিক একজন ভাবুকও, তার ভাবুকতা সহজেই তার প্রেমে মিশিয়েছে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র ব্যঞ্জনা, যা তার প্রিয়ার জন্য স্বতঃই দুর্বোধ্য। সেইজন্য তার প্রিয়া কিছু বিষন্ন। কিন্তু ভাবুক-প্রেমিক তার প্রিয়াকে একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলছে যে তার প্রিয়া যদিও তাকে বুঝতে পারছে না তবু এতে সন্দেহ মাত্র নেই যে তার হৃদয় তার প্রিয়ারই রাজধানী। প্রিয়া যেন তার প্রতি কখনো বিমুখ না হয়, বরং কৌতূহলী হয়ে নতুন নতুন আলোকে তার মন পাঠ করতে চেষ্টা করে, কেননা তার হৃদয়ে রয়েছে অনন্ত সুখদুঃখবেদনা, নব নব ব্যাকুলতা। এই শেষোক্ত কথাগুলো কবিতায় চমৎকার রূপ পেয়েছে।

প্রেমের ক্ষেত্রে যে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন আছে কবির এই কথা অতি যথার্থ।

এর 'ঝুলন' কবিতাটির এই ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে

> …বদ্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।
>
> একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তরের আমি আলস্যে আবেশে বিলাসের প্রশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই, সেই পাওয়াতেই আনন্দ।
>
> …এত কাল আমি রেখেছিনু তারে যতনভরে
> শয়ন-'পরে;

ব্যথা পাছে লাগে, দুখ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অনুরাগে
বাসরশয়ন করেছি রচন কুসুম থরে
দুয়ার রুধিয়া রেখেছিনু তারে গোপন ঘরে
যতনভরে।

শেষে সুখের শয়নে শ্রান্ত পরান আলস-রসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুসুমের হার লাগে গুরুভার,
ঘুমে জাগরণে মিশি একাকার নিশিদিবসে,
বেদনাবিহীন অসার বিরাগ মরমে পশে
আবেশবশে।

* * *

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা,
প্রাণেতে আমাতে খেলিব দুজনে ঝুলন-খেলা
নিশীথবেলা।

কবির ভিতরে যে একটি নবচেতনার উন্মেষ হচ্ছে—'চিত্রা'য় তার স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাব—তাই হয়ত কবিকে এমন আত্ম-জাগরণের তাগিদ দিয়ে গেল।—রবীন্দ্রনাথের কবিতা শিল্পীর রূপকর্ম মুখ্যত নয়, মুখ্যত তাঁর আত্ম-কথা, আর সেই আত্মকথা কবি যে সব সময়ে সজাগভাবে বলেছেন তা নয়। চিত্রার 'অন্তর্যামী' কবিতায় কবি নিজেই সে কথা বলেছেন।

এর 'হৃদয়-যমুনা' কবিতাটি খুব জনপ্রিয়—উঁচুদরের কবিতাও বটে। অনন্তের প্রতীক যমুনারূপী কৃষ্ণ রাধাকে আহ্বান করছেন তাঁর কূলের শোভা-সৌন্দর্য উপভোগ করতে, তাঁতে অবগাহন করতে—তাঁতে সম্পূর্ণভাবে ডুবে

যেতে—সেই ডোবাতেই পরম সার্থকতা। মানবীয় প্রেমও প্রেমিক-প্রেমিকার পূর্ণাঙ্গ মিলন, পরস্পরের পূর্ণ আত্মদান চায়, নইলে প্রেম সার্থক হয় না। পূর্ণাঙ্গ আত্মদানের রূপটি এতে পরমহৃদয়গ্রাহী হয়েছে :

যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীত-গান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।

অবশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলনের ছবি কবি এখানে দূর থেকেই দেখেছেন। কিন্তু দেখেছেন শুধু কল্পনা দিয়েই নয়, সমস্ত প্রাণমন দিয়েও। তাই ছবিটি অপূর্ব-ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

এর 'ব্যর্থযৌবন' একটি গান—প্রেমিকার বিফল প্রতীক্ষার রূপ ও ভাব বড় মর্মস্পর্শী করে আঁকা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি রূপক কবিতা হিসাবেও পাঠ করা যায়—মহৎ-কিছুর জন্যে এক নিবিড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ জীবনে প্রতীক্ষা করে, কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার কতটুকু সার্থকতা আর তার লাভ হয় :

মনে লেগেছিল হেন আমারে সে যেন
ডেকেছে।
যেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অনুরাগ,
যৌবন-নদী করিবে সজাগ,
আসিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগ-
বাঁধনে।

আহা সে রজনী যায়, ফিরাইব তায়
কেমনে।

এর 'ভরা ভাদরে' একটি সংক্ষিপ্ত বর্ষা-বর্ণনা। বর্ষার থৈ-থৈ জল, ঝোপ-ঝাড়ের প্রাণপূর্ণ শ্রী, আর এই সবে কবির নিবিড় আনন্দ—সবই রূপ পেয়েছে এতে।

এর 'প্রত্যাখ্যান' একটি প্রেমের কবিতা। প্রেমিকা প্রেমিকের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে, কেননা তার মনে হয়েছে প্রেমিকের গুণপনা যত, তার প্রেম যত গভীর, তার প্রতিদান দেবার সাধ্য প্রেমিকার নেই।

সাধারণ প্রেমের কবিতা হিসাবে পাঠ না করে রূপক হিসাবে পাঠ করলে এটি বেশি উপভোগ্য হয়। প্রেমিকের বা ভগবানের মহৎ প্রেমের সামনে প্রেমিকা বা ভক্ত কুণ্ঠিত হচ্ছে এই ভেবে যে সেই মহৎ প্রেমের প্রতিদান দেবে এমন সামর্থ্য তার নেই।

এর 'লজ্জা'ও একটি প্রেমের কবিতা। বধূ বরকে পুরোপুরি আত্মদান করে, তবু তার কাছে তার লজ্জা-সংকোচও অনেকখানি থাকে—সেই ছবিটি কবি এঁকেছেন, আর তার সঙ্গে একটি গভীর ভাবও যোগ করে দিয়েছেন। সেই ভাবটি মোটের উপর এই : মানবীয় প্রেমেই হোক আর ভগবৎ-প্রেমেই হোক, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে নিবিড় মিলন কাম্য, কিন্তু দুইয়ের নিঃশেষে একীভবন কাম্য নয়—হয়ত সম্ভবপরও নয়। ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় একেই বলা হয়েছে "চিনি হতে ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।" রবীন্দ্র-সাহিত্যে ও সাধনায় ব্যক্তিত্বের বিলোপ নয়, তার বিশিষ্ট মূল্যের কথা বার বার বলা হয়েছে।

এর কোনো কোনো চরণ অপূর্ব-ব্যঞ্জনাময় :

ছলছল দু-নয়ান
করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারি নে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি ;

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশ্বাস,
নহে সখা পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ।
বসন্ত-নিশীথে বঁধু
লহ গন্ধ লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশেপাশে
ক'য়ো কথা মৃদু ভাষে ;
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো।

'শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো'—কত ব্যঞ্জনাময় এই চরণটি! মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি কী দরদ!

মোহিতবাবু এই কবিতাটি নিয়ে বেশ বিব্রত হয়েছেন—রবীন্দ্রনাথের এই মূল ব্যক্তিত্বপ্রীতির দিকে তাকান নি বলে।

এর 'পুরস্কার' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ কবিতা—খুব উঁচুদরের কবিতাও বটে। দীর্ঘ কবিতা এটি, কিন্তু কোথাও কোনোরূপ শিথিলতা দেখা দেয় নি।

এর কবি অবশ্য আপন ভাবে একান্ত বিভোর, সেই বিভোরতাই তাঁর কাছে কবিত্বের শ্রেষ্ঠ দান :

শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি
বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি,
পুষ্পের মতো সংগীতগুলি
ফুটাই আকাশ-ভালে।
অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার-ধূলিজালে।

অতি দুর্গম সৃষ্টিশিখরে
অসীম কালের মহাকন্দরে
সতত বিশ্ব-নির্ঝর ঝরে
ঝর্ঝর সংগীতে।
স্বর-তরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা,—
সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোটো এই বাঁশরিতে।

কবিতা যে বিশেষভাবে সংগীতধর্মী, কবির অন্তরতম ব্যথা ও আনন্দ অথবা এই দুইয়ের অপরূপ সংমিশ্রণ যে গানের সুরের অনির্বচনীয়তা নিয়ে তাতে ধ্বনিত হয়, সে-কথা অনেকেই বলেছেন। তবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় গানের সুরের অনির্বচনীয়তার সঙ্গে জীবন-জিজ্ঞাসাও বিচিত্র ভঙ্গিতে কাব্যে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রকাব্যেও যেমন প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব সংগীতধর্মিতা তেমনি প্রকাশ পেয়েছে জীবন-জিজ্ঞাসাও। এই 'পুরস্কার' কবিতাটিতেও কবি পরমহৃদ্য ভাষায় বলতে চেষ্টা করেছেন কাব্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনে কি কাজে লাগে :

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে অরণ্য-ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দু-একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর
তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে।

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে
শিশিরের মতো রবে।

কবি হিসাবে এই-ই রবীন্দ্রনাথের একান্ত কাম্য ছিল। বার বার সে কথা তিনি বলেছেন। কিন্তু লাভ হয়েছে তাঁর মহত্তর সম্পদ। তিনি চেয়েছিলেন শুধু গীতিকবি হতে, কিন্তু হয়েছেন মহাকবিও।

এক রাজার সামনে কবিতা পাঠ করে পুরস্কারস্বরূপ কবি মণিমাণিক্য চাইলেন না, চাইলেন রাজকণ্ঠের মালা—এই কবিতার বিষয়। কবি যে সাংসারিক লাভালাভ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, অন্তরে বাণীর প্রসন্নতা লাভই যে তাঁর একমাত্র কাম্য, তার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু আমাদের কবি যেমন এঁকেছেন এক ভাবে-একান্ত-বিভোর কবির ছবি তেমনি নিপুণভাবে এঁকেছেন রাজসভা, সভাসদবর্গ, অর্থী প্রার্থী, এদেরও ছবি। ভারতের দুই মহাকাব্য অথবা মহাগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধেও কবি গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কবির প্রিয়ার যে ছবি আঁকা হয়েছে তাতে কালিদাসের যুগের কিছু শালীনতার আমেজ থাকলেও মোটের উপর তা বাস্তবনিষ্ঠ। একই সঙ্গে কল্পনা ও বাস্তব উভয় জগতে এমন স্বচ্ছন্দ বিচরণ উঁচুদরের কবি-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভবপর।

এর ছন্দে ও মিলে কবির অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য কবির অন্যান্য শক্তির সঙ্গে সেসবের একটি সুষ্ঠু যোগ ঘটাতেই সমগ্র কবিতাটির মর্যাদা এত বেড়েছে।

এই ধরনের কবিতায় কবির শক্তির যে মহিমময় প্রকাশ ঘটেছে তা তাঁর পরবর্তীদের জন্য একই সঙ্গে শ্লাঘার আর নৈরাশ্যের বিষয়। তবে নৈরাশ্যের প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। (গোপন নৈরাশ্য-বোধ থেকেই জন্ম হয় নানা ধরনের বিফল বিদ্রোহের।) যা সত্যকার আনন্দের বিষয় তা নিয়ে প্রাণ ভরে আনন্দ করা আর চোখ দুটি পুরোপুরি খুলে রাখা—মনে হয় এই জীবনের রাজপথ।

এর 'বসুন্ধরা' কবিতাটিও সুদীর্ঘ এবং সুপ্রসিদ্ধ। কবি যে তাঁর প্রতিভার দুইটি বড় লক্ষণের একটির নাম দিয়েছেন 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'

তা খুব ব্যাপক রূপ গ্রহণ করেছে এই কবিতাটিতে। পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, জড় ও জীবের যত রকমের প্রকাশ, সব-কিছু সম্বন্ধে কবি অসীম কৌতূহল বোধ করছেন, শুধু কৌতূহল নয় এক অপূর্ব আত্মীয়তা উপলব্ধি করছেন সব-কিছুর সঙ্গে। এই শেষোক্ত ভাবটি রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট ভাব। সেকালের জন্মান্তরবাদ, একালের অভিব্যক্তিবাদ, এসবের সঙ্গে তাঁর এই ভাবের সহজেই একটি যোগ ঘটেছে এবং তার ফলে তাঁর এই অনুভূতি—এর নাম তিনি দিয়েছেন সর্বানুভূতি —এক অসাধারণ প্রাণপূর্ণ আবেদন লাভ করেছে। কবির কাঙ্ক্ষিত সেই সর্বানুভূতির, অর্থাৎ সব-কিছুর অনুভূতির, কিছু কিছু পরিচয় এই :

ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই ;
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো ; বিদারিয়া
এ বক্ষ-পঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার,—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে ;

* * *

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎস সম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধরে—হৃদয়ের চারি ধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরেতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে
সিঞ্চিতে তোমায়—

* * *

সুদুর্গম দূর দেশ,—
পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ,
মহাপিপাসার রঙ্গভূমি; রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে;
দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা 'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে
তপ্তদেহ, উষ্ণশ্বাস বহ্নিজ্বালাময়,
শুষ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়।

*　　*　　*

হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী 'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি'; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দ্বারে।

মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন;
যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন;

*　　*　　*

ইচ্ছা করে, আপনার করি
যেখানে যা-কিছু আছে;

*　　*　　*

কঠিন পাষাণক্রোড়ে তীব্র হিমবায়ে
মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে
নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে

দেশে দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি পান
মরুতে মানুষ হই আরব-সন্তান
দুর্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান
কর্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।
অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—
নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি সাধু প্রথা,
নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর,
নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর-পর,
উন্মুক্ত জীবনস্রোতে বহে দিনরাত
সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত
অকাতরে ; পরিতাপ-জর্জর পরানে
বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে,
ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি,—
উচ্ছৃঙ্খল সে-জীবন সে-ও ভালোবাসি—

বনের বাঘের যে হিংসাতীব্র জীবনানন্দ তারও স্বাদ কবি পেতে চাচ্ছেন :

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে,—দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে.

বিদ্যুতের বেগে, অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দীপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে একবার লভি তার স্বাদ,
ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

বুনো বাঘের লাফ কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ছেলেবেলায়, তা আমরা জেনেছি।

উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন : আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই এইসব ভূতের উৎপত্তি হয়েছে, আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি—যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ। আনন্দ বলতে তাঁরা কি বুঝেছিলেন তা অনুমান করা খুব সোজা নয়। কিন্তু একালের উপনিষদ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আনন্দ বলতে বুঝেছেন জীবনানন্দ, জড়ে জীবে প্রাণের আনন্দ—সেই প্রাণের আনন্দের মহিমা-গান তাঁর কাব্যে অন্তহীন হয়েছে।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ কেউ বুঝেছেন একটি মতবাদ বলে। মোহিতবাবু এর নাম দিয়েছেন জগৎ-ব্রহ্মবাদ। জগৎ, অর্থাৎ যা কিছু সামনে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে, সেসব যে রবীন্দ্রনাথের চোখে এক অপরিসীম-অর্থ-ভরা তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাঁর এই অনুভূতিকে বা দৃষ্টিভঙ্গিকে জগৎ-ব্রহ্মবাদ বলা, অর্থাৎ জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বলতে তার অতিরিক্ত কিছু নেই কবিকে এমন ধারণার প্রচারক জ্ঞান করা, অশেষ-বৈচিত্র্য-পূর্ণ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে দৃশ্যত একটি অদ্ভুত ধারণার পরিচয় দেওয়া। বিচার করে দেখলেও বোঝা যাবে এ মত একদেশদর্শী ভিন্ন আর কিছু নয়।

আমরা জেনেছি এই কবিতায় কবির যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার নাম তিনি দিয়েছেন সর্বানুভূতি—সব-কিছু তিনি গভীরভাবে অনুভব করছেন, সব-কিছুর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করছেন—এই ব্যাপার। আমরা আরো জানি কবি তাঁর অনুভূতিকে কোন তত্ত্বকথার নাম দিতে একান্ত অনিচ্ছুক ; তিনি সহজভাবে প্রকাশ করেন কি তিনি দেখেন কি তিনি অনুভব করেন। এই 'বসুন্ধরা' কবিতায়ও কবির কোনো মতবাদ প্রকাশিত হয় নি—যা কিছু আছে যা কিছু তিনি দেখেছেন, যা কিছু প্রাণে সঞ্জীবিত, স্পন্দিত, সেসবে তাঁর অসীম কৌতূহল, সেসবের প্রতি তাঁর অতি নিবিড় প্রীতি, এই-ই

ব্যক্ত হয়েছে। বিশ্বজগতের সব-কিছু সম্বন্ধে অসীম কৌতূহল, অসীম প্রীতি, এই কবিতার প্রধান রস। এমন কৌতূহল ও প্রীতি আরো অনেক কবির কাব্যে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা ব্যক্ত হয়েছে সবচাইতে ব্যাপকভাবে, নিবিড়ভাবে তো বটেই। কবির কাব্যে এই যে নিবিড় বিশ্ব-আত্মীয়তা ব্যক্ত হয়েছে, আর এই আত্মীয়তাবোধ তাঁর অনুভবে ও চিন্তায় উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর হয়েছে—এটি একালের সাহিত্যে ও সভ্যতায় বিশেষ অর্থপূর্ণ। বলা যায় একালে বিশ্বমানবের মূলীভূত একত্বের উপলব্ধির সূচনা গ্যেটে ও রামমোহন থেকে; আর টলস্টয়ে ও রবীন্দ্রনাথে তার অপূর্ব প্রাণসমৃদ্ধি ঘটেছে। সেই উপলব্ধি যে মানুষের জীবনের জন্য একটি বড় সত্য এই স্বীকৃতির দাবি তা আজ করছে।

অনুভবের দিক দিয়ে বসুন্ধরা কবিতাটি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু গঠনের দিক দিয়ে এতে কিছু দুর্বলতাও লক্ষ্য করা যায়। এতে কিছু কিছু পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। পুনরুক্তি অবশ্য সব সময়েই দোষ নয়; কিন্তু ভাবাতিশয্যের ফলে এখানে তা দোষরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিপুল ও মহৎ প্রাণ-সম্পদে—অনুভব-সম্পদে—এই কবিতা সমৃদ্ধ, তাই এর সেই দোষ উপেক্ষণীয়। এটিকে বলা যায় একটি নতুন উপনিষদ।

'বসুন্ধরা' কবিতাটির পরেই 'সোনার তরী'তে স্থান পেয়েছে আটটি সনেট—তাতে প্রকাশ পেয়েছে দেশ-প্রচলিত মায়াবাদের প্রতি কবির অন্তরতম বিতৃষ্ণা আর নানা-অসম্পূর্ণতা-ভরা মর্ত্যজীবনের প্রতি তাঁর অতিনিবিড় প্রীতি। 'সোনার তরী'র যুগে কবি যে মুখ্যত 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র রসেই বিভোর ছিলেন না, প্রতিদিনের মর্ত্যজীবনের প্রতিও নিবিড়ভাবে কৌতূহলী হয়েছিলেন, এই সনেটগুলোতে তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে। 'বসুন্ধরা' কবিতাটির সঙ্গে এগুলোর গভীর যোগ আছে মিথ্যা নয়, কিন্তু সে-যোগ যেমন ফুলের সঙ্গে ফলের যোগ।

এই সনেটগুলোর শেষটির নিচে তারিখ দেওয়া আছে ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩০০। অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৯৭ সালের শেষের দিকে এইগুলো লেখা। সেই বৎসরই গ্রীষ্মকালের শেষে শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে বেদান্ত সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ জগৎ-বিখ্যাত হন। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বেদান্ত অবশ্য মুখ্যত মায়াবাদী নয়, বরং জীবনধর্মী; কিন্তু তাঁর

চিন্তার সেইদিকে তাঁর স্বদেশীয়দের দৃষ্টি যতটা আকৃষ্ট হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশি তারা উৎফুল্ল হয়েছিল তাঁর প্রতিভায় প্রাচীন বেদান্তের নতুন মহিমা লাভে। মনে হয়, মায়াবাদী বেদান্তের প্রতি দেশের এই নতুন আকর্ষণ জীবনবাদী, প্রাণের অশেষ রূপে মুগ্ধ, কবিকে বিশেষ তাগিদ দিয়েছিল মায়াবাদের এই প্রতিবাদে।

আমরা বলেছি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে অন্তত আমাদের সাহিত্যে মায়াবাদ হৃতগৌরব হয়েছে। তাঁর সেই ভাব ও চিন্তা বিশেষ শক্তিলাভ করেছে 'সোনার তরী'র এই সনেটগুলোয়।

এর পরে 'চৈতালি'তে আমরা দেখব, রবীন্দ্রনাথের সনেট আরো লালিত্য-পূর্ণ হয়েছে। তাঁর এই সোনার তরীর সনেটগুলো সবল ঋজু আর চিন্তায় তীক্ষ্ণ।

আটটি সনেটের একটি উদ্ধৃত করা যাক :

বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহপ্রেম সুখতৃষ্ণা ; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্যের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃষ্ণা আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত সুখে দুখে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
দুর্লভ জীবন, পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।
স্তন্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ
ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মুক্তিভ্রমে।

তথাকথিত মুক্তি নয়, প্রাণেমনে পূর্ণ জীবন কবির বিশেষ কাম্য

এর শেষ সনেটটির কয়েকটি চরণ এই :

মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখপানে,

ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

এর যদি এই ব্যাখ্যা করা হয় যে কবি মানব-আত্মা মানেন না, তিনি শুধু ধূলি-মাটির জীবন মানেন, তবে সেটি হবে দুর্ব্যাখ্যা। (দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) সমসাময়িক কালের 'ছিন্নপত্রাবলী'র এইসব ছত্র কবির কথাগুলোর উপরে প্রচুর আলোকপাত করেছে:

> ...সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার...খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার গভীর সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি...আমার এই অন্তর-প্রকৃতিটি না বুঝলে...আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থ-গ্রহণ করা যায় না...কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল—সেটা দেখে আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বামাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ ও প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে।...আমি এইটুকু জানি যে জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে—তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। (১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫)

এর 'অচল স্মৃতি' কবিতাটিতে কবি তাঁর এক অটল অচল স্মৃতির কথা বলেছেন। সেই স্মৃতির

শিখর গগন-লীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

কার স্মৃতির কথা কবি এখানে বলেছেন সে-সম্বন্ধে কেউ কোনো আলোকপাত করেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই।

এর 'কণ্টকের কথা' কবিতাটিতে কাঁটা ফুলকে লক্ষ্য করে বলছে :

এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর,
ও পাশে পবন পরিমল-চোর,
বনের দুলাল, হাসি পায় তোর
আদর দেখে।

কিন্তু

হায় ক-দিনের আদর সোহাগ
সাধের খেলা,
ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,
মধুপ-মেলা।

আর কাঁটা নিজের মূল্য সম্বন্ধে বলছে :

চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য
কোথাও নাই,
স্পষ্ট সকলি, আমার মূল্য
জানে সবাই।

এ ভীরু জগতে যার কাঠিন্য
জগৎ তারি!
নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন
রাখিতে পারি।

অর্থাৎ, সুন্দর ও কোমল-হৃদয় কবি ও তাঁর অনুরাগী ভক্তদের প্রতি অকরুণ সমালোচকদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এতে। এমন সমালোচক ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এটি হয়ত কবির তীক্ষ্ণতম শ্লেষ।

'সোনার তরী'র শেষ কবিতাটির নাম 'নিরুদ্দেশ যাত্রা।' এটিও খুব বিখ্যাত।

কবি কল্পনাদেবীর সোনার তরীতে চড়ে যাত্রা করেছেন—কল্পনাদেবীই সেই তরী চালিয়ে নিয়ে চলেছেন। কবি সেই তরীতে চড়ে বিচিত্র দৃশ্য

দেখতে দেখতে বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেছেন, কিন্তু তাঁর গন্তব্যস্থল যে কোথায় আজও তা তিনি জানেন না। দূরে পশ্চিমে তপন অস্তমিত হচ্ছে, সিন্ধু আকুলিত, কল্পনাদেবী শুধু সেই সবের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন, কিন্তু লক্ষ্য যে কোথায় সে সম্বন্ধে কিছুই বলছেন না। কবি জিজ্ঞাসা করছেন ওই উর্মিমুখর সাগরের পারে কি কল্পনাসুন্দরীর আলয়, ওখানে কি স্নিগ্ধ মরণ ও শান্তি আছে? কিন্তু কল্পনাসুন্দরী শুধু কবির দিকে চেয়ে হাসেন, কোনো উত্তর দেন না। রজনী অন্ধকার হয়ে আসছে, কল্পনাদেবীর দেহসৌরভ ও বায়ুভরে উড়ে পড়া কেশরাশির স্পর্শ কবি পাচ্ছেন; কিন্তু কবি বুঝতে পারছেন তিনি যখন অধীর হয়ে কল্পনাদেবীকে বলবেন, "কোথা আছ ওগো করহ পরশ নিকটে আসি" তখন কল্পনাদেবী কোনো কথা বলবেন না, তাঁর নীরব হাসিও কবি দেখবেন না।

কল্পনাদেবীর তরণী যে কবিকে নিয়ে পশ্চিমের দিকে চলেছে একথা কবিতাটিতে দুই জায়গায় বলা হয়েছে। তাতে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন, একালের বাংলা সাহিত্যের এবং কবির নিজেরও যে য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে বিশেষ প্রেরণালাভ হয়েছিল সেই কথা এখানে বলা হয়েছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন, য়ুরোপীয় সাহিত্যই যে কবির বিশেষ প্রেরণার স্থল, বিশেষ শ্রদ্ধারও বস্তু, তার ইঙ্গিতও এই কবিতায় আছে। কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যাখ্যা অদ্ভুত। আমরা দেখেছি য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে প্রেরণা কবি অল্প বয়সেই লাভ করেছিলেন; কিন্তু কাব্য-প্রচেষ্টায় বিশেষ প্রেরণা তাঁর লাভ হয়েছিল আমাদের দেশের কবিদের থেকেই।

এই কবিতায়ও দেখা যাচ্ছে কবি অনুভব করছেন, যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই তাঁর তরীর পালে নতুন নতুন হাওয়া লাগছে আর তার ফলে তাঁর তরণী যে কোথায় ভেসে যাচ্ছে তার কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। —কবির জীবনের এই যুগে এমন অবস্থায়ই তিনি উপনীত হয়েছিলেন। নানা ধরনের প্রেরণা নানা সুখ-দুঃখ-বেদনা, নানা উদ্দেশ্য-আদর্শ তাঁর মনে জাগছিল—তাঁর বিচিত্র কর্ম-চেষ্টায় তাঁর সেই পরিচয় রয়েছে—তাই বাস্তবিকই তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কল্পনাসুন্দরী, তাঁর জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁকে কোন্‌দিকে নিয়ে চলেছেন।

এই কল্পনাসুন্দরী 'চিত্রা'য় নাম পেয়েছে জীবনদেবতা।

এই কল্পনাসুন্দরীকে কবি বলেছেন বিদেশিনী, কেননা তিনি অনেকখানি রহস্যময়ী। আর কল্পনাদেবীর দেহ-সৌরভই পাওয়া যায়, তাই আমাদের আকুল করে, নতুন নতুন প্রেরণা দেয়, তার চাইতে স্পষ্টতর কিছু তার কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

কবি-কল্পনা সম্বন্ধে গ্যেটে বলেছেন :

যখন হৃদয়মন উধাও হয়ে ওঠে,
তখন হে তরুণ, মনে রেখো,
কল্পনাদেবী সুন্দরী সঙ্গিনী বটেন,
কিন্তু অক্ষম তিনি পথনির্দেশে।

রবীন্দ্রনাথ তেমন স্পষ্ট কথা এখানে বলেন নি। তবে মনে হয় সেই ধরনের কিছু তিনি যেন এখানে অনুভব করেছেন। অথবা বলা যায়, কল্পনাদেবী অথবা জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এতদিন যে-রূপে তাঁর সামনে ছিলেন এইবার সেই রূপের বদল হবে—তারই আভাস তিনি পাচ্ছেন।

স্পষ্ট চিন্তা রবীন্দ্রসাহিত্যে যা পাওয়া যায় সে-তুলনায় তাঁর রচনা অনুভূতির বিচিত্র রূপ-রেখায় সমৃদ্ধতর।

'মানসী'র শেষে আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম : ইয়োরোপীয় কাব্য ও কবিদের থেকে কি ধরনের প্রেরণা কবির লাভ হয়েছিল। 'সোনার তরী'র এই শেষ কবিতাটির আলোচনাকালে প্রসঙ্গত তার উত্তর আমরা দিয়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। কবি নিজে বলেছেন ইয়োরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজি কবিতার সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন অল্প বয়সেই। শেলীর চিন্তার প্রভাব যে তাঁর উপরে পড়ে তাঁর 'কবিকাহিনী' রচনার কালেই তা আমরা জেনেছি। 'সোনার তরী'তে তাঁর যে গভীর ভাবাবেগ প্রকাশ পেয়েছে তা অনেক সময়ে কীট্‌স্-এর কবিতার কথা (কবির ভাষায় কীট্‌সের 'আনন্দসম্ভোগের আন্তরিকতা'র কথা) স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীট্‌স্ যে কবির সবচাইতে বেশি প্রিয় ছিলেন সেকথা তিনি বলেছেন 'ছিন্নপত্রাবলী'র একখানি চিঠিতে (২৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ, কোলরীজ, টেনিসন, ব্রাউনিঙ্‌, এঁদেরও প্রকৃতিবোধ, সৌন্দর্য-বোধ ও জীবনবোধের প্রভাব যে কবির উপরে পড়েছিল তা বোঝা যায়। কবিতার গঠন, বাচন-ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা, এসব ক্ষেত্রেও কবির যে ইংরেজ কবিদের

কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য লাভ হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, কবি বিশেষভাবে ভারতীয় ও বাঙালী—বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস আর উপনিষদের আনন্দবাদ তাঁর ভাষা ছন্দ ও মানস-গঠনে সবচাইতে বেশি সহায় হয়েছিল। সেই সঙ্গে এটিও স্বীকার্য যে প্রত্যেক বড় ও সার্থক প্রতিভার মতো তাঁর চারপাশের সমসাময়িক যে জীবন তাই তাঁকে নানাভাবে উদ্বোধিত করেছিল তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও জীবন-সাধনায়।

এই সম্পর্কে কবির শেষ বয়সের এই বিখ্যাত উক্তিটিও স্মরণীয় :

দেশ-বিদেশ থেকে নানারকম ভাবের প্রেরণা এসে পৌঁছেছে আমার মনে এবং রচনায় তাকে স্বীকার করে নিয়েছি, তা আমার কাব্যদেহকে হয়তো বল দিয়েছে পুষ্টি দিয়েছে কিন্তু কোনো বাইরের আদর্শ তার স্বাভাবিক রূপকে বদল করে দেয় নি। আগাগোড়া রূপ বদল দেখলেই বুঝি সেটা আদর্শকে গ্রহণ করা নয় সেটা আদর্শকে নকল করা। এই জিনিসটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।…আমাদের দেশের হাল আমলের কাব্য, যাকে আমরা আধুনিক বলছি, যদি দেখি তার দেহরূপটাই অন্য দেহরূপের প্রতিকৃতি তাহলে তাকে সাহিত্যিক জীবসমাজে নেব কি করে? যে কবিদের কাব্যরূপ অভিব্যক্তির প্রাণিক নিয়মপথে চলেছে তাঁদের রচনার স্বভাব আধুনিকও হতে পারে সনাতনীও হতে পারে অথবা উভয়ই হতে পারে, কিন্তু তার চেহারাটা হবে তাঁদেরই, সে কখনোই এলিয়টের বা অডেনের বা এজরা পাউণ্ডের ছাঁচে ঢালাই করা হতেই পারে না।…যে কবির কবিত্ব পরের চেহারা ধার করে বেড়ায় সত্যকার আধুনিক হওয়া কি তার কর্ম?*

ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অথবা গ্যেটের অনেক চিন্তা যে কবিকে সহজভাবে স্পর্শ করতে পেরেছিল তার বড় কারণ—কবি বিকশিত হয়েছিলেন ও সাধনা করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ভাবধারায়, যা গ্যেটের মতো ও ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মতো অনেকখানি ইয়োরোপের নব-মানবিকতার প্রভাবে পুষ্ট। ইয়োরোপের প্রভাব কেন বাংলার উপরে এমনভাবে পড়লো তার উত্তর দেওয়া সোজা নয়। সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে ও

* রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হচ্ছে। তবে তেমন ঘটনা যে ঘটেছিল তা আজ সুবিদিত। তা কবির জীবনে প্রভাব বাইরে থেকে যতই আসুক তা শিকড় নিয়েছিল ভারতীয় ও বাঙালী 'জমি'তে। তাতেই সেসব সার্থক হতে পেরেছিল, কেননা, কবির কাব্য একই সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট সৃষ্টি আর তাঁর দেশেরও আনন্দ-ধন। 'আধুনিক কাব্য' নামে যা পরিচিত তা দেশের জমিতে এমন শিকড় নেয় নি, দেশের চিত্তকেও তা স্পর্শ করতে পারে নি। কোনো কালে যে স্পর্শ করতে পারবে তা ভাবা কঠিন শুধু যে তার চেহারা ধার-করা সেই জন্যই নয়, কোনো প্রাণ-সত্যে তা সমৃদ্ধ নয় সেই বড় কারণে। মধুসূদনের সঙ্গে তুলনা করলে 'আধুনিক'দের সেই দৈন্য সহজেই ধরা পড়ে।

ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে অনেক তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে। তথ্যপঞ্জী নাম দিয়ে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন সেসব আরো বিস্তৃতভাবে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। এই তথ্যপঞ্জী আমাদের যথেষ্ট কাজে লেগেছে তা বলাই বাহুল্য, আর সেজন্য পুলিনবাবুকে এই সুযোগে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক বিশী তাঁর বইখানিতে নানা দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-গুলোর বিচার করেছেন। তাঁর মন্তব্য মাঝে মাঝে চিত্তগ্রাহী হয়েছে। কিন্তু তাঁর অনেক মন্তব্য মনে হয়েছে অসার্থক, কেননা, বিচারে তিনি কিছু খেয়ালী হয়েছেন। আমাদের আলোচনায় সেসবের কিছু কিছু উল্লেখ স্বভাবতই এসে পড়বে।

রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে। এটিকে কোনো স্থায়ী সংগ্রহে স্থান দেবার কথা কবি ভাবেন নি। তারপর ১২৯১ সালে ও ১২৯২ সালের সূচনায় তাঁর তিনটি ছোটগল্প—'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা' ও 'মুকুট'—প্রকাশিত হয়। এগুলো তাঁর রচনাবলীতে সংগৃহীত হয়েছে। তবে কবির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এগুলোতে তেমন ফোটে নি, যদিও মাঝে মাঝে বর্ণনা ও মন্তব্য হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

তাঁর প্রতিভার পূর্ণ স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর যেসব ছোটগল্প সেসবের সূচনা ১২৯৮ সালে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রে। কবি বলেছেন, "…'সাধনা' বাহির হইবার পূর্বেই 'হিতবাদী' কাগজের জন্ম হয়।…সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটগল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

ছয় সপ্তাহে কবি এই ছয়টি গল্প লিখেছিলেন—'দেনাপাওনা', 'পোস্টমাস্টার', 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি', 'ব্যবধান' ও 'গিন্নি'। তাঁর 'খাতা' গল্পটিও 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত হয়েছিল এই ধারণাও কেউ কেউ ব্যক্ত করেছেন।

এর পর ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণে 'সাধনা' প্রকাশিত হলে কবি নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতি মাসে ছোটগল্প প্রকাশ করতে থাকেন ও চার-বৎসরকাল স্থায়ী 'সাধনা'য় ছত্রিশটি ছোটগল্প লেখেন—১৩০০ সালের পৌষ থেকে ১৩০১ সালের আষাঢ় পর্যন্ত 'সাধনা'র সংখ্যাগুলোয় তিনি কোনো ছোটগল্প লেখেন নি। আমরা মুখ্যত 'হিতবাদী' ও 'সাধনা'র ছোটগল্পগুলো সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব।

জমিদারি কাজ দেখার সূত্রে পল্লীবাংলার সঙ্গে, বিশেষ করে মধ্য ও উত্তর বাংলার শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ও সেই-সব অঞ্চলের পদ্মা, গোরাই, নাগর, আত্রাই, বড়ল, ইছামতী প্রভৃতি বড় ও ছোট নদীর সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ঘটে সেই অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকার উপরেই বিশেষভাবে দাঁড়িয়েছে তাঁর 'সাধনা'র যুগের ছোটগল্প। কবি সে-কথা নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, আর সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাঁর অনেক ছোটগল্পের উৎপত্তি যে বাস্তব ঘটনা থেকে সেই কথাও। পরে পরে সেসবের কিছু বিস্তৃত পরিচয় আমরা পাব।

কিন্তু তাঁর 'হিতবাদী'র ছোটগল্পগুলোর মাত্র 'পোস্টমাস্টার' গল্পটির পট-ভূমিকা সাজাদপুরের, অপরগুলোর তেমন কোনো বিশেষ পটভূমিকা নেই, সেগুলো সাধারণভাবে বাংলার ও বাঙালীর, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বাঙালীর, ছোটখাটো সমস্যার ও সুখদুঃখের, তাদের বিশেষ চালচলন ও পছন্দ অপছন্দের কথা। সুলিখিত হয়েছে সেইসব কথা। বাঙালী জীবনের ছোটখাটো কথা তেমন সুলিখিত এর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের পূর্বে আর হয় নি।

পরেও কমই হয়েছে। তাই সেসব পরম উপভোগ্য হয়েছে—বিশেষ করে বাঙালী পাঠকদের কাছে।

কিন্তু এইসব গুণের জন্যই কি 'হিতবাদী'র এই রচনাগুলোকে মহাপ্রাণ রচনা বলা যাবে? কেউ কেউ হয়ত বলবেন—হাঁ। তাঁদের মতে যা সুলিখিত হয়েছে তাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য। বলা বাহুল্য এ মত অবহেলার যোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের ধারণা, 'হিতবাদী'র গল্পগুলোর মধ্যে মহাপ্রাণ রচনা মাত্র 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি। অন্যগুলো খুব উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে অখ্যাত পল্লীবালিকা রতনের অবজ্ঞাত স্নেহপ্রেম বর্ণনায় ও ব্যঞ্জনায় যে প্রকাশলাভ করেছে তা অপূর্ব। হয়ত অবহেলিত স্নেহপ্রেমের সু-অঙ্কিত চিত্র বলেই তা এমন মনোহারী হয়েছে। অকৃত্রিম স্নেহপ্রেমের কথা—তা যত ক্ষুদ্র যত নগণ্যই হোক—সহজেই মানুষের মনকে আকর্ষণ করে।

বাস্তবের তীক্ষ্ণবোধ আর উৎকৃষ্ট কবিত্ব ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডীর কোনো কোনো ছোটগল্পেও প্রকাশ পেয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট ছোটগল্পের বৈচিত্র্য অনেক বেশি—তাঁর অনুভূতি-সম্পদও অনেক ক্ষেত্রে আরো উচ্চাঙ্গের।

অধ্যাপক বিশী প্রশ্ন তুলেছেন: রবীন্দ্রনাথের ভালো ছোটগল্প যত ভালোই হোক তবু গদ্য-রচনা, তাঁর কবিতার মতো কালজয়ী সেসব তাই নাও হতে পারে। কথাটি কিছু ভাববার মতো। কিন্তু কিছু কিছু গদ্যও কালজয়ী হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথের উৎকৃষ্ট ছোটগল্প একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট গদ্যরচনা, কেননা বাস্তবের বিশেষ বোধ তাতে ব্যক্ত, আর কবিত্বধর্মীও, কেননা বিশেষ অনুভূতি-ধনে সেসব সমৃদ্ধ। তাই আশা করা যায় কবির উৎকৃষ্ট কবিতারই মতো তাঁর উৎকৃষ্ট ছোটগল্পও কালজয়ী হবে।

অধ্যাপক বিশী রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো সম্বন্ধে একটি ভালো মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন: "গল্পগুচ্ছের সমগ্রতাকে আধুনিক পল্লীবঙ্গের পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।" কিন্তু কবির ছোটগল্পগুলো সম্বন্ধে এই একটি অদ্ভুত মন্তব্যও তিনি করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস।" তত্ত্বত তাঁর এই উক্তি অর্থহীন, কেননা কবিরা নিজেরাই বলেছেন

The poet's art gives to airy nothing a local habitation and a name.

অথবা

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

সাহিত্যিক সৃষ্টি বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণ ভিন্ন আর কিছু হতেই পারে না। অবশ্য সেই মিশ্রণের ইতরবিশেষ আছে আর তারই ফলে সাহিত্যিক সৃষ্টি সাধারণ অসাধারণ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট এইসব শ্রেণীতে ভাগ করে দেখা হয়। অধ্যাপক বিশী বলতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ বড় জমিদার, তাই পল্লীজীবনের পুরোপুরি পরিচয় তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। তেমন খেদ কবি নিজেও পরবর্তীকালে করেছেন। সে বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পগুলো 'অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস' যে নয় সে-কথাও দ্বিধাহীন কণ্ঠেই তিনি বলেছেন :

…লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, "উনি তো ধনীঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে রুপোর চাম্‌চে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।" আমি বলতে পারি আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়। যথার্থ জানায় ভালোবাসা। কুঁড়ির মধ্যে যে কীট জন্মেছে সে জানে না ফুলকে। জানে, বাইরে থেকে যে পেয়েছে আনন্দ। আমার যে নিরন্তর ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছে। আজ বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন। আমার রচনাতে পল্লী-পরিচয়ের যে অন্তরঙ্গতা আছে, কোনো বাঁধা-বুলি দিয়ে তার সত্যতাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মুখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা যায় নি।

আর উদ্ধৃত না করলেও চলে ; তবু কবির আরো দুটি উক্তি উদ্ধৃত করছি :

প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে আলোচনা নিয়ে।

অন্যত্র

আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।

বিশী মহাশয়ের মন্তব্যটি যে অযথার্থ তার পরিচয় তাঁর এই বইখানিতেও রয়েছে—তাঁর নিজেরই অনেক মন্তব্যে তাঁর এই আপত্তিকর ও খেয়ালী মন্তব্যটি খণ্ডিত হয়েছে।*

বাঙালীর সর্বস্তরের জীবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে কি বিস্ময়কর ভাবে তাঁর দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন সেই পরিচয় তাঁর ছোটগল্পগুলোয় ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাঁর অপূর্ব সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য নয়, এই জ্ঞানের জন্যও তাঁর ছোটগল্পগুলোর এমন মর্যাদা। জ্ঞান অভিজ্ঞতা-লব্ধ কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতা সকলের এক রকমের নয়। রাজার ছেলে বুদ্ধদেবের জীবনে দুঃখের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল খুব কম দুঃখীরই তেমন অভিজ্ঞতা হয়। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় আমরা পাচ্ছি তাঁর ছোটগল্পগুলোয়—তারই মূল্য বোঝা আমাদের কাজ। কেমন করে সেই অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, অথবা হওয়ার সম্ভাবনা কতটা ছিল, সেসব প্রশ্নের অনেকটাই অবান্তর।

* বিশী মহাশয় মাঝে মাঝে বেশ খেয়ালী হন। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির আলোচনায় তিনি মাত্রাতিরিক্তরূপে খেয়ালী হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চল আজো আমাদের অনেকের অপরিচিত নয়।

† গ্যেটে বলেছেন :

সত্যকার কবির জন্য জগৎবিষয়ক জ্ঞান সহজাত, এর যথাযোগ্য চিত্রণে তাঁর বিস্তারিত অভিজ্ঞতার বা ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন হয় না।

...ফাউস্‌টে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়ত আছে, কিন্তু যদি আমার অন্তরে পূর্বে থেকেই জগৎ না থাকতো তবে চোখ থাকতেও হতাম কানা, সমস্ত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনই হতো প্রাণহীন নিষ্ফল শ্রম।

(কবিগুরু গ্যেটে ২য় খণ্ড ৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সাহিত্যে Art for art's sake-মতের অনুরাগী যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অনেক লেখায় সেকথা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর হিতবাদীর গল্প-গুলোয় দেখা যাচ্ছে 'পোস্টমাস্টার' ভিন্ন আর সব গল্প মোটের উপর সমস্যা-সংকুল। এর থেকেই বোঝা যায় জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা কত প্রখর ছিল। অবশ্য গল্পগুলো উপভোগ্য হয়েছে শুধু কবির সমস্যা-সচেতনতার জন্য নয়, কবির ব্যাপক-জীবন-ও-জগৎ-সচেতনতারই জন্য। জীবন সমস্যা, সিদ্ধান্ত, এসবের চাইতে বড়—সে জ্ঞান কবিতে কখনো আচ্ছন্ন হয় নি।

'হিতবাদী'র গল্পগুলোর অনেকগুলো চরিত্রের মধ্যে বোধ হয় রামকানাই কিছু বিশিষ্ট চরিত্র হয়েছে। সে আমাদের মনে কিছুটা দাগ কাটে। আর সব চরিত্র type-জাতীয়ই বেশি। অবশ্য সহজ ভাবেই সাহিত্যে অনেক টাইপ-চরিত্রের সৃষ্টি হয়। Type-চরিত্রেও লেখকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়। রামকানাইকে আমরা নানা ভাবে দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে। রতন স্মরণীয় হয়েছে একটি ছোট, অখ্যাত কিন্তু অকৃত্রিম বেদনা-মূর্তি হিসাবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গল্পগুলো শরৎচন্দ্রকে কত প্রভাবিত করেছিল সে দিকটা তেমন ভেবে দেখা হয় নি।

'সাধনা'য় প্রথম প্রকাশিত হয় 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি। এটি খুব প্রসিদ্ধ। এর পরিবেশ খানিকটা রচনা করেছে বর্ষার দুরন্ত পদ্মা। তবে মোটের উপর এতে ব্যক্ত হয়েছে বাঙালী-জীবনের সাধারণ কথাই। ভৃত্য রাইচরণ একটি সাধারণ ভৃত্যরূপেই অঙ্কিত হয়েছে—সাধারণ ভৃত্যেরই মতন সে অজ্ঞ ও মূর্খ। কিন্তু প্রভুর শিশুপুত্রকে এবং সেই সঙ্গে প্রভু ও প্রভুপত্নীকে সে এতখানি ভালোবেসেছে যে তারই কিছুটা অসাবধানতার ফলে প্রভুর শিশুপুত্রটি পদ্মায় ডুবে গেলে তার জীবনের সমস্ত সুখশান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল। এর ফলে স্বভাবতই তার চাকরিতে জবাব হ'ল। অল্পদিনে তার নিজের একটি পুত্র লাভ হ'ল এবং তার সেই পুত্রটিকে বেড়ে উঠতে দেখে তার ধারণা জন্মাল তার প্রভুর পুত্রটিই তার ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছে। ক্রমে এই ধারণা তাকে পেয়ে বসল এবং ছেলেটিকে সে মানুষ করতে লাগল এমনভাবে যেন সে তার ছেলে নয়, তার প্রভুরই ছেলে, তার জিম্মায় আছে।

ছেলেটির বয়স যখন এগার-বারো বৎসর হ'ল তখন সে একদিন তাকে তার পূর্বতন প্রভুর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বললে, ছেলেটি তার প্রভুর, সে চুরি করে নিয়ে গিয়ে এতদিন নিজের কাছে রেখেছিল। তার প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো প্রমাণ আছে? রাইচরণ বললে, "আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন।" সহজেই পুত্রটি তার প্রভুর বাড়িতে গৃহীত হ'ল, বিশেষ করে তার প্রভুপত্নী কোনো সন্দেহকে আমল দিতে চাইলেন না। কিন্তু তার এমন কাজের জন্য তার ন্যায়ানুবর্তী প্রভু বললেন—"রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পারিবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদকণ্ঠে বললে—"প্রভু, বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বললেন—"আহা থাক। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।" কিন্তু তার প্রভু বললেন—"যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ কোনো কথা বুঝিয়ে বলতে পারলে না। সে প্রভুর পা জড়িয়ে ধরে বললে—"আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছে।" এতে তার প্রভু অসন্তুষ্ট হলে সে বললে, তার অদৃষ্টই সব করিয়েছে। এসব কথা অবশ্য তার প্রভুর গ্রাহ্য হবার নয়। কিন্তু ছেলেটি পিতাকে উদারভাবে বললে—"বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

গল্পটির শেষ অনুচ্ছেদ এই :

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

গল্পটি অতিশয় করুণ। সেটি এর জনপ্রিয়তার মূলে অনেকখানি। কিন্তু এতে রাইচরণের চরিত্রটিও এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছে। তার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস, তার অকৃত্রিম প্রভুভক্তি, এসবের দিকে পূর্বের মতো অসন্দিগ্ধ মনোভাব আর আজকার মানুষের নেই। তাই এ ধরনের গল্প একালে হয়ত আর লেখা হবে না। কিন্তু যেদিনে এটি লেখা হয়েছিল সেদিনে এসব এতটা অবিশ্বাস্য হয় নি।

কিন্তু তার চাইতেও বড় ব্যাপার চরিত্রটি যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেইটি। রাইচরণের মূর্খতা ও অকৃত্রিমতা আর সেই মূর্খতা ও অকৃত্রিমতার জন্য সম্ভবপর হয়েছে তার যে অপূর্ব প্রভুপ্রেম ও দায়িত্ববোধ সেটি, এমন একটি রূপ পেয়েছে যা আমাদের অবিশ্বাসের উদ্রেক করে না, বরং, মানুষের এমন সরলতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। পল্লীর মানুষের এই সরলতা সম্বন্ধে কবি তাঁর 'পঞ্চভূতে' এই সুবিখ্যাত উক্তি করেছেন :

> আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলওয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে।...এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্ত-স্বভাব, এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বেই ইহাদের বংশের আদি পুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন।...এই-সমস্ত স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত সভার কোনো একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে, স্থির হইয়া নাই, তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি লণ্ডন হইতে, প্যারিস হইতে গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণা বাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যাম-সুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক প্রকার ভালোই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালোরূপ হৃদয়ঙ্গম হইত না। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।...কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমনকি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন।...সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।

এমন মহামূল্য সরলতায় ভূষিত বলে রাইচরণ চরিত্রটি এক মহার্ঘ সৃষ্টি। কিন্তু সংসারের হাটে তার কি মূল্য সেই বেদনাকর পরিচয় দিতেও কবি ভোলেন নি।

দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'সম্পত্তি-সমর্পণ'। মহাকৃপণ যজ্ঞনাথের সঞ্চয়তৃষ্ণা ও সেই তৃষ্ণার অদ্ভুত ও একান্ত শোচনীয় পরিণতি কবি এতে চিত্রিত করেছেন। সেই চিত্রণের দক্ষতাই এই গল্পটির প্রধান আকর্ষণ।

কৃপণ যজ্ঞনাথকে তার গ্রামের লোকেরা বিদ্রূপ করে বলত চাম্‌চিকে। এই চাম্‌চিকে কথাটি এই অর্থে শিলাইদহ অঞ্চলে খুব ব্যবহৃত হয়। হতে পারে সেই অঞ্চলের কোনো মহাকৃপণ সম্বন্ধে কিংবদন্তী কবি এই গল্পটিতে রূপ দিয়েছেন।

তৃতীয় গল্পের নাম 'দালিয়া'। এটি কিঞ্চিৎ ইতিহাস-গন্ধি। এটি উপভোগ্য; কিন্তু কোনো বিশেষ রাবীন্দ্রিক সম্পদের সন্ধান এতে আমরা পাই নি। এর পরের গল্প 'কঙ্কাল' খুব প্রসিদ্ধ।

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই সঙ্গী বাড়ির যে ঘরে মাস্টারদের কাছে পড়তেন তাতে একটি কঙ্কাল লট্‌কানো হয়েছিল তাঁদের অস্থিবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্যে—এ কথা আমরা জেনেছি। সেই কঙ্কালের স্মৃতি অবলম্বন করে এই গল্পটি লেখা। এই গল্পটির বক্তা সেই কঙ্কাল। নিশীথ রাত্রে একলা বিছানায় কবি জেগে আছেন ও সেই অবস্থায় কঙ্কালের মুখে গল্পটি শুনছেন—এইভাবে গল্পটিকে বেশ রহস্যময় করে তোলা হয়েছে। এমন রহস্যময় গল্প কবি কিছু কিছু লিখেছিলেন—বিশেষ করে তাঁর গল্পরচনার প্রথম দিকে। কিন্তু রহস্যের আবরণ দেওয়া থাকলেও এইসব গল্পেও কবির প্রধান বর্ণনার বিষয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-ব্যর্থতা, এইসবই। অতি-প্রাকৃতের প্রতি কোনো সত্যকার আকর্ষণ কবির নেই।

কবি কল্পনা করেছেন—কঙ্কালটি একটি প্রেমবঞ্চিতা বিধবা যুবতীর। সেই যুবতী রূপলাবণ্যবতীও ছিল। একজনের অনুরাগ জীবনে তার লাভ হয়েছিল।—অন্তত সেই কথা সে ভেবেছিল; সে যে তার অনুরাগিণী হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু একদিন সে দেখলে তাকে লুকিয়ে তার অনুরাগী বিয়ে করতে যাচ্ছে। এতে প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে পানীয়ে বিষ মিশিয়ে সে তাকে হত্যা করে। সে নিজেও বধূবেশে সজ্জিত হয়ে আত্মহত্যা করে।

প্রতিহিংসার ছবি তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল রেখায় গল্পটিতে আঁকা হয়েছে—সেই সঙ্গে নায়িকার রূপলাবণ্যও। সেই রূপলাবণ্যের পরিণতি হয়েছে কঙ্কালে এই নিয়ে কঙ্কাল বক্রহাসি হেসেছে—সে-হাসি বেদনামাখা। প্রতিহিংসার এমন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল চিত্র, ব্যর্থতার জন্য এমন মর্মান্তিক বাঁকা হাসি, রবীন্দ্রনাথ বেশি আঁকেন নি। এত তীক্ষ্ণ ও তীব্র রেখা ও রং সাধারণত তিনি ব্যবহার করেন না। গল্পটি মোপাসাঁরও হতে পারত।

এর পরের গল্পটি 'মুক্তির উপায়'। এটি একটি কৌতুককর গল্প। গোবেচারা স্বামী আর জাঁদরেল গোছের স্ত্রী, এদের নিয়ে কবি প্রচুর হাস্য-কৌতুকের অবতারণা করেছেন। এমন তুখোড় গ্রাম্য স্ত্রী কবি বেশি আঁকেন নি। কিন্তু যা এঁকেছেন তা থেকেও বোঝা যায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি।

'ত্যাগ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালের বৈশাখের 'সাধনা'য়। একটি অনাথা বালবিধবা কায়স্থের কন্যা এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রিতভাবে থাকত। মেয়েটি সুন্দরীও। পাড়ার একটি কলেজে-পড়া ব্রাহ্মণের ছেলে তাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাদের দুইজনের মধ্যে গভীর অনুরাগ জন্মে। ছেলেটির আগ্রহ দেখে মেয়েটির ব্রাহ্মণ অভিভাবকরা মেয়েটিকে ব্রাহ্মণের কন্যা বলে পরিচয় দিয়ে তাদের বিয়ে দিলে। মেয়েটি এতে ঘোর আপত্তি করেছিল, কিন্তু তার অভিভাবকেরা সে আপত্তি শোনে নি। কালে মেয়েটিরই অবিভাবকদের একজন ব্যাপারটি ফাঁস করে দিলে কতকটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে কতকটা অন্যের জাত বাঁচাবার জন্যে। তখন বরের বাপ তাঁর ছেলেকে আদেশ করলেন তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে। ছেলেটি সব কথা জেনে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে: "সত্য কি?" স্ত্রী বললে: "সত্য।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে: "এতদিন বল নাই কেন?" স্ত্রী বললে: "অনেকবার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।"—শেষ পর্যন্ত ছেলেটি তার পিতাকে বললে: "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।" পিতা গর্জে উঠে বললেন: "জাত খোয়াইবি?" পুত্র বললে: "আমি জাত মানি না।" তখন পিতা বললে, "তবে তুই-সুদ্ধ দূর হইয়া যা।"

সংক্ষেপে গল্পটি এই। একটি গভীর ভালোবাসার ছবি কবি এতে এঁকেছেন। তার উপরে সমাজের নির্মম খড়্গাঘাত হ'ল। কিন্তু ছেলেটি ভয় পেলে না।

তাতে সে-আঘাতের অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। জাতে ঠেলাঠেলির যে কৌতুককর আর নিষ্ঠুর ছবি এতে আঁকা হয়েছে সেটি আজ অনেকটাই গত যুগের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি সবল মেরুদণ্ডের, তা তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে, আর বধূটি বুদ্ধিহীনা নয়, কিন্তু বড় কোমল স্বভাবের —তার সেই স্বভাব তার মাধুর্য বাড়িয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পটি কাব্যধর্মী বেশি। সাধারণ বাঙালী জীবনের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের ছবি এতে ফুটেছে। কিন্তু তারও উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এর কাব্যধর্মিতা।

এর পরের গল্প 'তাসের দেশ' বিখ্যাত। সনাতন হিন্দুসমাজের সাড়ম্বর স্থিতিধর্মিতা এতে কবির নিপুণ ব্যঙ্গের বিষয় হয়েছে। সেই ব্যঙ্গের মধ্যে মাঝে মাঝে যৌবনের গতির নেশা, প্রেমের রঙিন স্বপ্ন, এতে সৌন্দর্য বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে এই গল্প অবলম্বন করে কবি তাঁর 'তাসের দেশ' নাটিকা রচনা করেন।

এর পরের গল্পটি 'জীবিত ও মৃত'। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> অনেকদিন আগে কলকাতার বাড়িতে, ঠিক সময়টা মনে পড়ে না তবে ছোটো বউ (রবীন্দ্রনাথের পত্নী) তখন ছিলেন, একবার আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে পড়ায় আমার বাইরের বাড়িতে শোবার ব্যবস্থা হয়।··· শোবার জায়গায় যাব বলে চলেছি—ভিতর বাড়ি পার হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছে চারিদিক, আলো অন্ধকারে বড়ো বড়ো ছায়ায় মিলে সে এক গভীর রাত্রি। সত্যিকারের রাত বলা যায় তাকে। বারান্দায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, মনে এল একটা কল্পনা যেন এ-আমি আমি নই। যে-আমি ছিলুম সে-আমি নয়, যেন আমার বর্তমান-আমিতে আর আমার অতীতে একটা ভাগ হয়ে গেছে। সত্যি যদি তাই হয় তাহলে কেমন হয়? মনে হল যদি পা টিপে টিপে ফিরে গিয়ে ছোটো বউকে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে বলি,—দেখো এ-আমি কিন্তু আমি নয়, তোমার স্বামী নয়, তাহলে কী হয়।···যা হোক, তা করি নি। চলে গেলুম শুতে, কিন্তু সেই রাত্রে এই গল্পটা আমার মাথায় এল, যেন একজন

কেউ দিশাহারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেও মনে করছে অন্য-সকলেও মনে করছে যে, সে সে নয়।"

এই গল্পটি সম্বন্ধে আরো উল্লিখিত হয়েছে যে এই গল্পটির সঙ্গে অনেকটা মেলে এমন একটি বাস্তব ঘটনার কথা কবি একসময়ে শুনেছিলেন।

প্রেতাত্মা সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার যে কি মর্মান্তিক হতে পারে এই গল্পটিতে কবি তারই ছবি এঁকেছেন। অথচ জীবনে আমরা প্রতিমুহূর্তেই বদলাচ্ছি। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় আমাদের বর্তমান জীবন আমাদের অতীত জীবনের যেন অনেকটা প্রেতমূর্তি।

'স্বর্ণমৃগ' একটি 'স্বর্ণমৃগ' অন্বেষণেরই করুণ কাহিনী। এমন 'স্বর্ণমৃগে'র অন্বেষণের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বিখ্যাত গল্প লিখেছেন।

গল্পের নায়ক বৈদ্যনাথ ধনী পূর্বপুরুষের সন্তান। কিন্তু তার ভাগ্যে সে-ধনলাভ ঘটে নি। তবু যা-কিছু তার ছিল তাই নিয়ে সন্তোষেই তার দিন কাটছিল। তার কাজ ছিল গাছের ডাল কেটে বসে বসে বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করা।

ক্রমে ক্রমে তার কয়েকটি সন্তান হ'ল। তাদের জন্য খেলনা তৈরি করে তার দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু নিজেদের দারিদ্র্য আর শরিকদের ধনাড়ম্বর দেখে তার স্ত্রী মোক্ষদার মনে এক তিলও আর শান্তি রইল না। এক সন্ন্যাসী এসে বললে সে সোনা তৈরি করতে জানে, সেই বিদ্যা সে বৈদ্যনাথকে শেখাবে এমন আশ্বাসও দিলে। গৃহিণী এতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করলে; বৈদ্যনাথের নিজেরও মনে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হ'ল। কিন্তু এর ফল এই হ'ল যে সন্ন্যাসী তাদের যথেষ্ট অর্থ নষ্ট করে একদিন পালিয়ে গেল।

কিন্তু তার স্ত্রীর দৈবধন লাভের নেশা তখনও গেল না। তার এক উকিল আত্মীয়ের মন্ত্রণায় কাশীতে তারা একটি পুরোনো বাড়ি কিনলে—তাতে দৈবধন লাভের সম্ভাবনা আছে এমন জনশ্রুতি ছিল। কিন্তু বৈদ্যনাথ সেখানে গিয়ে বহু পরিশ্রম ও খোঁজাখুঁজি করে সেই বাড়ির মেঝের নিচে একটি শূন্য কলসী পেলে। বার বার সে পরম আগ্রহে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে দেখলে। কিন্তু কলসী শূন্যই।

শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এলে স্ত্রী তার সঙ্গে বাক্যালাপ করলে না। রাত্রে তার স্ত্রী শয়নগৃহে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

পরদিন বৈদ্যনাথকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

যারা পরিশ্রমে অভ্যস্ত নয়, পরিশ্রম করতে ইচ্ছুকও নয়, দৈবধনের আশায় তারা কেমন আগ্রহান্বিত হয়, কয়েকটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ সেই ছবি এঁকেছেন। তাঁর জাতির অনেকেই কর্মকুণ্ঠ, হঠাৎ যদি বড় রকমের কিছু লাভ হয় এই আশায় তাদের প্রচুর সময় কাটে—তাদের তিনি এমনি ভাবে বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করেছেন।

'রীতিমত নভেল' গল্পটিতে কবি রোমান্স-ধর্মী অর্থাৎ অতি-কল্পনাশ্রয়ী লেখকদের নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটাবার অদ্ভুত ধরনধারন নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন।

এর পরের গল্প 'জয়পরাজয়' খুব বিখ্যাত।

রাজকবি শেখর রাজকন্যা অপরাজিতাকে কখনও চোখে দেখে নি। কিন্তু রাজকন্যাই ছিল শেখরের কবিত্বের উৎস-রূপিণী। যেদিন কবি কোনো নতুন কাব্য রচনা করে সভাতলে বসে রাজাকে শোনাত সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উঁচু করে পড়ত যাতে উপরিতলের বাতায়নবর্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীদের তা কর্ণগোচর হয়।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরীকে শেখর সমাদর করত ; অবশ্য সেটি প্রকারান্তরে ছিল রাজকন্যারই উদ্দেশে তার শ্রদ্ধা নিবেদন। তার নাম সে দিয়েছিল বসন্তমঞ্জরী। কবির এই বাড়াবাড়ি নিয়ে লোকেরা হাসত। রাজাও মাঝে মাঝে কৌতুক করতেন। কবিও এই হাস্যকৌতুকে যোগ দিত।

কিন্তু কবি যে গান রচনা করত তা কৌতুকের বিষয় ছিল না আদৌ। তা ছিল চিরন্তন প্রেমিক-প্রেমিকার অনাদি দুঃখ ও অনন্ত সুখের কাহিনী। সেইসব গান লোকের মুখে মুখে ফিরত। কবি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। আনন্দে তার দিন কাটছিল।

কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে এসে হাজির হ'ল কবি পুণ্ডরীক। সে বহু বিদ্যার অধিকারী, প্রথিতযশাঃ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ তার দেহ—সে এসে কাব্যযুদ্ধ প্রার্থনা করলে।

শেখরের সত্যকার কবিজনোচিত কুণ্ঠা ও বিনয় আর পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্যের দর্প ও ঔদ্ধত্য গল্পটিতে চমৎকার রূপ পেয়েছে। পুণ্ডরীক শব্দ ও ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগে রাজসভাকে চমকিত করে দিলে। শেখর যে

কবিতা পাঠ করলে তা মর্মস্পর্শী হ'ল। কিন্তু পুণ্ডরীকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও শব্দপ্রয়োগের নৈপুণ্য সর্বসাধারণের উপরে স্বভাবতই অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করল। শেখরের নামের শেষ দুই অক্ষর নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও পুণ্ডরীক পশ্চাৎপদ হ'ল না। কিন্তু রাজার ইচ্ছা সত্ত্বেও শেখর তার কোনো জবাব দিলে না। সর্বসাধারণের বিচারে শেখরের হার হ'ল আর পুণ্ডরীক রাজার কাছ থেকে জয়মাল্য পেলে।

পুণ্ডরীকের তীক্ষ্ণ শ্লেষের আঘাতে শেখর খুব আহত হয়েছিল। তার ধারণা হ'ল তার সারা জীবন বৃথা ব্যয়িত হয়েছে। তার সমস্ত রচনা সে একে একে আগুনে ফেললে, ও তারপর মধুর সঙ্গে একটা উদ্ভিদের বিষরস মিশিয়ে তা পান করলে।

কিন্তু কবির দৃষ্টি যখন মৃত্যুসমাচ্ছন্ন তখন রাজকুমারী অপরাজিতা এসে তাকে বললে: আমি রাজকন্যা অপরাজিতা; রাজা তোমার প্রতি সুবিচার করেন নি। তোমারই জয় হয়েছে কবি। আমি আজ তাই তোমাকে জয়মাল্য দিতে এসেছি।

রাজকন্যা স্বহস্তরচিত পুষ্পমাল্য নিজের গলা থেকে খুলে কবির গলায় পরিয়ে দিলে। কিন্তু মরণাহত কবি তখন শয্যার উপরে ঢলে পড়ল।

এটি প্রকৃতপক্ষে একটি গদ্য-কবিতা। গদ্যে এটি লেখা; গদ্যের শ্রেষ্ঠ উপকরণ, অর্থাৎ বাস্তবের তীক্ষ্ণ বর্ণনা, এতে সুপ্রচুর; কিন্তু এর অন্তরাত্মা বিশেষভাবে কাব্যধর্মী। তাতে গদ্যরচনা হিসাবে এর মূল্য হয়ত কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে; কিন্তু এর আনন্দদানের ক্ষমতা আদৌ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সাধারণত প্রতিভার যে ধরনের লাঞ্ছনা হয় তার একটি চিরন্তন রূপ এই 'জয়পরাজয়' গল্পটি। কবির যৌবনের এটি একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

'কাবুলিওয়ালা' রবীন্দ্রনাথের একটি স্বনামধন্য ছোটগল্প। এর চিত্ররূপ দূর কাবুলের অধিবাসীদের হৃদয়ও স্পর্শ করেছে।

এর আবেদনটি যেমন সহজ সরল তেমনি বিশ্বজনীন। "...বুঝিতে পারিলাম সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল—" নায়করূপী কবির এইসব কথা পাঠকদের হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

এতে মিনির চাপল্য চমৎকার ফুটেছে। আর পাহাড়ী রহমতের সরল বলিষ্ঠ স্নেহময় প্রকৃতি আর ছলনায় একান্ত অসহিষ্ণুতাও চমৎকার রূপ লাভ করেছে।

যেসব রচনা সহজভাবে সার্বজনীন অমরতার অধিকার তাদের যেন সহজাত। অবশ্য সেই সঙ্গে সেইসব রচনায় দেখা যায় গূঢ় জীবনধর্মিতাও। ধরনে-ধারনে অদ্ভুত রহমত আসলে একটি খাঁটি মানুষ। তার রূঢ় আবরণের ভিতরকার কোমল অন্তরাত্মা আমাদের অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

'ছুটি' গল্পটি সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে কবি লিখেছেন :

> বিকেলবেলায় আমি এখানকার (সাজাদপুর) গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলে মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেআদবি মনে করে…কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—
>
> ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল—গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তাহলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা, অমনি কর্মারম্ভ, "সাবাস জোয়ান—হেঁইয়ো। মারো ঠেলা হেঁইয়ো।" মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।…একটি ছোট মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্তভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দুই-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো, তফাতে গিয়ে তারা ম্লানমুখে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চলমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্য স্থান নির্দেশ করে দিলে, সে

তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে-চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল—তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হ'ল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগল—এমন-কি খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে।

সাজাদপুরের সেই সর্দার ছেলেটি 'ছুটি' গল্পে ডানপিটে ফটিকে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তার পরিণতি বড় শোকাবহ করে কবি এঁকেছেন।

'ছুটি' গল্পে দেখা যাচ্ছে ফটিকের দস্যিপনায় তার মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার মায়ের দাদা বহুদিন পরে তাকে দেখতে এসে ফটিকের বিষয় জেনে তাকে তার কাছে নিয়ে যাবার কথা বললে। ফটিক এতে খুব আগ্রহ দেখালে। তার মাও রাজী হ'ল।

কিন্তু মামাবাড়ি গিয়ে ফটিক মামীর স্নেহদৃষ্টি লাভ করতে পারল না। মামী তার নিজের ছেলেপিলে নিয়ে একরকম গুছিয়ে সংসার করছিল। তার মধ্যে এই তের বছরের অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে তার মনে হ'ল একটি উপদ্রব। এই বয়সের ছেলেদের জন্য একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে গভীর স্নেহের ও গভীর সহানুভূতির। সে সম্বন্ধে কবি তাঁর অতুলনীয় ভাষায় বলেছেন :

> তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে, লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

কিন্তু মামীর কাছ থেকে সেই প্রয়োজনীয় স্নেহ ও সহানুভূতি ফটিক পেলে না। তার মামারও এমন সময় ছিল না যে তার দিকে বেশি দৃষ্টি দেবে।

এমন পরিবেশে ফটিকের প্রাণ দিন দিন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ছেলে হিসাবে সে খুব খারাপ ছিল না। কিন্তু পড়াশুনায় কোনো উন্নতিই সে দেখাতে পারল না। এর মধ্যে একদিন বই হারিয়ে ফেলে সে মাস্টারদের আরো মারধোরের পাত্র হ'ল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য সে খুব অস্থির হ'ল। তার মামা বললে, পুজোর ছুটি হলে বাড়ি যাস। কিন্তু তার যে ঢের বাকি।

এমন সময় ফটিকের অসুখ করল। তাতে তার মামীর আরো বিষদৃষ্টিতে পড়তে হবে ভেবে সে মামাবাড়ি থেকে পালিয়ে গেল—উদ্দেশ্য তার মায়ের কাছে যাবে।

পুলিশের সাহায্যে তার মামা তাকে ফিরিয়ে আনলে। কিন্তু বৃষ্টিকাদায় ভিজে তখন তার জ্বর অনেক বেড়ে গেছে।

তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত হ'ল। তার অবস্থা ভালো নয় দেখে তার মামা তার মায়ের কাছে খবর পাঠাল।

তার মা এসে তার বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকলে—ফটিক, সোনা মানিক আমার।

ফটিকের তখন ঘোর বিকারের অবস্থা। আস্তে আস্তে পাশ ফিরে কাউকে লক্ষ্য না করে মৃদুস্বরে সে বললে,—মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।

গল্পটির করুণতা সকল পাঠকের হৃদয়ই গভীরভাবে স্পর্শ করে।

কিন্তু শুধু করুণরসই এই গল্পটির একমাত্র সম্বল নয়। এতে বিকাশোন্মুখ ছেলেদের সম্বন্ধে কবি যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন সেটি এর এক অমূল্য বৈভব। অযত্ন ও অনাদরের পরিবেশে প্রাণোচ্ছল ফটিকের যে পরিণতি ঘটল সেই ছবির নিদারুণতা, বিকাশোন্মুখ আর সেজন্য কিছু বেয়াড়া ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের অন্তরের স্নেহপ্রেম স্বতই বাড়িয়ে দেয়।

'সুভা' গল্পের সুভা একটি বোবা মেয়ে। বাপ মা তাকে আদর করে নাম দিয়েছিল সুভাষিণী।

নিঃশব্দ বিশাল প্রকৃতি আর নিঃশব্দ ক্ষুদ্র সুভা এই দুয়ের ভিতরকার

গভীর মিল সম্বন্ধে অনেক কথা কবি বলেছেন। কবির সেইসব গভীর মন্তব্য গল্পটির সাহিত্যিক মূল্য বাড়িয়েছে।

বাড়ির ছাগল ও বিড়ালছানা সুভার খুব আদর পেত। আর তার আদর পেত গোয়ালের দুটি গাভী। বলতে গেলে এরাই ছিল তার সঙ্গী। ছেলেমেয়েরা সাধারণত তাকে এড়িয়ে চলত। কেবল গোঁসাইদের অকর্মণ্য ছেলে প্রতাপ যখন বিকেলে নদীতে ছিপ ফেলে বসত তখন সে তার অনতিদূরে গিয়ে বসে থাকত। প্রতাপের একটি করে পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তা নিজে সেজে আনত।

কিন্তু কালধর্মে তার বয়স বেড়ে চলল দেখে বাপ মা চিন্তিত হ'ল। তাদের অবস্থা কিছু সচ্ছল ছিল, তাতে তাদের বোবা মেয়ের বয়স পাড়াপ্রতিবেশীদের বিশেষ আলাপ-আলোচনার বিষয় হ'ল। বাপ মা অগত্যা যোগাড়যন্ত্র করে সুভার বিয়ে দিলে। আর বিয়ের পরে স্বভাবতই সে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হ'ল।

এতে কোনো চরিত্রই বেশি ভালো বা বেশি মন্দ করে আঁকা হয় নি। সবাই আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত পাড়াপ্রতিবেশীদের দল। কিন্তু মানুষের এই সাধারণ রূপও কবি এঁকেছেন গভীর দরদ ও নিপুণতা দিয়ে। তাই কোনোরূপে অসাধারণ না হয়েও এসব সৃষ্টি চিত্তগ্রাহী। তুচ্ছও কম সুন্দর নয় যদি তাকে দেখবার মন আমাদের থাকে।

'মহামায়া' গল্পটিতে সেকালের কৌলীন্য, সহমরণ, এসবের অদ্ভুত বর্ণনা আছে। নায়িকা মহামায়া আর তার ভাই ভবানীচরণ দুইজনের সংকল্পের দৃঢ়তাও অদ্ভুত ধরনের—একালে আমাদের কিছু চমকিত করে মাত্র।

'দানপ্রতিদান' গল্পটিতে সেকালের একান্নবর্তী পরিবারের ভালো মন্দ দুই দিকই নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। জাদের অবনিবনাও আর ভাইদের গভীর সদ্ভাব দুই-ই বেশ চোখে পড়ে। জ্যেষ্ঠ শশিভূষণের কনিষ্ঠ-প্রীতি ও একান্ত-ভগবৎ-নির্ভরতা একালে অনেকটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু সেকালে এমন চরিত্র দুর্লভ ছিল না।

'সম্পাদক' গল্পে সম্পাদকীয় মসীযুদ্ধের বা কবির লড়াইয়ের একটি উপভোগ্য বর্ণনা আছে। সেই উৎকট বা হাস্যকর লড়াইয়ে করুণতার সঞ্চার করেছে সম্পাদকের মাতৃহীনা অবহেলিত কন্যার রোগকাতর মুখ।

এর পরের গল্প 'মধ্যবর্তিনী' বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর তিনটি চরিত্রই—নিবারণের স্ত্রী হরসুন্দরী, নিবারণ আর নিবারণের নববধূ শৈলবালা—আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

হরসুন্দরী ও নিবারণের বৈচিত্র্যহীন দাম্পত্যজীবনে সুখ ও সন্তোষের অভাব ছিল না।

একবার হরসুন্দরীর কঠিন অসুখ করল। দীর্ঘদিন ভুগে নিবারণের প্রাণপণ যত্নের ফলে সে সেরে উঠল। কিন্তু সেরে উঠে তার মনে হল একটা বড় রকমের ত্যাগের দ্বারা সে তার স্বামীর এই ভালোবাসার ও আদরযত্নের প্রতিদান দেবে। সে ছিল নিঃসন্তান। স্বামীর আর একটি বিয়ে দেবার জন্য সে জেদ ধরল। নিবারণের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি নোলক-পরা নতুন বউ শেষ পর্যন্ত তার ঘরে এল—তার নাম শৈলবালা। নিবারণ প্রথম প্রথম শৈলবালার পাশ কাটিয়েই চলত।

কিন্তু কালক্রমে শৈলবালার প্রতি সে গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'ল। ভালোবাসা তার জীবনে যে এমন তরঙ্গ তুলতে পারে তা সে জানত না। তার এই নতুন প্রণয়পীড়া কবি খুব উপভোগ্য করে এঁকেছেন। শৈলবালাকে নিয়ে সে এমন বিভোর হ'ল যে আপিসের কাজে তার গাফিলতি হতে লাগল। ক্রমে শৈলবালার সন্তোষের জন্য আপিসের বেশকিছু টাকাও সে ভাঙল। এত সমাদরে শৈলবালা অত্যন্ত অবুঝ প্রকৃতির হয়ে পড়েছিল।

পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে এই দায় থেকে নিবারণ কোনোরকমে উদ্ধার পেল। শৈলবালা অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সন্তান-জন্মের পূর্বেই সে মারা গেল।

তখন নিবারণ যেন এক দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল।

দীর্ঘদিন পরে হরসুন্দরীর দিকে আবার তার মন দেবার দিন এল। কিন্তু তাদের মাঝখানে শৈলবালা যে ব্যবধান রচনা করেছিল তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'ল।

জ্ঞানগর্ভ উক্তির প্রাচুর্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলো অলংকৃত। 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের এই দুইটি উক্তি সুপ্রসিদ্ধ :

(ক) হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার

সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চিরদারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায় মানুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

(খ) নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

'অসম্ভব কথা'—কলাকৌশলময় গল্প-উপন্যাস আর সহজ সরল নানা-অসম্ভব-কথায়-ভরা দিদিমাদের মুখে শোনা রূপকথা, এই দুইয়ের পার্থক্যের কথা কবি এতে বলেছেন—বলেছেন নানা তির্যক্ উক্তির সাহায্যে। সেইসব তির্যক উক্তিই এই লেখাটির প্রধান উপভোগ্য বস্তু।

'শাস্তি' গল্পটিতে কবি গ্রামের অতিসাধারণ লোকদের কথা বলেছেন। এমন সমস্ত লোকের ঘরসংসারের কথাও কবির কিভাবে জানবার সুযোগ ঘটেছিল তা আমরা জেনেছি।

এতে চন্দ্রার চরিত্রটি খুব বিশিষ্ট হয়েছে। সে গোবেচারা পল্লীবধূ নয় আদৌ। সে তার স্বামীকে খুব ভালোবাসত। কিন্তু স্বামী যে তাকে অবহেলা করবে, এটি সে সইতে পারত না। উলটে এমন ব্যবহার করত যাতে তার স্বামী বুঝতে পারে চন্দ্রা সহজে পোষমানার পাত্র নয়।

তার স্বামীর নাম ছিদাম। ছিদামের বড় ভাই দুখিরাম। তারা জন খেটে জীবিকানির্বাহ করত। দুখিরাম একদিন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে তার স্ত্রীর কাছে ভাত চাইলে। সেদিন চালের যোগাড় ছিল না, সুতরাং স্ত্রীর ভাত রাঁধা হয় নি। দুজনেই দুজনকে খুব কড়া কথা শোনালে। স্ত্রীর কোনো একটি কথায় দুখিরাম ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে হাতের কাছের দা স্ত্রীর মাথায় বসিয়ে দিলে। স্ত্রী মরে গেল।

এমন কাণ্ড করে দুখিরাম তো অভিভূত হয়েছিলই, ছিদামও তার ভাইয়ের কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়েছিল। যখন চন্দ্রা 'কি হলো গো' বলে চিৎকার করে উঠল তখন ছিদাম তার মুখ চেপে ধরল।

এর পর পাড়ার রামলোচন চক্রবর্তী খাজনা আদায় করতে এসে ব্যাপারটা

দেখে হতভম্ব হ'ল। তখন ছিদাম তার ভাইকে বাঁচাবার জন্য হঠাৎ বলে বসল, ঝগড়া করে তার বউ বড় বউয়ের মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দিয়েছে। চক্রবর্তী এ-কথা বিশ্বাস করল এবং যারা এসেছিল তারাও এ-কথাই শুনে গেল।

ছিদাম তার স্ত্রীকে বলল—যা বলছি তাই কর, তোর কোনো ভয় নেই, আমরা তোকে বাঁচিয়ে দেব। স্বামীর কথা শুনে চন্দ্রা স্তম্ভিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে তার মনে হ'ল এমন স্বামী-রাক্ষসের হাত থেকে তার মুক্তি পাওয়া চাই। স্বামীর প্রতি সে অত্যন্ত বিমুখ হ'ল। এবং আগাগোড়া সে স্বীকার করে চলল যে সেই তার জাকে খুন করেছে।

জজসাহেব তাকে বললেন, তুমি যে অপরাধ স্বীকার করছ তার শাস্তি কি জান? চন্দ্রা বললে, না। জজসাহেব বললেন, তার শাস্তি ফাঁসি। চন্দ্রা বললে, ওগো তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও না সাহেব। তোমাদের যা খুশী কর, আমার তো আর সহ্য হয় না।

ফাঁসির পূর্বে সিভিল সার্জন তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কাউকে দেখতে চাও? চন্দ্রা বললে, একবার আমার মাকে দেখতে চাই। ডাক্তার বললে, তোমার স্বামী তোমাকে দেখতে চায়, তাকে কি ডেকে আনব। চন্দ্রা শুধু বললে—মরণ।

তার এই উত্তরটি অপূর্ব। এই ছোট্ট একটি শব্দে তার চোখে একান্ত মমতাহীন ও অবিবেচক স্বামীর প্রতি তার কী দুর্জয় অভিমান ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা একটি অসাধারণ প্রাণপূর্ণ নারীচরিত্র। সে একটি অজ্ঞ মূর্খ পাড়াগেঁয়ে তরুণী মাত্র, কিন্তু তার প্রাণপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমাদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করে।

'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' কবির একটি ব্যঙ্গ-রচনা। একটি কাঠঠোকরা ও একটি কাদাখোঁচা পাখির প্রসঙ্গের অবতারণা করে কবি বলেছেন, বিপুল পৃথিবীর শোভা, সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, এসব আমাদের তেমন ভাবনার বিষয় নয় যেমন ভাবনার বিষয় আমাদের আপন আপন সংকীর্ণ প্রয়োজন। আমাদের সেই সংকীর্ণ প্রয়োজন যদি না মেটে তবে জগতের ভালো বা মহৎ কিছুই আমাদের কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পারে না।

কবির 'সমাপ্তি' গল্পটি খুব উপভোগ্য। এটি সম্পর্কে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে কবি লিখেছেন :

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।...বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়েস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।...বাস্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নিবুর্দ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ-রকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'ম্যায়া', অন্য 'ছাওয়াল নাই'—কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—'কারে কী কয় কারে কী হয় আপন পর জ্ঞান নেই'......আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হ'ল তখন দেখলুম আমার সেই চুলছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না—অবশেষে বহুকষ্টে তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তুললে।

বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে—নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হ'তে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো মনে হ'ল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ। ...এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল।

গল্পটির নায়িকা মৃন্ময়ীতে ছেলেদের অসংকোচ এমন-কি বন্যপনা বেশ আছে, তার সঙ্গে বালিকার মাধুর্যও যে নেই তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য-গ্রাজুয়েট অপূর্বকৃষ্ণের কাদায় আছাড় খাওয়া আর সেইজন্য মৃন্ময়ীর লুটোপুটি-খাওয়া খিলখিল হাসি অপূর্বকৃষ্ণ কতটা উপভোগ করেছিল বলা কঠিন, কিন্তু পাঠকরা পুরোপুরি তা উপভোগ করে।

সব পাত্রীকে ছেড়ে মৃন্ময়ীকে বিয়ে করার জন্যই অপূর্বকৃষ্ণ জেদ ধরল। অগত্যা তার মাকে এই দস্যি মেয়েকেই ঘরে আনতে হ'ল। বিয়ের পর মৃন্ময়ী আদৌ পোষ মানতে চাইল না, উলটে অপূর্বকৃষ্ণকে জবাবদিহি করলে—কেন সে তাকে বিয়ে করেছে। অপূর্বকৃষ্ণ খুব সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলে, এমন-কি মৃন্ময়ীর মন জোগাতেও কসুর করল না। এতে তার প্রতি মৃন্ময়ীর বিরূপতা কিছু দূর হল। কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণ তার কাছে যে প্রতিদানের প্রত্যাশা করছিল সেটি এই বন্য মেয়ের পক্ষে সম্ভবপর হ'ল না। সে বরং প্রেমের প্রার্থিত প্রতিদান দিতে গিয়ে হেসে সারা হ'ল।

অপূর্বকৃষ্ণ এতে অপমানিত বোধ করল এবং বাড়ি আসা বন্ধ করল।

মৃন্ময়ীর দেহে মনে যৌবনের সঞ্চার হচ্ছিল। তার ফলে স্বামীর প্রতি তার মন অল্পদিনেই অনুকূল হয়ে উঠল। তার এই পরিবর্তন সম্বন্ধে কবির অপূর্ব বর্ণনা এই :

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

গল্পটি নিঃসন্দেহে খুব উপভোগ্য। এতে অ-সাধারণ কিছু নেই। মৃন্ময়ীকে সূচনায় আমরা কিঞ্চিৎ অ-সাধারণ দেখি, কিন্তু তারও পরিণতি সাধারণই। তবু গল্পটি সত্যই আমাদের গভীর আনন্দ দেয়।

কোনো কোনো সমালোচক বলতে পারেন, গল্পটিকে উপভোগ্য করবার দিকে কবি কিছু বেশি নজর দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান, বাস্তবের কঠোরতার দিকটা কবি এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছেন। তা হয়ত কিছু পরিমাণে করেছেন; কিন্তু যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা সত্যই আমাদের গভীরভাবে আনন্দিত করে। আনন্দও একটা বড় সত্য।

বন্য মৃন্ময়ী যে নবঅনুরাগিণী মৃন্ময়ীতে পরিণত হ'ল এটি কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা বুঝি, এটি স্বাভাবিক। সত্যের এই চমক গল্পটির এমন আনন্দ দানের বড় কারণ মনে হয়।

'সমস্যাপূরণ' গল্পটিতে কবি পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন দুইটি চরিত্র—পিতা কৃষ্ণগোপাল সরকার আর তাঁর পুত্র বিপিনবিহারী সরকার। কৃষ্ণগোপাল সেকালের জমিদার। তাঁর বদান্যতা দেশ-প্রসিদ্ধ, বৃদ্ধবয়সে ধর্মনিষ্ঠতাও তাঁতে খুব দেখা দেয়। শেষবয়সে সংসার ত্যাগ করে তিনি কাশীবাসী হন, জমিদারির ভার দিয়ে যান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিপিনবিহারীর উপরে। কিন্তু কৃষ্ণগোপাল যৌবনে যে খুব সংযত চরিত্রের ছিলেন তা নয়। এর ফলে তাঁর মুসলমানী প্রজা মিরজাবিবির গর্ভে তাঁর এক পুত্রের জন্ম হয়। সে বর্তমানে অছিমদ্দি বিশ্বাস নামে পরিচিত। সে তাঁর জমিদারিতে প্রচুর জমি নিষ্কররূপে ও অল্পকরে ভোগ করে।

বিপিনবিহারী একালের সুশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েট। তিনি খুব নীতিনিষ্ঠ—দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কারো সঙ্গে বড় একটা মেশেন না, অতিশয়

সচ্চরিত্র—তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাসও খেলেন না। কিন্তু নীতিপরায়ণ বিপিনবিহারী হিসাবের বেলায় খুব কড়া। তাঁর পিতার আমলে বহু ব্যক্তি নিষ্করাদি ভোগ করত, বিপিনবিহারী সেই সব নিষ্কর ভোগের বৈধ কারণ না দেখে চেষ্টাচরিত্র করে তার অনেকই বাতিল করে দিলেন। খাজনা আদায়ের ব্যাপারেও তিনি কড়া নিয়মের প্রবর্তন করলেন। বলা বাহুল্য এরূপ সংকীর্ণ নীতিনিষ্ঠা যে প্রকারান্তরে স্বার্থসাধন মাত্র, এইটিই কবি দেখিয়েছেন।

বিপিনবিহারীর চেষ্টায় অছিমদ্দির অনেক জমিজমা তার অধিকারচ্যুত হ'ল। সে ছিল উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। একদিন হাটের মধ্যে জমিদার বিপিনবিহারীকে কাটারি হাতে সে আক্রমণ করল। লোকেরা অবশ্য তাকে ধরে ফেলল এবং সে ফৌজদারিতে সোপর্দ হ'ল।

তার বিচারের দিন কৃষ্ণগোপাল কাশী থেকে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সংসার-ত্যাগীর বেশ—খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরি-নামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। তিনি বিপিনবিহারীকে ডেকে আনিয়ে বললেন—"অছিম যাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করতে হবে, আর তার সম্পত্তি যা কেড়ে নিয়েছ তা তাকে ফিরিয়ে দাও।" বিপিনবিহারী অছিমের প্রতি এত অনুগ্রহের কারণ জানতে চাইলে কৃষ্ণগোপাল বললেন—"সে কথা শুনে তোমার লাভ কী হবে বাপু।" কিন্তু বিপিন জানবার জন্য জেদ করলেন, বললেন, অযোগ্যতা বিচার করে কত লোকের কত দান ফিরিয়ে নিয়েছি, তাদের মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নি, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এত চেষ্টা! আজ এত কাণ্ড করে অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে ও সব ফিরিয়ে দিতে হয় তবে লোকের কাছে কী বলব।

কৃষ্ণগোপাল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে বললেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলে বলা আবশ্যক মনে কর তবে বোলো অছিমদ্দি তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিনবিহারী এতে স্তম্ভিত হলেন। তিনি তাঁর নিজের নীতিনিষ্ঠতা ও তাঁর পিতার যুগের শিথিল ধর্মনিষ্ঠা এই দুয়ের তুলনা করে তাঁর নিজের

আদর্শের মহিমা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলেন। কিন্তু আসলে কবি তাঁকে বিদ্রূপের পাত্র করলেন, কেননা, তাঁর পিতার ধর্মবোধ অনেক গভীর—তাঁর একসময়ের অসংযমের জন্য যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি বৃদ্ধ-বয়সেও পশ্চাৎপদ হলেন না।

মোকদ্দমা যে ভাবে মিটে গেল তাতে সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করে নিল। তাদের মধ্যে ছিল রামতারণ। সে একসময় কৃষ্ণগোপালের খরচে লেখাপড়া শিখেছিল। মানুষ সম্বন্ধে এতদিনে তার এই সমস্যা পূরণ হ'ল যে ভালো করে খোঁজখবর নিলে সব সাধুই ধরা পড়ে। এই আবিষ্কারের ফলে রামতারণের কৃতজ্ঞতার বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে গেল।—রামতারণকে অতি ক্ষুদ্রাত্মা করে কবি এঁকেছেন।

'খাতা' গল্পটি বালিকা উমার বেদনাময় সাহিত্যপ্রচেষ্টার কাহিনী—কবি বলেছেন হাসিমুখে, কিন্তু গভীর বেদনা নিয়ে।

লিখতে শিখেই উমা ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করে। কয়লা দিয়ে হোক পেন্সিল দিয়ে হোক হাতের কাছে যা পায় তারই উপরে সে যা খুশী লিখতে থাকে। কিন্তু তার দাদা গোবিন্দলালের লেখার উপরে এমন যা খুশী লিখে সে খুব শাস্তি পেল। পরে গোবিন্দলাল তার পেন্সিলাদি ফেরত দিল আর তার সঙ্গে দিল একখানি লাইনটানা ভালো বাঁধানো খাতা। এই খাতায় উমা মনের আনন্দে যা খুশী লিখে চলল।

নয় বৎসর বয়সে উমার বিয়ে হ'ল তার দাদার বন্ধু প্যারীমোহনের সঙ্গে। প্যারীমোহনের ধারণা ছিল মেয়েরা লেখাপড়ার চর্চা করলে তাদের ভিতরকার নারীশক্তি বিঘ্নিত হয়।

শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উমা কিছুদিন তার খাতাখানি খোলে নি। পরে খুলে খুব গোপনে যা মনে আসত তাই লিখত। তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না বলে সে তার খাতায় লিখেছিল—দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন তার শ্বশুরবাড়িতে এক গায়িকা ভিখারিনী এসে আগমনীর গান গাইলে—

পুরোবাসী বলে উমার মা,
তোর হারাতারা এল ওই

শুনে পাগলিনী প্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই। ইত্যাদি

গানটি উমার মনে খুব ধরল। সে গানটি লিখে নিলে। সে গান গাইতে পারত না, কিন্তু গান লিখে নিয়ে তার মনের সেই খেদ মিটাত।

সে গোপনে কি লিখলে এই নিয়ে তার সমবয়সী ননদীরা চেঁচামেচি করলে, তার লেখা কেড়ে নিতে চাইলে, কিন্তু পারল না। তারা গিয়ে তাদের দাদা প্যারীমোহনকে সংবাদ দিলে। প্যারীমোহন এসে উমার খাতা কেড়ে নিয়ে তার লেখাগুলো চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। শুনে উমা লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল। তার ননদিনীরা খিলখিল করে হাসতে লাগল।

কবি উমার প্রতি সমবেদনা আর তার অত্যাচারীদের প্রতি অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছেন এইভাবে :

> উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল, কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেউ ছিল না।

ছোট ছেলেমেয়েদের এমন অদ্ভুত আত্মপ্রকাশের চেষ্টার উপরে কবির প্রসন্ন নয়নপাত তাঁর আরো কয়েকটি লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। বিকাশোন্মুখ ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর দরদের অন্ত ছিল না।

'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সুপ্রসিদ্ধ। এর প্রধান—প্রায় একমাত্র—চরিত্র পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী।

জয়কালী দীর্ঘাকার দৃঢ়শরীর তীক্ষ্ণনাসা। তাঁর বুদ্ধি যেমন প্রখর তেমনি প্রখর তাঁর ন্যায়-অন্যায়-বোধ—যা অসংগত ও অশোভন তার প্রতি তাঁর ধিক্কার অতি প্রবল, তেমনি প্রবল তাঁর কর্মশক্তিও। ঢিলেঢালা ভাব তাঁর চতুষ্পার্শ্বে কোথাও নেই। এর ফলে গ্রামের সবাই জয়কালীকে অত্যন্ত ভয় করত।

এই বিধবার প্রাণের সামগ্রী ছিল তাঁর ঠাকুরবাড়িটি। তার প্রাঙ্গণ সবসময়ে পরিষ্কার তকতকে থাকত; জয়কালীর শাসনে দেবতার পূজায় কখনো কোনো ত্রুটি হতে পারত না। জয়কালী ছিলেন নিঃসন্তান, মন্দিরের বিগ্রহ ছিল তাঁর সমস্ত হৃদয় ও মনের আদর, যত্ন, একান্ত আত্মনিবেদন, সবকিছুর অধিকারী।

এই বিধবার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র একদিন গোপনে তাঁর ঠাকুরবাড়ির মাধবীমঞ্চ থেকে ফুল তুলতে গিয়ে জয়কালীর কাছে কঠোর শাস্তি পায়—মারধোর তো খায়ই তার উপর জয়কালী তার খাবার বন্ধ করে দেন। কিন্তু সেই দিনই একটি অত্যন্ত নোংরা শূকর ডোমদের ভয়ে জয়কালীর মাধবীকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করে। এতে জয়কালীর মনের ভাব কেমন হ'ল তা না বললেও চলে; কিন্তু সেই শূকরটিকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন না। ডোমরা তার খোঁজে এসে উপস্থিত হলে তাদের তিনি কঠোরস্বরে আদেশ করে ফিরিয়ে দিলেন।

অতিশয়-কঠোর-স্বভাবা জয়কালীর অন্তরাত্মা যে স্নেহ ও করুণায় পূর্ণ ছিল এই একটি ঘটনায় তা চমৎকারভাবে প্রকাশ পেল, যদিও তাঁর এই আচরণের অর্থ পল্লীর ক্ষুদ্রচেতারা বুঝতে পারল না।

এই গল্পে জয়কালীর কঠোর আচারবিচারকে কবি উপহাস করেছেন এই কথা কেউ কেউ বলেছেন। তেমন উপহাস এতে কিঞ্চিৎ যে নেই তা নয়; তবে এতে বেশি করে কবি দেখিয়েছেন কঠোরস্বভাবা কঠোর আচার-পরায়ণা জয়কালীর সুগুপ্ত কোমল অন্তরটি।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি দীর্ঘ। এই গল্পটিতে বাস্তব সংসারের অনেক কঠিন কঠোর ব্যাপার রূপ পেয়েছে আর সেই সঙ্গে রূপ পেয়েছে একটি সহজ সরল আত্মভোলা প্রেমের কাহিনী। প্রেমের কাহিনী বললে হয়ত বেশি বলা হয়; অনুরাগের কাহিনী বলাই ভালো। তবে শেষের দিকে নায়ক শশিভূষণ ও নায়িকা গিরিবালা উপলব্ধি করলে তাদের পরস্পরের প্রতি জীবনব্যাপী আত্মভোলা অনুরাগ সত্যই তাদের বিড়ম্বিত জীবনের পরম সম্পদ।

'মেঘ ও রৌদ্র' একটি গভীর প্রেমচিত্র হলেও ভাবালু হয়েছে কিছু বেশি; তাই সেই প্রেমের আসল কথাটি প্রকাশ পেয়েছে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুকের গানের এই ধুয়ায়:

> এসো এসো ফিরে এসো—নাথ হে, ফিরে এসো!
> আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে, ফিরে এসো!

কিন্তু এই কিছু ভাবালু প্রেমের চিত্রের পাশেই ফুটেছে গ্রামের লোকদের জীবনের নির্মম বাস্তবচিত্র—ইংরেজ রাজপুরুষদের ঔদ্ধত্য, সেই ঔদ্ধত্যের সামনে গ্রামের ইতর ভদ্র সব শ্রেণীর লোকদের একান্ত অসহায়তা, আর গ্রামের কিছু ভদ্র ও সম্পন্ন লোকদের ঘৃণিত কাপুরুষতা—সবই কবি

এঁকেছেন নিপুণ হস্তে। গ্রাম্য জীবনের এই নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র কবির 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির একটি স্মরণীয় সম্পদ যদিও শশিভূষণ ও গিরিবালার আত্মভোলা প্রেমের চিত্রটি আঁকতেও কবি কম যত্ন নেন নি।

গল্পের নায়ক শশিভূষণের চরিত্র আমাদের মনে দাগ কাটে। প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের বোধ বলতে যা বোঝায় সেটি যেন তাতে আদৌ নেই, সেক্ষেত্রে সে প্রায় শিশুর মতো সরল ও অবোধ কিন্তু তার অন্তরে মনুষ্যত্বের তেজ অসাধারণ; সেই তেজের প্রভাবে সে আশ্চর্যভাবে অভীত—প্রবলের বিরুদ্ধতায় যে বিপদ আছে সে সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীন। ফলে যথেষ্ট লাঞ্ছনা-ভোগ তার হ'ল। এমন চরিত্রের লোকের দেখা আমাদের চারপাশে আমরা যে বেশি পাই না তা ঠিক, তবে কখনো কখনো পাই। আমাদের মেঘে-ঢাকা জীবনে সে যেন অপ্রত্যাশিত রৌদ্রের ঝিলিক।

'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে কবি আমাদের এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত লোকের অহমিকা, লোভ, দুরাশা, এসবের একই সঙ্গে হাস্যকর ও বেদনাকর চিত্র এঁকেছেন। গল্পের নায়ক মর্কটশিরোমণি অনাবথন্ধু তার কীর্তিকলাপ যতটা সম্ভব বিস্তার করলে। কিন্তু সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা করলে তার স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীর। সে ছিল পতি-অন্ত-প্রাণ। তার স্বামী যে ভবিষ্যতে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হবেন তাতে তার সন্দেহমাত্র ছিল না। কিন্তু সেই বিন্ধ্যবাসিনী শেষে দেখলে তার স্বামীদেবতা বহু অনর্থসাধনের সঙ্গে বিলেত থেকে একটি মেমও বিয়ে করে এনেছেন।

হিন্দুসমাজের গোঁড়াদের দ্বারা জাতে তোলার প্রহসনটিও কবি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন।

'বিচারক' গল্পটিতেও কবি এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের কদাচারের উপরে কশাঘাত করেছেন। পতিতা ক্ষীরোদার শেষ প্রণয়ী তার সমস্ত অর্থ ও অলংকার নিয়ে পলায়ন করে। মনের ধিক্কারে ক্ষীরোদা তার তিন বৎসরের শিশুপুত্রকে নিয়ে কাছের এক কুয়োয় পড়ে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করে। লোকেরা তাদের তুলে ফেললে দেখা গেল শিশুটি মারা গেছে। এই অপরাধে জজ মোহিতমোহন দত্ত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তার চাইতে লঘুতর দণ্ড দেওয়া তিনি সংগত মনে করেন নি।

বালিকা বয়সে এই ক্ষীরোদার নাম ছিল হেমশশী। অল্পবয়সেই সে বিধবা

হয়। তাদের বাসার পাশে বাস করতেন এই মোহিতমোহন। তখন তিনি কলেজে পড়তেন এবং চরিত্রে যথেষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। হেমশশীর বয়স যখন চোদ্দ-পনের তখন সে মোহিতমোহনের চোখে পড়ে এবং অল্পদিনেই মোহিতমোহন বিনোদচন্দ্র এই ছদ্মনাম নিয়ে বহু পত্র লিখে তার মন ভোলান ও তার বাপ-মায়ের আশ্রয় থেকে তাকে বাইরে নিয়ে এসে তার জীবনের যা পরিণতি ঘটাবার তা ঘটান।

মোহিতমোহন পরবর্তীকালে জজ হন এবং যথেষ্ট শুদ্ধাচারীও হন। কিন্তু হেমশশীর কথা তিনি আর ভাবেন নি।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্ষীরোদার মনে কোনো অনুশোচনা জেগেছে কিনা তা জানতে কৌতূহলী হয়ে জজ মোহিতমোহন জেলের ভিতরে গিয়ে দেখলেন ক্ষীরোদা এক পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। দেখে স্ত্রীলোকের কলহপ্রিয় স্বভাবের কথা ভেবে মোহিতমোহন মনে মনে হাসলেন। তাকে দেখে ক্ষীরোদা হাত জোড় করে বললে, ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার, ওকে বল আমার আংটিটি ফিরিয়ে দিক।

আংটিটি ছিল ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে লুকোনো। প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কেড়ে নেয়। মোহিতমোহন বললেন, কই আংটিটি দেখি।

কিন্তু আংটিটি হাতে নিয়ে তিনি চমকে উঠলেন—যেন হঠাৎ জলন্ত অঙ্গার হাতে নিয়েছেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো ছিল আর অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা ছিল—বিনোদচন্দ্র।

কবি গল্পটির উপসংহার করেছেন এইভাবে :

> মোহিত আর-একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গল্পটি যথেষ্ট বাস্তবধর্মী এবং করুণ। কিন্তু নীতি-ধর্মের প্রচার এতে কিছু সোচ্চার হয়েছে। সেজন্য এর সাহিত্যিক মূল্যের কিছু হানি হয়েছে মনে হয়। তবে মাঝে মাঝে এমন প্রচারধর্মী না হয়ে সাহিত্যিকরা হয়ত পারেন না।

কবির 'নিশীথে' গল্পটি বিশেষভাবে মনস্তত্ত্বমূলক। গল্পের নায়ক জমিদার দক্ষিণাচরণ তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। তবে সত্যকার ভাবে যতটা ভালবাসতেন, ভাবতেন, তার চাইতে বেশি তাঁকে তিনি ভালবাসেন। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্র তিনি ভালো করে পড়েছিলেন, তা থেকে তাঁর মনে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুগৃহিণী—স্নেহপরায়ণা এবং অতিশয় সেবাপরায়ণা। ভাবের আবেগে দক্ষিণাচরণ স্ত্রীকে প্রণয়-সম্ভাষণে যখন বাড়াবাড়ি করতেন তখন তাঁর স্ত্রী এমনভাবে হেসে উঠতেন যে তাঁর সেই হাসির মুখে "বড় বড় কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত"।

একবার দক্ষিণাবাবুর কঠিন অসুখ হয়। স্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি বেঁচে ওঠেন। কিন্তু এর পর তাঁর স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পরে বোঝা যায় তাঁর সে-অসুখ সারবার নয়। স্ত্রীর এই অসুখের সময় দক্ষিণাচরণ যথেষ্ট সেবাযত্ন করেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে বরাবরই বাধা দিতেন এই বলে যে পুরুষমানুষের এত সেবা করা বাড়াবাড়ি। তাঁর স্ত্রী একদিন প্রস্তাব করেন, তাঁর ব্যাধি যখন সারবার নয় তখন তাঁর স্বামী কতদিন আর তাঁর মতো জীবন্মৃতকে নিয়ে কাটাবেন, তাঁর একটা বিয়ে করা চাই। এতে দক্ষিণাবাবু বলেছিলেন, "এ জীবনে আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না।" শুনে তাঁর স্ত্রী হেসেছিলেন। তাঁর হাসির অর্থ অবশ্য এ নয় যে স্বামীর ভালবাসাকে তিনি অবিশ্বাস করতেন। তাঁর বলবার মতলব ছিল, এ তাঁর স্বামীর পক্ষে সম্ভবপর নয়, এইজন্য তিনি প্রত্যাশাও করেন না।

এর পর দক্ষিণাচরণ স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া পরিবর্তন করতে এলাহাবাদে যান। সেখানে যে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার ভার নেন তিনি ছিলেন দক্ষিণাচরণের স্বজাতি। তাঁর অনূঢ়া কন্যা মনোরমার সঙ্গে দক্ষিণাচরণের পরিচয় হ'ল এবং পরিচয় ক্রমে অনুরাগে পরিণত হ'ল। কিন্তু দক্ষিণাচরণ নিজের মনে সে কথা আমল দিতেন না। ক্রমে স্ত্রীর সেবায় তাঁতে শিথিলতা দেখা দিতে লাগল; কিন্তু দক্ষিণাচরণ তাও সত্য বলে মানতেন না। একদিন সন্ধ্যায় মনোরমা দক্ষিণাচরণের স্ত্রীকে দেখতে এল। তাকে দেখে তাঁর স্ত্রী একটু চমকে বললেন—ও কে গো! দক্ষিণাচরণ প্রথম বলে উঠলেন

—আমি চিনি না, কিন্তু পরমুহূর্তেই বললেন—ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা। দক্ষিণাচরণের স্ত্রী দীর্ঘদিন ভুগে আর ব্যাধির জ্বালা সহ্য করতে পারছিলেন না। ডাক্তারকে সে কথা তিনি বলেছিলেন। ডাক্তার তাঁকে দুটি ঔষধ দেন—একটি খাবার, অপরটি মালিশের। মালিশটি যে তীব্র বিষ সে কথা বলে তিনি রোগিণীকে বার বার সাবধান করে যান। কেউ যখন বাসায় ছিল না তখন রোগিণী সেই মালিশ খান এবং তার ফলে অচিরে তাঁর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়।

এর পর দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বিয়ে করে দেশে ফেরেন। কিন্তু স্বামীর প্রেমালাপে মনোরমা তেমন সাড়া দিত না, গম্ভীর হয়ে থাকত। এই সময়ে দক্ষিণাচরণ মদ ধরেন।

একদিন গঙ্গার ধারে ঝাউ গাছের মাথায় যেন আগুন ধরিয়ে চাঁদ উঠছিল। দক্ষিণাচরণ মনোরমাকে বললেন—মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। দক্ষিণাচরণের সহজেই মনে হল এমন কথা তিনি আর একদিন তাঁর পরলোকগত স্ত্রীকেও বলেছিলেন। তাঁর আরো মনে হল—হাহা হাহা করে একটি হাসি দ্রুতবেগে সর্বত্র বয়ে গেল। এর প্রভাব তাঁর মনের উপরে এমন হল যে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্ছা-ভঙ্গে তাঁর স্ত্রী মনোরমা বললেন, সার বেঁধে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছিল, তাদেরই পাখার শব্দ অমন শোনাচ্ছিল।

এর পর মনোরমাকে আদর করতে গিয়ে এই ধরনের শব্দ শুনে চমকে ওঠা তাঁর যেন একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। গভীর রাত্রিতে এই ব্যাধি বাড়ত। তিনি শুনতেন কে যেন তাঁর মশারির পাশে তাঁর কানের কাছে বলছে—ও কে ও কে ও কে গো। কিন্তু দিনে তাঁর এই ভাব থাকত না। তখন রাত্রে যে তাঁর এমন ভাব হয় এবং অপরের কাছে সেই ভাব প্রকাশ না করে পারেন না একথা ভেবে তিনি ক্রুদ্ধ হতেন।

দক্ষিণাচরণের স্ত্রী বিষাক্ত মালিশ খেয়ে মারা যান, আর সেই মালিশ তাঁর হাতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন যে ডাক্তার সেই ডাক্তারের কন্যাকেই পরে দক্ষিণাচরণ বিয়ে করলেন ; স্ত্রীর সেবায় যে দক্ষিণাচরণের ক্লান্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল আর মনোরমার দিকে তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়েছিল এসবও

শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর অগোচর ছিল না; বাহ্যতঃ এই সবের অনেক কিছুই খুব আপত্তিকর ছিল না, কিন্তু গূঢ়ভাবে এসব যে ঘোর আপত্তিকর ছিল, কেননা দাম্পত্য-সম্বন্ধে এতে গ্লানি পৌঁছেছিল, দক্ষিণাচরণ তা মনে মনে স্বীকার না করে পারেন নি। তারই ফলে তাঁর এই ধরনের চিত্তবিকার ঘটেছিল।

চরিত্র হিসাবে এই গল্পে বিশেষ লক্ষণীয় দক্ষিণাচরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বাস্তবের বোধ তাঁতে অসাধারণভাবে তীক্ষ্ণ। তারই সঙ্গে স্নেহ মমতা ও দায়িত্ববোধ তাঁর চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দক্ষিণাচরণের চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন মনে হয়। সাধারণ সম্পন্ন মানুষের মতোই তিনি ভাববিলাসী। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম অপরাধের সেই এক ধরনের তীক্ষ্ণ বোধ তাঁর চরিত্রটিকে কিছু বিশেষত্ব দিয়েছে।

'কঙ্কাল' গল্পটির মতো অনুভূতির কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তীক্ষ্ণতা এই 'নিশীথে' গল্পটিতেও প্রকাশ পেয়েছে।

'আপদ' কবির একটি খুব উপভোগ্য গল্প। এতে মাত্র নীলকান্তর চরিত্র কিঞ্চিৎ অসাধারণ। তা ভিন্ন আর সবাই সাধারণ। কিন্তু প্রত্যেকের চরিত্র বিশিষ্ট হয়েছে। এমন-কি কিরণের বৃদ্ধা শাশুড়িও তাঁর ঠাকুরদেবতার কথা শুনবার লোভ আর দুপুরের নিদ্রা-কাতরতা এই দুয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পান।

কিন্তু এর এই দুটি চরিত্রই কবির মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে —কিরণময়ী বা কিরণ আর নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার পাওয়া যাত্রার দলের ছোকরা নীলকান্ত। কিরণের অসুস্থতার জন্য তাদের পরিবার চন্দননগরে হাওয়া বদল করতে এসেছিল, সেখানে এই ব্রাহ্মণবালক নীলকান্ত গঙ্গা থেকে সাঁতরে উঠে আসে ও সহজেই কিরণের আদরযত্ন লাভ করে।

কিরণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্নেহময়ী ও আমুদে প্রকৃতির। পরিবারের সবার কাছে এমন-কি তার শাশুড়ির কাছেও সে যথেষ্ট আদরের। কিন্তু এই গল্পটিতে তাকে বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে আমুদে প্রকৃতির আর স্নেহময় প্রকৃতির করে। তার দেবর সতীশ ছুটিতে কলকাতা থেকে এলে তার সঙ্গে তার সেই নির্দোষ আমোদ-আহ্লাদের দিকটা খুব প্রকাশ পেল; আর তার অন্তরের গভীর স্নেহ প্রকাশ পেল নীলকান্তর প্রতি।

ভবঘুরে প্রকৃতির নীলকান্তর ছবিটিও কবি যত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। সে যাত্রার দলের অধিকারীর কড়া ব্যবহারে মানুষ, আদরযত্ন কখনো পায় নি। তার ফলে অল্প বয়সেই তার চেহারা যা দাঁড়িয়েছিল তার ভিতরটা কাঁচা, কোমল "কিন্তু যাত্রার দলের তা লাগিয়া উপরিভাগে পক্বতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।" কিরণের সমাদরে অল্পদিনেই সে সহজভাবে বেড়ে উঠতে লাগল। কিরণকে সে যাত্রার দলের গান গেয়ে শোনাত। সেই গান সে নিজের মনেও উপভোগ করত। কিন্তু সে সুবোধ প্রকৃতির ছিল না, অন্যান্য ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাগান থেকে ফল চুরি করত। আর সেই অভিযোগ কিরণের স্বামী শরতের কানে এলে তিনি তাকে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিতেন। নীলকান্ত যে কিরণের কাছে আদর পেত এইজন্য বাড়ির কেউই তার উপর প্রসন্ন ছিল না। তার উপর তার নিজের দোষ তো ছিলই।

কিন্তু নীলকান্তর মনের দুঃখ ফুলে-ফেঁপে উঠল সতীশের আসার ফলে। সতীশের সঙ্গে হাসি-তামাশায় কিরণের অনেকটা সময় কাটতে লাগল। তাতে নীলকান্ত পূর্বে কিরণের যতটা আদর পেত তাতে ঘাটতি পড়তে লাগল। আবাল্য অনাদরে মানুষ নীলকান্ত। কিন্তু এতে সে মনে গভীর দুঃখ পেল। কিরণের দুই-একটি সমাদরের কথায় সে কেঁদে ফেলত—তা নিয়ে সতীশ তাকে খুব বিদ্রূপ করত।

সতীশ কলকাতা থেকে একটি শৌখিন দোয়াতদান কিনে এনেছিল। তার দুটি দোয়াতের মাঝে একটি জর্মন রূপার হাঁস ছিল। একদিন দেখা গেল সেই দোয়াতদানটি নেই। সতীশের সন্দেহমাত্র রইল না নীলকান্তই সেটি চুরি করেছে। সে তাকে ডেকে খুব ধমকাতে লাগল। কিরণের সামনে তার এমন চুরির অপবাদ দেওয়ায় নীলকান্ত মনে মনে খুব রাগল—উত্তেজনায় তার দুই চোখ জ্বলতে লাগল। কিরণ তাকে তখন পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে সুমিষ্টস্বরে বললে—নীলু, যদি সেই দোয়াতটা নিয়ে থাকিস আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বলবে না। কিরণের এই কথায় নীলকান্তর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল ও সে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। কিরণের তখন সন্দেহ রইল না যে নীলকান্ত চুরি করে নি এবং তার বেঁকে দাঁড়ানোর ফলে নীলকান্তকে আর এই নিয়ে কেউ কিছু বললে না।

নীলকান্তকে কেউই দেখতে পারত না; ফলে কিরণদের যখন বাড়ি ফিরে যাবার সময় হল তখন স্বভাবতই নীলকান্ত বাদ পড়ে গেল। কিরণও তার জন্য কিছু বলতে পারল না। কিন্তু গোপনে তার বাক্সে তার জন্য কিছু কাপড়চোপড় ও কয়েকটি টাকা রেখে দিতে গিয়ে সে দেখলে সতীশের সেই শৌখিন দোয়াতদান নীলকান্তরই বাক্সের মধ্যে রয়েছে।

পরের দিন দেখা গেল নীলকান্ত নেই। খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কিরণের স্বামী শরত তখন নীলকান্তর বাক্স খুঁজে দেখতে চাইলেন, কিন্তু কিরণ জেদ করে বললে—সে কিছুতেই হবে না। সে গোপনে সেই দোয়াতদানটি নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিলে।

কোথা থেকে উড়ে আসা নীলকান্ত এই বাড়ির লোকদের জন্য হয়েছিল বাস্তবিকই আপদ। যার জন্য আমাদের অন্তরে প্রীতি নেই সে আমাদের জন্য সত্যই মহা আপদ। আর কিরণের জন্য নীলকান্ত হয়েছিল স্নেহের আপদ। স্নেহ মানুষকে এমন বিপদেই জড়ায় বটে। কিরণ ও নীলকান্তর স্নেহের সম্পর্কটি কবি খুব দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। নীলকান্তর মনে অজানিতভাবে যে একটু অনুরাগের ছোপ লেগেছে যথাযথভাবেই তা চিত্রিত হয়েছে।

নীলকান্তর মতো ভবঘুরে ছেলেদের চরিত্র কবি আরো এঁকেছেন। এমন ভবঘুরেদের জন্য কবির বিশেষ মমতা ছিল, কেননা, কবি ছিলেন প্রাণের দুর্দম তাড়নায় চিরচঞ্চল।—গ্যেটের ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টারের ফিলিনার বালক-ভৃত্য ফ্রিডরিখের সঙ্গে নীলকান্তর কিছু মিল আছে।

'দিদি' গল্পটিতে কবি একটি মাতৃস্থানীয়া মহীয়সী দিদির চরিত্র এঁকেছেন। এই গল্পটিতে কবির একটি জ্ঞানগর্ভ কথা এই: স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা। এই 'দিদি' গল্পে শশিকলার ও তার স্বামী জয়গোপালের চরিত্রে কবি সেই পরিবর্তনই দেখিয়েছেন।

শশিকলা গৃহস্থ-বধূ। স্বামীকে সে খুব ভালোবাসে ও যত্ন করে। বহুদিন সে সংগতিসম্পন্ন বাপমায়ের একমাত্র সন্তান ছিল। সেজন্য তার স্বামী যদিও সামান্য চাকরি করত তবু ভবিষ্যতের জন্য তার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার বাপমায়ের একটি পুত্র লাভ হ'ল।

তার নাম রাখা হল নীলমণি। নীলমণির প্রতি শশিকলা প্রথম প্রথম কিছু অপ্রসন্ন ছিল। কিন্তু তার আদর কাড়বার শক্তির কাছে অচিরেই তাকে হার স্বীকার করতে হল। নীলমণিকে রেখে তার মা অল্পদিনেই পরলোক গমন করলেন তখন তার মানুষ করবার ভার পুরোপুরি পড়ল দিদি শশিকলার উপরে। শশিকলার পিতাও অল্পদিনে মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সম্পত্তির সিকি অংশ কন্যার নামে লিখে দিলেন। নীলমণির জন্মের পরে জয়গোপাল আসামে চা-বাগানে কাজ করতে গিয়েছিল। শ্বশুরের কঠিন পীড়ার সংবাদ পেয়ে সে ছুটি নিয়ে এসেছিল। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য সে চাকরিতে ইস্তফা দিলে।

ক্রমে ক্রমে নীলমণি তার দিদি শশিকলার সমস্ত মন আকর্ষণ করল। তার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, সেজন্য তার দিদি তাকে নিয়ে আরও ব্যস্ত হ'ল। কিন্তু তার স্বামী যে নীলমণির প্রতি প্রসন্ন নয় আস্তে আস্তে তার মনে সেই ধারণা বদ্ধমূল হ'লে। তার স্বামীর বিষদৃষ্টি থেকে নীলমণিকে বাঁচানো এখন থেকে তার এক বড় কাজ হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল জয়গোপাল তার শ্বশুরের সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করিয়ে বেনামিতে কিনছে। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে শশিকলা প্রথমে তা আদৌ বিশ্বাস করতে পারে নি। তাই প্রতিবেশিনী ঠেস দিয়ে এমন কথা বলায় সে খুব চটে গিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন সে বুঝল সত্যই এমন কাণ্ড ঘটছে তখন সে তার ভাই ও তার সম্পত্তি রক্ষার জন্য অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিলে। গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়েছিল। সে তার ছোটো ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হ'ল। তার স্বামীও সেখানে ছিল। তার ভাইয়ের সম্পত্তি তার স্বামী কেমন করে আত্মসাৎ করছে সেসব কথা খুলে বলে সে সাহেবের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল তার নাবালক ভাইয়ের ভার নিতে ও তার সম্পত্তি উদ্ধার করে দিতে। জয়গোপাল দুই-একটি কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহেব তাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

নীলমণিকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সঁপে দিয়ে শশিকলা সহজভাবেই তার স্বামীর সংসারে ফিরে এল, এবং অল্পদিনেই গ্রামবাসীরা সংবাদ পেল শশী রাত্রে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরেছে ও রাত্রেই তার দাহ হয়ে গেছে।

প্রেম পল্লীকন্যা ও পল্লীবধূ শশিকলাকে সহজভাবে করে তুলল এক অসাধারণ চারিত্রিক বীর্যের অধিকারিণী; আর দুশ্চেষ্টা জয়গোপালকে করল নির্মম পত্নীঘাতী।

'মানভঞ্জন' কবির একটি প্রসিদ্ধ ছোটগল্প। এতে গিরিবালার রূপযৌবনের বর্ণনা অপূর্ব হয়েছে। সেই অতুল্য রূপযৌবন গিরিবালার মনে একই সঙ্গে মোহ ও বেদনার সঞ্চার করেছে। বেদনা এইজন্য যে তার এমন রূপযৌবন তার স্বামীর কাছে পেয়েছে উপেক্ষা—উপেক্ষা ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু কবি তার যে সৌন্দর্যমূর্তি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে পাঠকরা লাভ করে এক অনাবিল আনন্দ।

গিরিবালা সেকালের কলকাতার এক বিত্তশালী পরিবারের বধূ। তার স্বামী গোপীনাথ পিতার মৃত্যুর পরে অগাধ বিত্তের অধিকারী হয়ে সেকালের কলকাতার ধনীঘরের যুবকেরা যেমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠত তেমনি উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। এমন স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে তার ইয়ারদের নিয়ে ও তার বিশেষ আদরের পাত্রী অভিনেত্রী লবঙ্গকে নিয়ে তার নিজস্ব জগতে মহা-আনন্দে দিন কাটাচ্ছে। লবঙ্গ কি গুণে তার স্বামীকে এমন মুগ্ধ করেছে তার খোঁজ নিয়ে গিরিবালা জানল লবঙ্গ সুন্দরী নয় আদৌ। শেষে সে নিজেও গোপনে থিয়েটারে গিয়ে লবঙ্গলতাকে দেখে এল। কিন্তু এর ফলে থিয়েটারের জৌলুস গিরিবালার হৃদয়মন আকর্ষণ করল।

একদিন তার স্বামী হঠাৎ রাত্রে বাড়ি এল। এসেই সে গিরিবালার কাছে চাবি চাইল। গিরিবালা সেদিন ভালো শাড়ি গহনা পরেছিল। সে মনে করলে যেমন করে হোক আজ সে তার স্বামীর মন ফেরাতে চেষ্টা করবে। সে তার স্বামীকে বললে—আমি চাবি দেব এবং চাবির মধ্যে যা-কিছু আসে সব দেব কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু তার স্বামী কোনো কথাই শুনল না। সে চাবির জন্য দেরাজ বিছানা খুঁজে শেষে আলমারি ভাঙল এবং কোথাও চাবি না পেয়ে জোর করে গিরিবালার গা থেকে বহুমূল্য বাজুবন্ধ কণ্ঠী আংটি এসব ছিনিয়ে নিয়ে ও তাকে লাথি মেরে চলে গেল।

তার অতুল রূপযৌবনের ও নির্ভরতার এমন অপমানে গিরিবালার প্রথম মনে হ'ল আত্মহত্যা করে সে এর শোধ নেবে। কিন্তু তখনই তার মনে

পড়ল—তাতে তো কারো কিছু এসে যাবে না। সে কারো নিষেধ না মেনে কলকাতা থেকে দূরে তার বাপের বাড়ি চলে গেল। এ সময়ে তার স্বামীও সদলবলে নৌকাবিহারে গিয়েছিল।

এর পর আমরা গিরিবালাকে দেখতে পাই অভিনেত্রীরূপে। তার অভিনয়, বিশেষ করে তার রূপযৌবন, নাট্যামোদীদের জগতে বিপুল সাড়া জাগাল। তাতে আকৃষ্ট হয়ে গোপীনাথও একদিন তার অভিনয় দেখতে গেল। অল্পক্ষণ অভিনয় দেখার পরই সে বুঝল এই নতুন জনমনোমোহিনী অভিনেত্রী তারই স্ত্রী গিরিবালা। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—গিরিবালা, গিরিবালা, এবং লাফ দিয়ে স্টেজের উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বাদকেরা তাকে ধরে ফেলল। সে তখন ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল—আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।

পুলিশ গোপীনাথকে টেনে থিয়েটারের বাইরে নিয়ে গেল। দর্শকেরা পূর্বের মতনই গিরিবালার অপূর্ব অভিনয় দেখতে লাগল।

প্রিয়জনের হাতের লাঞ্ছনা মানুষের জন্য, বিশেষ করে নারীর জন্য, একান্ত দুর্বিষহ হয়। এর ফলে আত্মহত্যার চাইতেও সাংঘাতিক কাজ অনেক সময়ে মেয়েরা করে। থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়ে একই সঙ্গে গিরিবালা তার অমানুষ স্বামীর উপরে শোধ তুলল, আর তার লাঞ্ছিত রূপযৌবনেরও একটা সার্থকতার পথ পেল—তা হোক না সে পথ নিন্দার পথ।

'ঠাকুরদা' গল্পটি বেশ উপভোগ্য। অবশ্য উপভোগ্যতার অতিরিক্ত কোনো সম্পদ এর থেকে আশা করা সংগত হবে না।

এর নায়ক কৈলাসবাবু এক বড় জমিদার-বংশের সন্তান। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে বংশের সেই নামডাকের অতিরিক্ত আর কিছুই তাঁর জন্য অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। কৈলাসবাবুও সেই নাম সম্বল করেই জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

কিন্তু বংশের জন্য সেই গর্ববোধ ভিন্ন তাঁর চরিত্রে আর কোনো ত্রুটি নেই। বরং অনেকগুলো ভালো গুণ তাঁর চরিত্রে আছে। তাঁর রুচি সুমার্জিত; মানুষের সঙ্গে একটি সহজ প্রীতির যোগও তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কৈলাসবাবুর সেই গর্ববোধও কতকটা তাঁরই মতো তাঁর প্রতিবেশীরাও উপভোগ করে।

গল্পের শেষে দেখা যাচ্ছে, গল্পের প্রবক্তা তরুণটি বৃদ্ধের এই গর্ব ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। সেই ষড়যন্ত্রের জালে বৃদ্ধ সহজেই ধরা পড়লেন। কিন্তু বৃদ্ধের তরুণী নাতনী তার অমন ভালোমানুষ ঠাকুরদাকে নাকাল করার জন্য গল্পের প্রবক্তার কাছে খুব দুঃখিত অন্তরে কৈফিয়ত তলব করলে। তার বেদনা-ভরা অভিযোগ থেকে গল্পের প্রবক্তা পুরোপুরি বুঝতে পারলে তার কাজ কত অন্যায় হয়েছে।

গল্পের প্রবক্তাটি ছিল ধনী পিতার উচ্চশিক্ষিত একমাত্র সন্তান—দেখতেও কুরূপ নয়। এসবের জন্য অন্তরে অন্তরে সে একটু গর্বিতও ছিল। এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বৃদ্ধের কাছে সে তাঁর নাতনীর পাণিপ্রার্থনা করলে। বৃদ্ধ প্রবক্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি গরিব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না, ভাই।"

কৈলাসবাবু বাইরে ছিলেন বংশাভিমানী, কিন্তু অন্তরে ছিলেন সজ্জন। এই দুই প্রায়-বিপরীত গুণের সমবায়ে তাঁর চরিত্রটি উপভোগ্য হয়েছে।

'প্রতিহিংসা' গল্পটিতে যাকে বলা হয় মহৎ প্রতিহিংসা—noble revenge—তারই একটি ছবি আঁকা হয়েছে। গল্পের নায়িকা ইন্দ্রাণী তার অপমানের তীব্র জ্বালা ভুলতে প্রয়াস পেলে এক বহুমূল্য মহৎ প্রতিহিংসার আয়োজন করে।

এতে জমিদার বিনোদবিহারীকে দাঁড় করানো হয়েছে অপদার্থ জমিদার-পুত্রদের প্রতিনিধিরূপে।

'ক্ষুধিত পাষাণ' রবীন্দ্রনাথের একটি স্বনামধন্য ছোটগল্প। এতে কবি তাঁর কল্পনাশক্তির এক অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন। এক অতীত যুগের এক লোকবিশ্রুত অন্তঃপুরের আর সেই অন্তঃপুরের রূপসীদের রূপলাবণ্যের ও সেই সঙ্গে তাদের অসীম সমাদরের ও নিষ্ঠুর বন্ধনদশার যে চিত্র কবি এতে অঙ্কিত করতে পেরেছেন একই সঙ্গে তার ক্রূর বাস্তবতা আর মোহন স্বপ্নময়তা পাঠকদের মনের উপরে এক অদ্ভুত সম্মোহনজাল বিস্তার করে। ভারতের মোগল-যুগের স্বেচ্ছাচার ও বৈভব দুয়েরই কথা কবি নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। এখানে তিনি পরিচয় দিয়েছেন সেই অতীত যুগের বিলাস-বৈভব তাঁর কল্পনাকে কিভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল—সে-জগতের শোভা-সমারোহের কাছে, তার অসীম অবসর ও শিষ্টাচারপূর্ণ দরবারি চালচলনের কাছে একালের

কেজো পরিচ্ছদ ও ব্যস্ত চালচলন কত শ্রীহীন মনে হয়েছিল। এ-যুগের প্রতীকস্থানীয় খাটো কোর্তার দুর্গতি কবি অঙ্কিত করেছেন এইভাবে :

একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবি হ্যাট এবং খাটো কোর্তা তুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় শুস্তানদীর বালি এবং আরালী পর্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্তা ও টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পরদায় পরদায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

আরব্য উপন্যাস তার অদ্ভুত কল্পনা-জগতের দ্বারা কবির কিশোর-কল্পনাকে কিভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, বলা যায়, এ গল্পটি তারও এক পরিচয়।

এ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের যৌবনের সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনার যেন এক বাদশাহী মহল, সেই অদ্ভুত শোভা-সমারোহপূর্ণ বাদশাহী জগতের অভ্যন্তরে নিষ্ঠুর বাস্তব কিভাবে মাঝে মাঝে আপন বিভীষণ মুখ ব্যাদান করত তারও ইঙ্গিত দিতে কবি ভোলেন নি।

এর পরিবেশটি রচনা করতেও কবি প্রচুর যত্ন নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ রূপ-রসিক যত জীবন-রসিক তার চাইতে কিছু বেশি—এই আমাদের ধারণা। কিন্তু এই গল্পটিতে তাঁর রূপরসিকতা তাঁর জীবন-রসিকতাকে যেন কিছু ছাপিয়ে উঠেছে।

এই বিখ্যাত গল্পটি সম্বন্ধে কবি উত্তরকালে তাঁর 'ছেলেবেলা'য় মন্তব্য করেন :

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবাগে, বাদশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে ; বড়ো বড়ো ফাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাঁটুজল লুটিয়ে নিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্ছার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্নানের আমিরিআনার।

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলতি ইতিহাস থেমে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-ফেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবেক দিনগুলো যেন যক্ষের ধনের মতো মাটির নীচে পোঁতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে অষ্ট প্রহরের রাগিণীতে, রাস্তায় তালে তালে ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি ফৌজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের বর্শার ফলায় রোদ উঠছে ঝকঝকিয়ে। বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্‌ফাস্‌। অন্দরমহলে খোলা তলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামামে ছুটছে গোলাপজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাঁকনের ঝন্‌ঝনি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধ্বনি—শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি। পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে; তার মাথার খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোশ পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাদুঘরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচিত্তির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেয়ালেরই খেলনা।

কবির 'আপদ' গল্পে এক ভবঘুরের ছবি আমরা পেয়েছি। তেমনি, অথবা তারো চাইতে উঁচু দরের, আর-একটি ভবঘুরে বালকের ছবি আমরা পাই তাঁর বিখ্যাত 'অতিথি' গল্পে। 'অতিথি'র তারাপদর বয়স 'আপদে'র নীলকান্তর চাইতে আরো কম। তাই দোষের ভাগ তার চরিত্রে তেমন প্রকাশ পায় নি। এর উপর সে সুদর্শন। এই সব কারণে তার এই জন্মগত উদাসীন ভাব আমাদের মনকে আরো স্পর্শ করে।

যে পরিবারে তারাপদ অল্পদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল সেই পরিবারের ছোট মেয়ে চারুশশীর আবদার ও খেয়ালিপনা কবি বড়ো মনোরম করে অঙ্কিত করেছেন। এই আবদেরে মেয়েটি অকারণেই ছিল তারাপদর প্রতি

বিরূপ। কিন্তু তার সেই বিরূপতা ধীরে বদলে সেই-একধরনের অনুরাগে রূপান্তরিত হল।

কিন্তু চারুশশীর প্রসন্নতা, তার পিতা ও মাতার সমাদর, কিছুই তারাপদকে বাঁধতে পারল না। চারুশশীর পিতামাতা তারাপদর সঙ্গে চারুশশীর বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন কিন্তু সব স্নেহের ও যত্নের বন্ধন ছিন্ন করে বিবাহের অল্প কিছু আগে তারাপদ চারুশশীদের গৃহ ত্যাগ করে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

এই গল্পটির পরিবেশ রচনা করেছে কবির পরমপ্রিয় বর্ষাঋতু। সেই পরিবেশ সম্পর্কে কবি ছিন্নপত্রাবলীতে লিখেছেন :

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলেছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়।...অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

'অতিথি' 'সাধনা'য়-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের শেষ ছোটগল্প—১৩০২ সালের সাধনায় ভাদ্র-কার্তিক সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়।

এর পর ঐ বৎসরে 'সখা ও সাথী' নামক পত্রিকার আশ্বিনের সংখ্যায় তাঁর 'ইচ্ছাপূরণ' নামক রূপক গল্পটি প্রকাশিত হয়। কবির খুব উল্লেখযোগ্য রচনা এটি নয়।

এর পর ১৩০৫ সালে কবি 'ভারতী'র সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন ও তাতে পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত পর পর এই সাতটি গল্প লেখেন: দুরাশা, পুত্রযজ্ঞ, ডিটেকটিভ, অধ্যাপক, রাজটিকা, মণিহারা, দৃষ্টিদান। এগুলোকে সাধনার যুগের অন্তর্ভুক্ত করে দেখাই ভালো। কবির পরিণত রচনা-কৌশলের গুণে এই গল্পগুলো উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যে খুব বিশিষ্ট ছোটগল্প হচ্ছে 'দুরাশা'। রচনার কৌশল তাতেও লক্ষণীয়, কিন্তু সেসব ডিঙিয়ে তাতে প্রকাশ পেয়েছে সুগভীর মানবিক আবেদন।

গল্পটির উৎপত্তি সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

> কেশরলালের গল্পটা পেয়েছি মগজ থেকে। চতুর্মুখের মগজ আছে কিনা জানি নে। কিন্তু, তিনি কিছু-না থেকে কিছুকে যেভাবে গড়ে তোলেন এও তাই। অনেককাল পূর্বে একবার যখন দার্জিলিঙ্ গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের মহারানী। তিনি আমাকে গল্প বলতে কেবলই জেদ করতেন। তাঁর সঙ্গে দার্জিলিঙের রাস্তায় বেড়াতে মুখে মুখে এই গল্পটা বলেছিলুম।

এর কাঠামো যা তাতে এটি একটি রোমান্টিক গল্পরূপে গণ্য হবারই যোগ্য। কিন্তু সেই কাঠামো বাইরের ব্যাপার, এর অন্তরে ঠাঁই হয়েছে একটি সুগভীর বেদনার। সেই বেদনা ব্যক্ত হয়েছে সন্ন্যাসিনী নবাবপুত্রীর এই অন্তিম খেদে:

> ...যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম, তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র। আমি জানিতাম, তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্নানিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনতমস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম। হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর-এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর-এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।

একালের হৃদয়হীন আচারসর্বস্ব ব্রহ্মণ্যের প্রতি এটি কবির এক গভীর ধিক্কার।

সেই হৃদয়হীন কিন্তু লোভন আচারধর্ম দেশের অনেক দুর্গতির জন্য দায়ী এই হয়ত কবির ইঙ্গিত। অন্ততঃ সন্ন্যাসিনী নবাবপুত্রীর 'নমস্কার বাবুজি' বিদায়-সম্ভাষণ সংশোধিত করে 'সেলাম্ বাবুসাহেব' বলা সেই দুর্গতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

'সাধনা'র যুগ নানাদিক দিয়ে রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি বড় সৃষ্টিশীল যুগ। তার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি, আরো পাব। এই যুগে তাঁর ছোটগল্প যে তাঁর প্রতিভার খুব বিশিষ্ট দান সে বিষয়ে মতভেদ নেই।

আমরা তাঁর অনেকগুলো ছোটগল্পের যে পরিচয় পেলাম তা থেকে বুঝতে পেরেছি মানবজীবন সম্বন্ধে শুধু গভীর অন্তর্দৃষ্টি নয়, তার সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ও এই যুগে তাঁর রচনায় প্রকাশ পায়। জীবনের বিচিত্র রূপ—সাধারণ, কিছু-অসাধারণ, ভালো, মন্দ, সবই—কি গভীর দরদ দিয়ে তিনি দেখেন। বলা যেতে পারে—মানবজীবনে বিশ্ববিধাতার বিচিত্র লীলা কবি প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর এই সৃষ্টিতে।—তবে লীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য প্রয়োজন যে অনাসক্ত ও কৌতূহলী দৃষ্টির সেটি কবিতে প্রচুরভাবে দেখতে পাওয়া গেলেও কবির দৃষ্টি শুধু অনাসক্ত ও কৌতূহলীই নয়, তাঁর দৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি গভীর-বেদনা-ভরা মন—জীবন যে ক্ষণভঙ্গুর, নানা দুঃখ-বিপত্তি ও অনর্থের করাল ছায়ার দ্বারা তা যে পরিম্লান, এরই জন্য কবির এমন গভীর বেদনা। এই বেদনা কবিকে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুও করেছে।

কিন্তু এটি হয়ত শুধু রবীন্দ্রনাথেরই বৈশিষ্ট্য নয়। কবির বা শিল্পীর দৃষ্টি আসলে হয়ত এই-ই—একই সঙ্গে কিছুটা অনাসক্ত ও কৌতূহলী আর তার সঙ্গে গভীর বেদনায় ভরা। এই বেদনাই হয়ত তাঁদের সৃষ্টিশক্তিকে গতি দেয়।

বাংলা গদ্য প্রথম এক অসাধারণ কান্ত আর প্রাণময় রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল কবির এই ছোটগল্পগুলোর মধ্যে। কবির পরবর্তীদের উপরে এর প্রভাব খুব ব্যাপক হয়েছে।

পঞ্চভূত

'রবীন্দ্র-জীবনী'তে উল্লিখিত হয়েছে, কবির গাজীপুর থেকে ফেরার পরে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে সাহিত্যের মজলিস প্রায়ই বসত, তার ফলে 'পারিবারিক স্মৃতি' নামক আলোচনার খাতায় সমাগত সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের নানা ধরনের চিন্তা মন্তব্য বাদ-প্রতিবাদ জমে ওঠে। এই 'পারিবারিক স্মৃতি' পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে হয়ে ওঠে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূত'। 'পারিবারিক স্মৃতি'তে যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে উল্লিখিত হয়েছে এঁদের নাম: দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী ও যোগেন্দ্র চৌধুরী। 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে আরো উল্লিখিত হয়েছে, শিলাইদহে, এবং একবার রাজসাহীতে লোকেন পালিতের বাসায়, এমন সাহিত্যিক মজলিস জমেছিল, তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়—এঁর নামে পঞ্চভূত উৎসর্গ করা হয় —আর রাজসাহীর বিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কিন্তু এই সব সাহিত্য-মজলিসের মজলিসীদের মধ্যে পঞ্চভূতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র পাঁচজনকে বা পাঁচ ভূতকে, কবি তাঁদের মধ্যে ষষ্ঠ ভূত বা ভূতনাথ। আর এই 'ভূত'দের মধ্যে আছেন দুইজন নারী। তাঁরা কে হতে পারেন সে সম্বন্ধে কেউ কিছু বলেছেন কিনা জানি না। অনুমান করা যেতে পারে এঁদের মধ্যে দীপ্তি হচ্ছেন কাদম্বরী দেবী আর স্রোতস্বিনী হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী। কাদম্বরী দেবী অবশ্য এর কয়েক বৎসর পূর্বে লোকান্তরিতা হন। কিন্তু রবীন্দ্র-মানসে তিনি ছিলেন অবিস্মরণীয়া। তাঁর যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তা থেকে বোঝা যায় তেজের অংশ তাঁর চরিত্রে বেশ ছিল। ইন্দিরা দেবীর বয়স অবশ্য এ সময়ে অল্প। তবে এই বয়সেই কবির সাহিত্যিক জীবনে তাঁর স্থান লাভ হয়েছিল। আর তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন কত মধুরস্বভাবা তিনি ছিলেন।

'পঞ্চভূত'-এর পাঁচ ভূতের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যোম যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয় তা অনেকেই স্বীকার করবেন। শ্রীযুক্ত সমীর খুব সম্ভব লোকেন পালিত। প্রমথ চৌধুরীর আদলও যে তাঁতে মাঝে মাঝে না দেখা যায় তা নয়; তবে এ সময়ে চৌধুরীমশায়ের বয়স ছিল অল্প। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি যে কে,

অর্থাৎ কার সঙ্গে তাঁর চরিত্র মেলে, তা অনুমান করা কিছু কঠিন। সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে নন তা সহজেই বোঝা যায়, কেননা, ক্ষিতি বাস্তববাদী কিছু বেশি—অবশ্য সেই সঙ্গে তীক্ষ্নবুদ্ধিও। কবির শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনও ক্ষিতির রূপ পান নি মনে হয়, কেননা, কবি দেশ-বিদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তির কথাই বলেছেন। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় আর ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এঁরা কেউ ক্ষিতির রূপ পেয়েছেন মনে হয়। হয়ত নাটোরের মহারাজাই ক্ষিতি হয়েছেন—তাঁর নামে পঞ্চভূত উৎসর্গ করা হয়েছিল, তাছাড়া তিনি স্থূলকায় ছিলেন, 'পরিচয়ে' ক্ষিতিকে বলা হয়েছে সবার চাইতে 'গুরুভার'।—কিন্তু এই গোড়ার কথাটা ভুললে চলবে না যে পঞ্চভূতের কোনো 'ভূত'ই বাস্তব মানুষের প্রতিচ্ছবি নয়। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি স্পষ্ট :

> পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।···আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

অন্যভাবে বলা যায়, পঞ্চভূতের এক-একটি 'ভূত' এক-একটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক। আর সেই সব দৃষ্টিভঙ্গি কবির বন্ধু ও পরিচিতদের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, অশেষ বৈচিত্র্যে যাঁর সুগভীর আনন্দ সেই কবিরও সে-সবের প্রতি সহানুভূতি কম নয়। কবির যে সচেতন ব্যাপক ও প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর ছোটগল্পে, তাই কিঞ্চিৎ ভিন্ন বেশে দেখা দিয়েছে তাঁর পঞ্চভূতের ডায়ারিতে।

পঞ্চভূত লেখা হয় সোনার তরী ও চিত্রার যুগে—সাধনার দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এর সূচনা। এর নিবন্ধগুলোর সমসাময়িক হচ্ছে বিশ্বনৃত্য, ঝুলন, হৃদয়যমুনা, বিদায়-অভিশাপ, বসুন্ধরা, এবার ফিরাও মোরে, অন্তর্যামী, সাধনা, রবীন্দ্রনাথের এই সব বিখ্যাত কবিতা—যেগুলোতে তাঁর পরিণত কবি-প্রতিভার এক উজ্জ্বল পরিচয় রয়েছে। তাঁর সেই পরিণত প্রতিভারই উজ্জ্বল পরিচয়-স্থল তাঁর ছোটগল্প, পঞ্চভূত, ছিন্নপত্রাবলী এবং এই যুগের আরো কিছু কিছু গদ্য রচনাও।

রবীন্দ্রনাথ কবি ও সংগীতকাররূপে বেশি আদৃত। তাঁর গদ্যও যে এক অসাধারণ সৃষ্টি পাঠকরা সে সম্বন্ধে সাধারণত অমনোযোগী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

বাস্তবিকই একজন শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক—বাংলা সাহিত্যে এ-পর্যন্ত তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। ছোটগল্প, পঞ্চভূত, ছিন্নপত্রাবলী—সাধনার যুগের এই সব রচনা তাঁর গদ্যরচনাগুলোর মধ্যে প্রথম সারের।

কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না। হৃদয়ের অনুভূতি কবিতার ভিতর দিয়া আকার ধারণ করিতে চেষ্টা করে।

কাব্য সম্বন্ধে অনেকেই এই ধরনের কথা বলেছেন। কিন্তু গদ্যের প্রকৃতি কিছু স্বতন্ত্র। বলা যেতে পারে 'বুঝাইবার চেষ্টা' গদ্যের প্রাণ। অবশ্য সাহিত্যিক রচনার একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তা হৃদয়গ্রাহী হয়—গদ্য-সাহিত্যে একই সঙ্গে থাকা চাই হৃদয়গ্রাহিতা আর বিচারের শক্তি। হৃদয়গ্রাহিতার সঙ্গে বিচারের ক্ষমতার যত সুষ্ঠু যোগ ঘটে ততই গদ্যসাহিত্যের মর্যাদা বাড়ে। পঞ্চভূতে, এবং ছোটগল্পে ও ছিন্নপত্রাবলীতে, একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ হৃদয়গ্রাহিতা আর অসাধারণ বিচারের শক্তি।

এই কালে Amiel's Journal কবি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়েন। Amiel উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যিক—গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই সঙ্গে প্রকাশসামর্থ্যও তাঁর অনন্যসাধারণ। হতে পারে চিন্তার ব্যাপকতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভের ক্ষেত্রে Amiel থেকে কবি বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন। তবে, মোটের উপরে, Amiel দার্শনিক ও মরমী, আর রবীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণচেতনাসম্পন্ন মানবদরদী সাহিত্যকার—চিত্তের সচেতনতার সঙ্গে প্রকাশের লালিত্য তাঁর রচনার, বিশেষ করে এই সব রচনার, ভূষণ।

পঞ্চভূতে ষোলোটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর সবগুলোই 'সাধনা'য় প্রকাশিত হয়—প্রথমটি ১২৯৯ সালের মাঘের সংখ্যায় আর শেষেরটি ১৩০২ সালের ভাদ্রের সংখ্যায়। মাঝে এক বৎসর এর কোনো লেখা 'সাধনা' বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। এই লেখাগুলো পরে পরে কিছু কিছু মাজা-ঘষা করা হয়েছিল—তা জানা যাচ্ছে। তবে মোটের উপরে সেই মাজা-ঘষা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই মনে হয়।

আমরা বলেছি বিভিন্ন 'ভূতে'র অর্থাৎ চরিত্রের মুখে যে-সকল কথা বলা হয়েছে সেসব যত বিচিত্রই হোক কবির সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত নয়। এর পরিচয় রয়েছে এই রচনাটির সর্বত্র। এর ফলে চিন্তার বৈচিত্র্য,

জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম চেতনা, এসব এতে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে বলার ভঙ্গির মাধুর্যও। রম্যরচনা বিচারের তীক্ষ্ণতা আর জীবনমুখিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কত রম্য হতে পারে 'পঞ্চভূত' আমাদের সাহিত্যে তার এক বড় নিদর্শন হয়ে আছে ও থাকবে।

এতে যেসব চিন্তা বা চিন্তাবীজ সহজেই চোখে পড়ে তার কিছু কিছু পরিচয় নিতে চেষ্টা করে পাঠকদের সঙ্গে এটি উপভোগ করা যাক। পঞ্চভূত মজলিসী রচনা, মজলিসী ভাবেই এটি সবচাইতে বেশি উপভোগ্য।

প্রথম লেখাটির নাম 'পরিচয়'। বিভিন্ন ভূতের চরিত্রের বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এতে কবি দিয়েছেন। ক্ষিতির পরিচয় যা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এই : ক্ষিতি বাস্তববাদী ; যা প্রত্যক্ষ, যা কাজে লাগাতে পারেন, তাকেই তিনি সত্য বলে জানেন ; তার বাইরে সত্য যদি থাকে তবে তার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর নেই। কেন নেই সেই যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন এইভাবে :

> যে-সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। এই বোঝা ভারি হয়েই চলেছে, কেননা শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। সেইজন্য বর্তমানে শৌখিন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। আর এই কারণে সভ্যতা থেকে অলংকার প্রতিদিনই খসে পড়ছে—উন্নতির অর্থ দাঁড়াচ্ছে আবশ্যকের সঞ্চয় আর অনাবশ্যকের পরিহার।

ক্ষিতির যুক্তি যে উড়িয়ে দেবার মতো নয় তা সহজেই চোখে পড়ে। সভ্যতায় যে দিন দিন আবশ্যকের উপরে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অনেকখানি গোড়াশক্ত যুক্তির সামনে শ্রীমতী স্রোতস্বিনী শুধু জানালেন তাঁর অন্তরের আপত্তি। তাঁর বক্তব্যের মর্ম এই :

> অনাবশ্যককে আমরা ভালোবাসি, তাই অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যকের দ্বারা আমাদের আর কোনো উপকার হয় না কেবল তা উদ্রেক করে আমাদের ভালোবাসা আমাদের করুণা আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা। এই ভালোবাসা বাদ দিয়ে তো আমরা জীবনে চলতে পারি না।

ক্ষিতির কাছে স্রোতস্বিনীর এই যুক্তি অগ্রাহ্য, তবু স্রোতস্বিনীর হৃদয়ের কথা তাঁকে স্পর্শ করল। সমীর স্রোতস্বিনীর বক্তব্য আর একটু জোরালো করলেন এই যুক্তি দিয়ে :

জড়ের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গভীর কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধটা তার চাইতেও বড়। সেইজন্য বস্তুবিজ্ঞান শিক্ষা করলেই মানুষের চলে না, লোকব্যবহার বিশেষ করে মানুষকে শিখতে হয়। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলংকার, যা কমনীয়, যা কাব্য সেইগুলি মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে। পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য করে, চোখের দৃষ্টি খুলে দেয়। সে-সব বাদ দিয়ে মানুষের চলেই না।

ব্যোম তাত্ত্বিক—জীবনের তত্ত্বের দিকটার অর্থই তাঁর কাছে বেশি। তিনি মন্তব্য করলেন :

যা অনাবশ্যক তাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। অত্যাবশ্যককেই যদি মানব-সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করে বসানো হয়, তার উপরে যদি আর কোনো সম্রাটকে স্বীকার না করা হয় তবে সে সভ্যতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

এই সব দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকটির মধ্যেই যে মূল্যবান সম্পদ আছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কবি এই সব দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য সাধন করলেন এইভাবে :

জড়ের থেকে পালিয়ে তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধনের চেষ্টা না করে জড়কে ক্রীতদাস করতে পারলে মানুষের একটা বড় রকমের লাভ হয়। স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হতে হলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।

কবির এই সিদ্ধান্ত—সিদ্ধান্তটি মূল্যবান—তাঁর ভূতরা যে মেনে নিলেন তা নয়। তবে একটা ব্যাপারকে যে কত বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যায়, এবং দেখা যায় সার্থকভাবে—শুধু তার্কিকের ভঙ্গিতে নয়—তা বোঝা গেল।

এই আলোচনা করতে গিয়ে কবি আর একটি দিক সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন। সেটিকে বলা যায় ডায়ারি রাখার দোষের দিক। মোটের উপর তা সাহিত্য-চর্চারই দোষের দিক। কবির বক্তব্য এই :

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক দুঃখ অনেক উত্তেজনা দেখা দেয়, কিন্তু কালে কালে সে-সব আমাদের মন থেকে দূর হয়ে যায়, জীবনের বাড়াবাড়িগুলো চুকে গিয়ে জীবনের মোটামুটিটুকু টিকে যায়। সেইটিই

স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু সাহিত্যে আমাদের মনের অর্ধস্ফুট কথাকে অতিস্ফুট করে তোলা হয়। তাতে মনের সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়।

একালের সাহিত্যের অতি-বিশ্লেষণী প্রবণতার দিকে কবি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্লেটো যে যে কারণে কবিকে তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে স্থান দিতে চান নি সেই ধরনের ব্যাপারের দিকেও তিনি এখানে ইঙ্গিত করেছেন মনে হয়। কিন্তু সেই জটিল সমস্যার সমাধান কি সেই বিষয়টা কবি এই আলোচনাটিতে এড়িয়ে গেছেন। তবে পঞ্চভূতের শেষের দিকে অন্য একটি লেখায় তার উল্লেখ করেছেন এইভাবে :

> সাহিত্য-আলোচনায় আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই না। নিউটন বলেছিলেন আমি জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়িয়েছি, কিন্তু সাহিত্যিকরা তাও বলতে পারেন না, জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে তাঁরা খেলা করেন মাত্র। তাতে তাঁদের কোনো রত্নলাভ না হলেও সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার ফলে খানিকটা স্বাস্থ্যলাভ হয়। কবির ভাষায়—"যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন হইয়াছে এবং সেজন্য আনন্দ ও আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সাহিত্যিক আলোচনা সম্বন্ধে কবি এই যে দাবিটুকু করলেন তা দেখতে বা শুনতে খুব জমকালো নয় বলেই কম অর্থপূর্ণ নয়। এর চাইতে বেশি দাবি সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে হয়ত করা যায়।—অন্য ধরনের জ্ঞান সম্বন্ধে কতটা করা যায় তাও ভাববার বিষয়।

পঞ্চভূতে শুধু বিচারের দিকটাই যে খুব লক্ষণীয় হয়েছে তা নয়, হৃদয়ের দিকটাও এতে মাঝে মাঝে অপূর্ব ভাষা পেয়েছে। এই কালে হৃদয়ের সঙ্গে কবির মস্তিষ্কের যোগ সহজভাবে জোরালো হতে পেরেছিল বলে সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ এমন চিত্তগ্রাহী হয়েছিল। এ সম্পর্কে পঞ্চভূতের দুটি দৃষ্টান্ত খুব উল্লেখযোগ্য : একটি, পল্লীগ্রামের মানুষদের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন ; অপরটি, আধুনিক সাহিত্যের নতুন সম্ভাবনা তিনি যা দেখেছেন। পল্লীর মানুষদের সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটি তাঁর 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের রাইচরণের চরিত্রের আলোচনাকালে আমরা উদ্ধৃত করেছি। তার কিছু অংশ পুনরায় উদ্ধৃত করছি :

আমি এখন বাংলাদেশের এক প্রান্তে যেখানে বাস করিতেছি এখানে কাছাকাছি কোথাও পুলিশের থানা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি নাই। রেলোয়ে স্টেশন অনেকটা দূরে।...এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বেই ইহাদের বংশের আদি পুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। ...এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ চাষাভুষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মতো ভালোবাসি। এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।...কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন-কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন।...সরলতাই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য।

কবি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তার সবটাই যে সবাই স্বীকার করে নেবেন তা ভাবা যায় না, কেননা, অসন্তোষ, জটিলতা, এসবের দিকে মানুষের একটা দুর্নিবার গতি রয়েছে। কবিও যে সে-সম্বন্ধে সচেতন তা আমরা দেখব। কিন্তু সমস্ত ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সরলতা সত্যই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাস্থ্য, আর আমাদের দেশের জনসাধারণকে কবি সেই অকৃত্রিম সরলতার জন্য যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরেছিলেন এটিও বিশেষভাবে অর্থপূর্ণ। এই শ্রদ্ধাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনে নতুন শক্তি ও শ্রী সঞ্চার করেছিল—তাঁর অপূর্ব ছোটগল্পগুলোর শক্তির ও সৌন্দর্যের উৎসের সন্ধান যেন এখানে আমরা পাচ্ছি। বাস্তবিক যা মহৎ তার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা চিরকাল সৃষ্টিধর্মী হয়েছে। প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় টলস্টয় ডস্টয়েভ্‌স্কি টুর্গেনিভ প্রমুখ সাহিত্যিকরা যে অমর সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তার মূলেও ছিল রাশিয়ার মূর্খ ও দুঃস্থ জনসাধারণের প্রতি তাদের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের জন্য উক্ত সাহিত্যিকদের সীমাহীন শ্রদ্ধা।

কিন্তু এতখানি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমাদের দেশের সর্বসাধারণের জীবনধারায় দুর্বলতা কোথায় সে-সম্বন্ধে কবি চেতনা হারান নি। এই লেখাটির শেষের দিকে তিনি বলেছেন :

য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব বিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে ; যন্ত্র-তন্ত্র উপকরণসামগ্রীতেও একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।—কিন্তু দেখিতেছি এই-সবের আয়োজনের মধ্যে মানব-হৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে, য়ুরোপের সাহিত্য হইতে সহজ আনন্দ সরল শান্তির গান একেবারে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে।...তাহার কারণ মানব-হৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতা-স্তূপের মধ্যে একটি সুন্দর ঐক্যস্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ কখনোই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।...

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি যে য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্যাদা বুঝি না।...যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্নবিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গলাভ করে।

আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয়, তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃপুনঃ ঝংকারকেও পরিপূর্ণ সংগীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহাসংগীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার এই কয়েকটি তারের মধ্য হইতে মহৎ মূর্তিমান সংগীত বাহির করা প্রতিভার পক্ষেও দুঃসাধ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি-ধারায় কবির চেতনার নূতনত্ব লক্ষণীয়।

'মনুষ্য' নামক লেখাটিতে স্রোতস্বিনীর মুখে একালে সাহিত্যের নতুন দিক্-পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে কথা কবি বলেছেন তাতে একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গভীর হৃদয়বত্তা আর মনের অসাধারণ সচেতনতা। সেই উক্তির শেষ অংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি :

যখন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখকষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত ; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না, তখন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু এই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালোবাসে এবং ভালো-বাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালোরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন-কি নিজেকেও ভালোরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখ-বেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলো নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্তব্য।

আশ্চর্য এই যে যিনি বহুদিন পূর্বে এই সব কথা লিখেছিলেন এবং তাঁর ছোটগল্পগুলোয় গভীর সহমর্মিতা দিয়ে বাংলার পল্লীর জীবনের অবিস্মরণীয় চিত্র এঁকেছিলেন, তাঁকে আমাদের বেশ কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী বলতে পেরেছিলেন যে, তাঁর রচনায় সমাজের উপরতলার মানুষের কথাই বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশের প্রতিবিম্ব পড়েছে তা মোটের উপর 'পরীর দেশ'।

আমরা 'পঞ্চভূত' থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত করলাম, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবির হৃদয় ও মন হীরকের টুকরার মতো কত বিচিত্র দিকে আলো বিচ্ছুরিত করছে। হয়ত হীরকের সঙ্গে উপমা দেওয়া ঠিক হল না। হীরকের দ্যুতিতে তীক্ষ্ণতাই বড় গুণ। কিন্তু এখানে যে আলো দেখছি তাতে তীক্ষ্ণতার সঙ্গে স্নিগ্ধতাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সেই তীক্ষ্ণ ও স্নিগ্ধ আলো যার উপরে পড়েছে তাকে শুধু প্রকাশ করে নি, মাধুর্যমণ্ডিতও করেছে।

প্রেম একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বড় শক্তি ও বড় সম্পদ। আর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রেমে আমাদের একালের শিক্ষিত সমাজ অনেকখানি বঞ্চিত।

পঞ্চভূতের তিনটি নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্ত লেখাগুলোর দিকেও তাকানো যাক।

দ্বিতীয় রচনাটির নাম 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ'। জমিদারের কাছারিতে পুণ্যাহের সানাই বাজছিল—সেইটি অবলম্বন করে 'ভূত'রা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে উৎসব-দিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে নানা দিক থেকে আলোচনা করলেন। তা থেকে জড়প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের লোকদের সম্পর্কের কথাও এসে পড়ল। সে সম্বন্ধে কবির মন্তব্যের একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। মন্তব্যটি যেমন উপভোগ্য তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—

> …প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহার মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর।…আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।…ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

"একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।…ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক" এই চিন্তাটি আমাদের দেশে সাধারণত অপরিচিত। এই প্রয়োজনীয় ও গুরু বিষয়ে কবি আরো বলেছেন :

> আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট-অশ্বত্থকে পূজা করি, আমরা প্রস্তর-পাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। বরঞ্চ আধ্যাত্মিককে বাস্তবিক করিয়া তুলি। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখ-সম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা-অসুবিধা সঞ্চয়-অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্যপ্রবাহিণী জাহ্নবী যখন

আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক, কিন্তু যখনই তাহাকে মূর্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোনো বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তখনই আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

দেশের প্রচলিত ভক্তিমার্গের প্রতিই যে কবি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করলেন শুধু তাই নয়, দেশের পণ্ডিতদের পরমপ্রিয় অদ্বৈতবাদের প্রতিও তিনি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেছেন এই প্রধান কারণে যে এসবের প্রভাবে দেশের চিত্তের সচেতনতা-সাধন ব্যাহত হচ্ছে।

তৃতীয় রচনাটির নাম 'নরনারী'। তাতে আমাদের দেশের নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ও চরিত্রের মূল্যায়ন কবি করেছেন এইভাবে :

আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোনো বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার্য, বৃহৎ ক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা-দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নত শিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোনো কর্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহন করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফল পুষ্পের মতো কর্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনই ভালোবাসিতে আরম্ভ করে, তখনই তাহার কর্তব্য আরম্ভ হয়; তখনই তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে, তাহার সমস্ত চরিত্র উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

গ্যেটের 'ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টারে' নারীজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এই মর্মের কথা আছে (কবিগুরু গ্যেটে, প্রথম খণ্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নারীর এই স্তবে ক্ষিতি কিছু বেসুর যোজনা করলেন এই বলে (অবশ্য দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতে) :

মেয়েদের ছোট সংসারে সর্বত্রই অথবা প্রায় সর্বত্রই যে মেয়েরা লক্ষ্মীর আদর্শ এ কথা যদি বলি তবে লক্ষ্মীর প্রতি লাইবেল করা হইবে। তাহার

> কারণ, সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌ বলে তাহার ভালো আছে মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই-সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায় সে কথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না? দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে টানিয়া তুলিতে পারিবে কি। তুমি বলিবে সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতি মাত্রায় হৃদয়ালুতা।

এই অংশটি মনে হয় পরবর্তীকালের যোজনা। নারীর হৃদয়ালুতা কাটিয়ে উঠবার প্রয়োজন সম্বন্ধে কবি তাঁর জীবনের শেষের দিকে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর 'কালান্তরে'র সুবিখ্যাত 'নারী' প্রবন্ধে।

চতুর্থ ও পঞ্চম নিবন্ধ যথাক্রমে 'পল্লীগ্রামে' আর 'মনুষ্য'। এই দুটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ নিবন্ধ 'মন'। মনোবিহীন প্রাকৃত জীবনে যে উদ্বেগরাহিত্য চোখে পড়ে মানুষের জীবনে সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে মনের আবির্ভাবের ফলে। এই নিবন্ধে মানব-মনের 'স্বর্গীয় অসন্তোষে'র প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সপ্তম নিবন্ধ 'অখণ্ডতা'। এতে মন-সম্পর্কিত আলোচনার জের টানা হয়েছে। এতে ব্যোম মন ও প্রতিভা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকথার অবতারণা করেন। দীপ্তি তাঁর অনেক মন্তব্যের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেন।

অষ্টম নিবন্ধ 'গদ্য ও পদ্য'। এতে আলোচনার প্রধান বিষয়: পদ্য ও গদ্যের মধ্যে সম্বন্ধ কি ধরনের, আর ভাবপ্রকাশের জন্য পদ্যের কোনো আবশ্যক আছে কি না। ব্যোম মন্তব্য করেন: পদ্য কৃত্রিম। তাতে সমীর মন্তব্য করেন: "কৃত্রিমতাই মানুষের সর্বপ্রধান গৌরব…অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।" ছন্দ ও ভাষার যোগ সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করলেন:

> ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে তখন ভাষার কার্য অনেক সহজ হইয়া আসে।

নবম নিবন্ধ 'কাব্যের তাৎপর্য'। স্রোতস্বিনী মন্তব্য করেন: মানব-জীবনের সাধারণ কথাই কবিতার কথা…অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই

সর্বসাধারণে তার রসভোগ করে আসছে। কবি স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করে বললেন :

> কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।

দশম নিবন্ধ 'প্রাঞ্জলতা'। দীপ্তি মন্তব্য করলেন : ভালো কবিতার ভালোত্ব যদি অবহেলে বুঝতে না পারি তবে আমি তার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না···অনেক সময় ভাবের দারিদ্র্যকে আচারের বর্বরতাকে সরলতা বলে ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় কল্পনা করা হয়। কবি মন্তব্য করলেন :

> কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্বরতা সরলতা নহে। বর্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার। অধিক অলংকার আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়।···ভালো সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতিপ্রকৃতি আছে···কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে, আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোনো অপূর্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।

একাদশ নিবন্ধ 'কৌতুক হাস্য' আর দ্বাদশ নিবন্ধ 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা'। ক্ষিতি প্রশ্ন তোলেন : কৌতুকে আমরা হাসি কেন, অথবা যে কারণেই হোক হাসি কেন, কেননা, তাঁর মতে, হাসিতে যে মুখভঙ্গি হয় মানুষের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে তা একটা অসংগত অসংযত ব্যাপার।

এই বিষয়টির উপরে নানা দিক থেকে আলোক ফেলবার চেষ্টা হয়েছে এই দুটি লেখায়। সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় : কৌতুকের মধ্যে নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে ; সেই পীড়াটা অধিক মাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা

সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হেসে উঠি। এর প্রতিবাদ করে দীপ্তি বলেন :

> চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট খাইলে কিংবা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্প মাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত, উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

তার উত্তরে কবি বলেন :

> জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই হাস্যরসও নাই,...সচেতন পদার্থ সম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড় পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

ত্রয়োদশ নিবন্ধ 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ'। এতে আলোচনার বিষয় বাস্তবকে উপেক্ষা করে abstract, অর্থাৎ বিমূর্তের দিকে আমাদের যে সাধারণ প্রবণতা সেইটি। এর ফলে নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় আমাদের দেশের কাব্যে অদ্ভুত উপমা ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ সে-অদ্ভুতত্ব সম্বন্ধে চেতনা আমাদের নেই। ব্যোম বললেন, তার কারণ আমরা অন্তরজগদ্বিহারী জাতি; তারও সুবিধার দিক আছে। কিন্তু ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করে সমীর ও ক্ষিতি দেশের লোকদের এই মনোভাবের নিন্দা করেই চললেন। ক্ষিতি বললেন :

> কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্যভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসংগত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসংগতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। ...এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

বলা বাহুল্য এটি শুধু ক্ষিতির মত নয়, কবিরও মত।

চতুর্দশ নিবন্ধ 'ভদ্রতার আদর্শ'। বেশভূষা আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙালী সমাজের শৈথিল্য ও জড়ত্ব এতে আলোচনার বিষয় হয়েছে। সমীর মন্তব্য করেন :

> সর্বদেশে সর্বকালেই অল্পসংখ্যক মহাত্মা লোক সমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু···আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই থাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।

ব্যোম মন্তব্য করলেন :

> বৈরাগ্য ব্যতীত কোনো বৃহৎ কর্ম হইতেই পারে না।···কর্মীকে কর্মের কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই সে আপন কর্মের নিয়মপালন উপলক্ষ্যে সমাজের অনেক ছোটোখাটো কর্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে—কিন্তু অকর্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না···যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোনো মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

ব্যোমের মুখে এমন কথা শুনে স্রোতস্বিনী কিছু বিস্ময় বোধ করলেন।

ক্ষিতি মন্তব্য করলেন :

> আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু—অতএব অত্যন্ত সরল, ধুলায় কাদায় নগ্নতায় সর্বপ্রকার নিয়মহীনতায় আমাদের কোনো লজ্জা নাই—আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক।

পঞ্চদশ নিবন্ধ 'অপূর্ব রামায়ণ'। এতে ব্যোম মন্তব্য করলেন :

> জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেইজন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেইখানে।

কিন্তু সমীর মন্তব্য করলেন :

> সাহিত্য সংগীত এবং সমস্ত ললিতকলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে মৃত্যুর পরকালপ্রান্ত হইতে ইহজীবনের মাঝখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর করিতে হইবে।

ক্ষিতি বললেন :

রামায়ণের এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। যারা সীতাকে বনবাস দেবার জন্য রামকে মন্ত্রণা দিয়েছিল তারা ত্যাগবৈরাগ্যধর্মী, কিন্তু সীতার দুই পুত্রের রামায়ণ গান শুনে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। এখনো উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। এখনো দেখবার আছে জয় হয় ত্যাগপ্রচারক প্রবীণ বৈরাগ্য-ধর্মের, না, প্রেমমঙ্গলগায়ক দুটি অমর শিশুর।

শেষ লেখাটির নাম 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল'। এতে আলোচনার বিষয় বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরম লক্ষ্য। সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো : মানুষের কৌতূহলবৃত্তি থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি যদিও সে-কৌতূহলের লক্ষ্য বিজ্ঞান ছিল না, যেমন, আল্‌কেমির চর্চা করতে করতে মানুষ কেমিস্ট্রির অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রের আবিষ্কার করল। কিন্তু বিজ্ঞানের নিয়মতান্ত্রিকতা মানুষকে খুশী করতে পারে না। সে মনে মনে কামনা করে অদ্ভুতকে, অনিয়মকে, অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্বকে। সেইজন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রেখে বাঁচতে পারে না। এই নিগূঢ় প্রয়োজন থেকেই মানুষের লাভ হয়েছে সৌন্দর্যবোধ, প্রেম ও আনন্দ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এসবের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নয়।

এই সিদ্ধান্তটি যে মহামূল্য একালে তা নতুন করে বোঝা যাচ্ছে, কেননা, একালে, অর্থাৎ রুষ-বিপ্লবের পরে, শ্বাইটজার (Schweitzer) প্রমুখ চিন্তাশীলদের দৃষ্টি নতুন করে আকৃষ্ট হয়েছে আস্তিকতা, প্রেম, নৈতিক বোধ, মানবজীবনে এই সবের সমূহ প্রয়োজনের দিকে।

পঞ্চভূতের যতটা পরিচয় আমরা পেলাম—এর অনেক চিন্তার উল্লেখ সম্ভবপর হয় নি—তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পূর্ণ যৌবনে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও বিশ্বদর্শন কি অর্থপূর্ণ রূপ নিয়েছিল—নতুন করে তিনি কত কথা ভেবেছিলেন। এতে দুর্বল অংশ যে নেই তা নয়, যা বিকাশধর্মী দুর্বল অংশ তাতে থাকবেই, কিন্তু রবীন্দ্র-সাধনা বলতে যে সুবৃহৎ ও সুমহৎ, সর্বোপরি নতুন, ব্যাপার বোঝায় তার পত্তন ও গঠন যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল তাঁর যৌবনেই তার এক বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এই নাতিদীর্ঘ রচনাটি থেকে। এর বিশেষ মর্যাদা এই কারণে।

ছিন্নপত্রাবলী

১৩১৯ সালের বৈশাখে 'ছিন্নপত্র' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি পত্রের বা পত্রাংশের সংগ্রহ প্রকাশ করেন। সেটি তাঁর পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। পরে জানা যায় সেই খণ্ডিত পত্রগুলোর প্রথম আটখানি কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা, অবশিষ্ট পত্রগুলো তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লেখা। সেই ছিন্নপত্র বর্তমানে, অর্থাৎ ১৩৬৭ সালে, 'ছিন্নপত্রাবলী' নামে বিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা পত্রগুলো এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে আর ইন্দিরাদেবীকে লেখা আরো বহু পত্র এবং পূর্বে প্রকাশিত পত্রগুলোর পূর্ণতর রূপ এতে সংযোজিত হয়েছে।

এর প্রথমদিককার কতকগুলো পত্র 'সাধনা'র যুগের আগে লেখা—কয়েকখানি বহু আগে লেখা। কিন্তু 'সাধনা'র যুগের অব্যবহিত পূর্বে ও 'সাধনা'র যুগে প্রকৃতি ও মানুষ এই দুয়েরই সম্বন্ধে, অথবা এই দুয়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে, কবির অন্তরে যে গভীর চেতনা জাগে তার বিশেষ পরিচয় যেমন ফুটেছে কবির এই যুগের কবিতায়, ছোটগল্পে ও পঞ্চভূতের ডায়ারিতে, তেমনি ফুটেছে তাঁর এই ছিন্নপত্রাবলীতে। ছিন্নপত্রাবলীতে তা আরো সহজভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলে পাঠকদের মন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা সেগুলোর যেন বেশি। এই পত্রগুলোর আরো গুণ এই যে কবির এই একান্ত আত্মকথা কখনো যে সাধারণ্যে প্রকাশিত হবে লিখবার কালে কবি সেকথা ভাবেন নি। এই পত্রগুলোর মূল্য সম্বন্ধে কবির উচ্চ ধারণা তাঁর কোনো কোনো পত্রে ব্যক্ত হয়েছে।

এই পত্রগুলো নানা দিক দিয়ে কবি-মানসের উপরে আলোকপাত করেছে। এর অনেকগুলো সম্বন্ধেই আমাদের কিছু কিছু আলোচনা করতে হবে।

১৮৮৮ সালে শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রখানিতে শিলাইদহের বিস্তীর্ণ ধূ ধূ চরের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। কবি বলেছেন, "এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না।" এখানকার সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের এই বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে

সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন—আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপার-ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা!···

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত পদ্মার চরের একটি অপূর্ব চিত্র ছিন্নপত্রাবলীতে প্রকাশিত হয়েছে।

শিলাইদহের এই বিস্তীর্ণ চরে রাত্রে বেড়াতে বেরিয়ে কবির পরিজনদের কিভাবে দিক্‌ভুল হয়েছিল এই চিঠির শেষের দিকে তার একটি উপভোগ্য বর্ণনা আছে।

১৮৮৯ সালের জুন মাসে কলকাতা থেকে লেখা পত্রে টলস্টয়ের Anna Karenina-র উল্লেখ আছে; কবি লিখছেন:

···পড়তে গেলুম, এমন বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এরকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা—কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।

একালের সাহিত্যের জটিলতা সম্বন্ধে কবির অভিযোগ পঞ্চভূতেও আমরা পেয়েছি।—১৮৯০ সালের ৩রা অক্টোবরে লণ্ডন থেকে লেখা পত্রে কবির স্বদেশ-চেতনা বড় মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে:

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্ম-কালের যা-কিছু ভালোবাসা, যা-কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই

ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

এই যুগে কবি তেমনিভাবেই আপনার মৌচাকটি ভরে তুলেছিলেন। আর তাতে তাঁর দেশ অচিন্তনীয়ভাবে লাভবান হয়েছে। ১৮৯০ সালের ১০ই অক্টোবরে লণ্ডন থেকে লেখা পত্রে মানুষের জীবনে প্রবৃত্তির স্থান সম্বন্ধে কবি বলছেন :

যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতিপদে বলে 'কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে'—তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়, প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের দোষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।

য়ুরোপীয় জীবনের প্রবল গতিবেগ যে বিশেষভাবে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বোঝা যাচ্ছে জীবন-বিধাতা যে আমাদের জীবনকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে একটা সুনিশ্চিত মঙ্গলের দিকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সে-বিশ্বাস কবির ভিতরে প্রবল। বলা বাহুল্য এটি ছিল তাঁর চার পাশের অত্যন্ত আপনার জনদের বিশ্বাস। কিন্তু সেই

বিশ্বাসে অল্প বয়সেই তিনি প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় আর কবির বাস্তব-দৃষ্টি দুইই লক্ষণীয়।

১৮৯১ সালের মাঘ মাসে কালীগ্রাম ও পতিসর থেকে লেখা কয়েকখানি পত্রে কবি আমাদের দেশের জল-স্থল-আকাশের উদার বিস্তার ও স্তব্ধতা, পৃথিবীর 'সুদূরব্যাপী বিষাদ', নিবিড়ভাবে অনুভব করছেন; তাঁর সেই অনুভূতি কবিতায় মোহন রূপ পেয়েছে, গদ্যেও তা তুল্যরূপে মনোহর হয়েছে :

> ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতল-ভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এই জন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এই জন্যে আমাদের পুরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে।...ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।...এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি।..

১২৯৭ সালের ২০ মাঘে সাজাদপুর থেকে লেখা চিঠিখানিতে কবি অকপটে ব্যক্ত করেছেন ভারিক্কি জমিদারী চাল তাঁর জন্য কিরূপ একটি প্রহসন :

> আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা,

এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে। অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরকার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর। এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।

জগতের দশজনের একজন বলে গণ্য হতে কবি সারাজীবন আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কবি খুব মিশুক প্রকৃতির ছিলেন না—চেষ্টা করেও তা হতে পারেন নি—বোধ হয় সেইজন্য আর দশজনেরই মতো একজন বলে গণ্য হবার আগ্রহ তাঁর ভিতরে এত প্রবল হয়েছিল। এর উপরে অবশ্য ছিল কবির জন্মগত নিবিড় মানবপ্রীতি—বিশ্বের সবকিছুর প্রতি প্রীতি।

১৮৯১ সালের ১৯ জুন ও ২০ জুন তারিখের চিঠি দুটিতে দেখা যাচ্ছে দুই দিনই বেশ কড়া ঝড় কবিকে ভোগ করতে হয়েছিল। প্রথম দিনের ঝড় তিনি কেমন উপভোগ করেছিলেন সে সম্বন্ধে লিখছেন :

> …একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল—কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড়বৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে।…বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কবি এখন পুরোপুরি সংসারীও, তাই এর পরে লিখছেন :

> শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

এর পরের কয়েকটি চিঠিতে কবির কয়েকটি ছোটগল্পের উৎপত্তি-সূত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

শিলাইদহ থেকে ১২৯৮ সালের ২০ আশ্বিন তারিখে লেখা চিঠিতে কবি তাঁর জীবনের সার্থকতার এই ছবি এঁকেছিলেন :

> পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়—পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমন মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়—এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশু খৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে—কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে ক'রে একে বিশ্বাস ক'রে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই

> যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

বলা বাহুল্য ঠিক এই মতই কবি চিরদিন পোষণ করেন নি।

শিলাইদহের জগতে একালের জটিলগ্রন্থি সাহিত্য কবির কাছে কেমন বেখাপ্পা বোধ হচ্ছে সেকথা প্রকাশ পেয়েছে কবির ১৮৯২ সালের ৮ এপ্রিলের পত্রে:

> এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্‌স্ অফ পলিটিক্স এবং প্রব্লেম্‌স্ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রইংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি, এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।…

প্রকৃতির অসীম শান্তি ও সৌন্দর্যের মধ্যে কবি যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন—কবির এই কালের কাব্যেও তাঁর এই আত্মনিমজ্জনের পরিচয় আছে—হয়ত তারই ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব অমন বীর্যবন্ত হতে পেরেছিল। প্রকৃতি অবশ্য কবির কাছে এক অসাধারণ জীবন্ত সত্তা—ভগবানের প্রতিচ্ছবি এ কথা কবি হয়ত বলবেন না, তিনি ঠিক অদ্বৈতবাদী নন, তবে সেই সত্তা কবির কাছে দিব্য-কিছু নিঃসন্দেহ। অবশ্য বাস্তব হয়েও দিব্য। এইখানেই কবির দৃষ্টির নূতনত্ব। মায়াবাদ তিনি বিসর্জন দিয়েছেন এই জন্যই।

১২৯৯ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠের চিঠিখানি খুব বিশিষ্ট। চিঠিখানি এই:

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্‌ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী একজন মানুষ—অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ—আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটে ছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়—একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ-ছ জনের স্থান থাকে না। আমার বিবেচনায়, যদি বেশ ভালো করে ধরাতে চাও, তা হলে বিশ্বসংসারে খুব অন্তরঙ্গ দুটি মাত্রকে ধরে—তার বেশি জায়গা নেই—তার অধিক লোক জোটাতে গেলেই. পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়—যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত করে দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।

এই ভাব কবির কবিতায় অনেক চরণে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন কবি 'ক্ষণিকা'য় বলেছেন :

> জান তো ভাই দুটি প্রাণীর বেশি
> এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।

অথবা

> ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
> আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

বলা যেতে পারে মানুষের সবচেয়ে সার্থক রূপ তার ধ্যানী রূপ—তার প্রেমিক রূপও ধ্যানী রূপ। মানুষের কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি যা হয় তা অনেকখানিই খণ্ডিত। সেই ধ্যানী রূপের মহিমার কথা কবি এখানে বলেছেন মনে হয়।

১২৯৯ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিখানিতে কবি ব্যক্ত করেছেন ছেলেবেলায় তাঁর মনটি তাঁর কন্যা বেলারই মতো অত্যন্ত কোমল ছিল আর তাই নিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে কত অস্বস্তিবোধ করতে হ'ত। তাঁর প্রকৃতির একটি অল্প-জানা দিকের পরিচয় এ থেকে আমরা পাচ্ছি :

আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতিসচেতন ছিলুম সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত ; বোধ হয় পিয়ের লটির মতো কেবলই বেদনা ও মৃত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সে বড়ো উৎপাত! তা ছাড়া, যে-সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোনো ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে ; তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।···মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন জ্যোতিদাদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বললে, 'আপনারা আমাকে গাড়িতে একটু স্থান দিতে পারেন? আমি পথের মধ্যে নেবে যাব।' জ্যোতিদাদা ভারী রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম—একে তো বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লজ্জিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু জ্যোতিদাদা যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারী লজ্জা করল—আমি অত্যন্ত কষ্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার ভ্রাতৃভক্তিতে খুব আঘাত লেগেছিল।

১২৯৯ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে কবি তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনা সম্বন্ধে তুলনা করেছেন :

একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস—একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না—একেবারে একটা বোঝাবিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি,

ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষিরাজ ঘোড়াটি নয়।

১২৯৯ সালের ৩২শে জ্যৈষ্ঠের পত্রে কবির মনের আর-এক উপভোগ্য রূপ ব্যক্ত হয়েছে :

এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!' বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীরমনকে অকালে জরাগ্রস্ত না ক'রে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি।···

কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালি। আমি কোণে ব'সে ব'সে খুঁৎখুঁৎ করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওলটাব একবার পালটাব—যেমন করে মাছ ভাজে—ফুটন্ত তেলে একবার এপিঠ চিড়্‌বিড়্ করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড়্‌বিড়্ করবে। যাক গে! যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।···

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন।···বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদ্‌বন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।

সৌন্দর্য কবির জীবনে যে কতখানি সেকথা ব্যক্ত হয়েছে কবির অনেক লেখাতেই। ১২৯৯ সালের ২রা আষাঢ়ের পত্রে তিনি লিখছেন :

সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত

হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।...যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।

কবির সৌন্দর্য-পাগল মনের একটা অপূর্ব ছবি আমরা এই চিঠিতে পাচ্ছি।

প্রতিদিনের জীবনের যে ছোটোখাটো কাজ তার মহিমার কথা ব্যক্ত হয়েছে কবির বহু লেখায়। ১৮৯২ সালের ১৬ই জুনের পত্রে সেকথাটি বলেছেন তিনি এইভাবে :

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না ব'লেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য—অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়—ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে

টিঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে নিজের কাজ অবহেলা করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এই জন্যেই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচৌড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে।

এর পর কবি বলছেন :

কবিত্বই বলো, বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁসফাঁস করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, ছোটো বড়ো সমস্ত কর্তব্যকে প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে বয়ে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর-কিছু হতে পারে না।

জগতের অনেক সাহিত্যকার শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতেই জীবনের চরিতার্থতা উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও যে তেমন ভাব মাঝে মাঝে ব্যক্ত না করেছেন তা নয়। তবে তিনি সেই মুষ্টিমেয় সাহিত্যকারদের অন্যতম যাঁরা শুধু বড় সাহিত্যস্রষ্টা নন, বড় কর্মীও। কর্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পরে পাব : কিন্তু এখন থেকে, অর্থাৎ তাঁর পূর্ণ সৌন্দর্য-উন্মাদনার কালেই, তাঁর বীণায় তার আগমনী বাজতে শুরু করেছে।

১৮৯২ সালের ২৭শে জুন তারিখে সাজাদপুর থেকে লেখা পত্রে এক ভয়ংকর ঝড়ের সূচনার অদ্ভুত বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল, আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টকটকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনি

পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত্র এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।

১৮৯২ সালের ২০শে জুলাই তারিখে শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে একটি বড় রকমের দুর্ঘটনার কথা আছে। কবির চলন্ত বোটের মাস্তুল কুষ্টিয়ার গড়ুই* ব্রিজে ঠেকে যায়—মাঝিরা মনে করেছিল পাল-তোলা বোট ব্রিজের নিচে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। এই বর্ষাকালে সেখানে নদীতে একটা আওড়েরও (আবর্তের) সৃষ্টি হয়েছিল—মাঝিরা আগে তা বুঝতে পারে নি। কাজেই অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কবির ও মাঝিদের জীবনসংশয় উপস্থিত হয়েছিল। একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে কবিকে তুলে নেয় আর চেষ্টাচরিত্র করে বোটটাকেও বাঁচায়। এই সংকট সম্বন্ধে কবি লিখছেন

আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছুমাত্র হাঁউমাউ করি নি, বুদ্ধি স্থির ছিল। মাস্তুলটা যে কিরকম ভীষণভাবে ভেঙে পড়বে তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলুম—মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিলুম তার কোনোটাই অসংগত হয় নি। উঃ! তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা কিরকম হত!

পরের দিনের চিঠিতে বর্ষার গোরাই ও পদ্মার এই বর্ণনা কবি দিয়েছেন :

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই—তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে-সমস্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেড়েক বাকি আছে মাত্র। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই ক্ষ্যাপা নদীর

* কবি 'গড়ুই' লিখেছেন। স্থানীয় ভাষায় গোরোই বলা হয়। সাধু ভাষায় গোরাই বলা হয়।

উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব! ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না—ভারী একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে—তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীব্র স্রোতে যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত, পদ্মার দ্রুতগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি তীব্র খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মতো বাঁধা—দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেছে।…এ সময় না হলে নদীর আনন্দ দেখা যায় না!

এই চিঠিরই শেষে মৃত্যু সম্পর্কে কবি লিখছেন :

মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌-ডোর নেবার এ রকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না…যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে—তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন—আমি আমার পাল তুলে চললুম—তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

কবির সুবিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতায় বসুন্ধরার প্রতি কবির একধরনের গূঢ় নাড়ীর যোগের কথা ব্যক্ত হয়েছে। সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে কবির অনেক পত্রেও, বিশেষ করে ১৮৯২ সালের ২০শে অগস্ট শিলাইদহ থেকে লেখা এই পত্রে :

ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্ ক্রুশো পৌলভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত—এখানকার রৌদ্রে আমার

> সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, তার সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে—এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান—এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব।

বিপুলা পৃথিবীর সঙ্গে এই গূঢ় যোগ কবিকে দিয়েছিল পৃথিবীরই মতো অপার যৌবন।

১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কটক থেকে লেখা পত্রে ব্যক্ত হয়েছে গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশবাসীদের কত ত্রুটি কবির চোখে পড়েছে আর সেজন্য তিনি কত দুঃখিত। আপনার জনের কাছে চিঠিতে ভিন্ন এত সহজভাবে তিনি হয়ত সেসব কথা লিখতেন না :

> এক-এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না ব'লে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না ব'লে—এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্যাদা দেখাতে পারছে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিংবা হীনতা অনুভব করে না। …আমি তো বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভালো।…পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে

পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা—যা-কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না—কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক্ বক্ করে বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্রব পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে,·· কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই—সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধ হয়। কী কথা থেকে কী কথা উঠল তার ঠিক নেই—কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ।

১৮৯৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কটক থেকে লেখা পত্রে দেখা যাচ্ছে সেখানকার কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল বাঙালী পদস্থ অফিসারের বাড়িতে ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে এদেশের জুরি প্রথা সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন: "এদেশের moral standard low, এখানকার লোকের life-এর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়।" এতে কবি অন্তরে অন্তরে এত অপমানিত বোধ করেছিলেন যে সমস্ত রাত্রি তাঁর ঘুম হয় নি। কবি লিখেছেন:

আমার যে কী রকম করছিল সে তোকে কী বলব! আমার বুকের

মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে এল, কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। ভেবে দেখ্ দেখি একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্ গে, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে, ঘেঁষে ঘেঁষে, যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিণ্ডের মতো আহ্লাদে টল্‌টল্ থল্‌থল্ করে দুলে ওঠে।

উদ্ধত ইংরেজদের লক্ষ্য করে কবি আরো লিখছেন :

যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যমি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায়—যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায় —তার পরে আর আমার কিসের গৌরব।

এর বহু বৎসর পরে কবি 'গোরা' লেখেন—তার সূচনা আমরা এখানে পাচ্ছি। জাতির আত্মসম্মান সম্বন্ধে কী গভীর বোধ! অথচ এই কবির বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে—তিনি স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসেন না, বিশ্বকে ভালবাসেন! কবির এই উগ্র স্বদেশ ও স্বজাতি -প্রেম কেমন করে পরিণতি লাভ করল নিবিড় বিশ্বাত্মীয়তায়, তা ভালো করে বুঝে দেখবার মতো।

এর পরের চিঠিখানিতে কবি সার্থক কাব্য রচনা সম্পর্কে বলছেন :

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল করে,

তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে ফুঁও আছে—কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়। কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলুম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগুন ধরে ওঠে নি।

—কিন্তু সেই ইংরেজ প্রিন্সিপালের কথাগুলো কবি ভুলতে পারছেন না :

কালকের সেই ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলি নি। অম্লান মুখে বললে কিনা sacredness of life সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই! যারা অ্যামেরিকার Red Indain-দের উচ্ছিন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ানদের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু-শিকারের মতো বিনা দোষে বিনা কারণে গুলি করে করে মারত; যারা আমাদের দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে? যা হোক, সে কথা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে?

ধর্ম-বক্তৃতাও যোগ্য লোকের যোগ্যভাবে দেওয়া উচিত, এই কথাটি কবি বেশ জোর দিয়ে বলেছেন ১৮৯৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে কটক থেকে লেখা পত্রে। ধর্ম-চর্চার ক্ষেত্রেও কবির দৃষ্টি আচার-পদ্ধতির দিকে আদৌ নয়, তাঁর দৃষ্টি মনের উৎকর্ষ লাভের দিকে :

…ভালো প্রসঙ্গ যদি কেউ ভালো করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকসান। তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়—অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত

অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। …বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়।

১৮৯৩ সালের ১০ই মে তারিখে শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে বোধ হয় প্রথম ব্যক্ত হয়েছে সোসিয়ালিস্ট্‌দের মতের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা :

আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনো-মতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্‌, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।

এর পরের দিনের পত্রে কবি বর্ণনা করেছেন তাঁর চারপাশের প্রকৃতির অপূর্ব রূপ আর তাঁর কোনো কোনো প্রজার অপূর্ব ভক্তি :

বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি; এই রকম সকাল

বেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে ; মনে হয়—

'নাই মোর পূর্বপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।'

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। প'ড়ে প'ড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছলছল করে আসে। এইমাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল—সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো!...

১৮৯৩ সালের ৪ জুলাই তারিখে শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে কবি বলছেন জগতে দুঃখ আছে যথার্থ এবং কেন সেই দুঃখ আছে তার হেতু খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু অস্তিত্বকে তিনি ভালবাসেন তাই সে দুঃখ সইতে তিনি প্রস্তুত।

কবির বহুমুখী প্রতিভার দায় ও দাবি তাঁর উপরে কেমন হয়েছে সে-কথাটি চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর ১৩০০ সালের ৩০ আষাঢ়ের সাজাদপুর থেকে লেখা পত্রে :

আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে—লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়—আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে

প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন—মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো দীর্ঘ দৌড়ে কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্যবিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্যকর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরী করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই পড়েছি! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি—কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে

গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

এই দীর্ঘ পত্রে কবি 'নীরব কবি' সম্বন্ধেও আপনার অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা ব'লে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দু'ই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনীশক্তি আছে—এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

ছন্দের বাঁধন ভাষায় কি বিশেষ কাজ করে সেটি কবির বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়েছে ১৮৯৩ সালের ১৩ অগস্টে পতিসর থেকে লেখা পত্রে :

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না—অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে

ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন্ এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেই-রূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ববিহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না।···কবিতায় ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে ব'লেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চের পতিসর থেকে লেখা পত্রে কবি ব্যক্ত করেছেন ফরাসী ভাবুক আমিয়েলের (১৮২১-১৮৮১) রচনা তাঁকে কতখানি আনন্দ দিচ্ছে। আমিয়েলের সঙ্গে বোধ হয় এখন থেকেই তাঁর বিশেষ পরিচয় আরম্ভ হয়। আমিয়েলের রচনার সঙ্গে মহর্ষির পরিচয় হয় ১৮৮৭ সালে—আমিয়েলের গ্রন্থখানি ইংরেজিতে প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই:

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে— আমি লো (কেনে)র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টেপাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক

আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই—সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়।

প্রকৃতি নামক বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন কি হচ্ছে তার হিসাব পাওয়া যেমন শক্ত মানুষের মনও তেমনি প্রকৃতির মতোই রহস্যময়—এইটিই কবির আলোচনার বিষয় হয়েছে ১৮৯৪ সালের ২৮ মার্চে পতিসর থেকে লেখা পত্রে :

চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে—হুহু শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব—বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব।...বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে ; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই

জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নীচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না, তাও কি ঠিক জানি? আমি সিম্‌প্যাথেটিক গ্র্যান্‌ড্‌ পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।

এর পরে 'চিত্রা'র অন্তর্যামী কবিতায়—এবং অন্যান্য অনেক কবিতায়ও—আমরা কবির এই ভাবের সাক্ষাৎ পাব। শরৎচন্দ্রও এই ধরনের কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর শ্রীকান্তর জবানীতে।

১৮৯৪ সালের ১০ জুলাই তারিখে সাজাদপুর থেকে লেখা পত্রে কবি বলছেন, যারা আমাদের অত্যন্ত আপনার জন, খুব পরিচিত, তাদেরও আমরা কত কম জানি। তার উপর যখন আমরা ভেবে দেখি যে আমাদের মধ্যে খুব বেশি পরিচয় হবার কোনো কথা নেই, কেননা আমাদের দুদিন পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তখন কোনো কোনো প্রকৃতিতে হয়ত বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় 'তবে আর কেন'। কিন্তু কবির ঠিক উল্টো ধারণা হয়। তিনি লিখছেন:

আমার আরও বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে, বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ—এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।...প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। তখন তোরা যে তোরা এবং আমি যে আমি—এবং আমি যে তোদের চেয়ে দেখছি এবং তোদের কথা শুনছি এবং তোদের আপন ভাবছি এবং তোরা আমাকে আপন ভাবছিস, অনন্তকালের মাঝখানে এই একটি আশ্চর্য ঘটনা নূতন করে বৃহৎ করে দেখতে পাই। এমন আশ্চর্য ঘটনা আবার কখনও হতে পারবে কি না কে জানে!

প্রতিভার কাজই হয়ত এই—অনেক-কিছুর উপর থেকে প্রাত্যহিকতার আবরণ উন্মোচিত করে দেখা।

১৮৯৪ সালের ২রা অগস্ট কলকাতা থেকে লেখা চিঠিতে কবি লিখছেন তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের সঙ্গ লাভ করে তাঁর কত উপকার হয়:

> প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়—তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি—সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি প'ড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভাবগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগ স্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংশ্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না—নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

বোঝা যাচ্ছে কবির সাহিত্যসাধনায় সাহিত্যাচার্য প্রিয়নাথ সেনের ভূমিকা কী গৌরবময় ছিল, আর কবিও সে বিষয়ে কত সচেতন ছিলেন। কিন্তু এঁদের দুইজনের সম্বন্ধ জীবনীকার প্রভাতবাবু যেন কিছু ভুল বুঝেছেন।*

* রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ১৯২-১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতির মধ্যে অহেতুক ধ্বংস যথেষ্ট। সেই অতিশয় দুর্বোধ্য ও বেদনাকর ব্যাপারের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কবির ১৮৯৪ সালের ৯ই অগস্ট (?) শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রের সূচনায় :

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে—তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কোন্‌-এক গ্রামের ধারের আমবাগানের আম্রশাখায় তাদের বাসা ছিল। তারা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে এসে পরস্পরের নরম নরম গরম ডানাগুলি একত্র করে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে ছিল; হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটুখানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নীচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে, গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে, নীড়চ্যুত পাখিগুলি হঠাৎ রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল—তার পরে আর জাগতে হল না। এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারী একটা আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালোবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যৎসামান্য।

এর পর ১২ই অগস্টের পত্রে কবি কতকটা দুঃখের সঙ্গে তুলনা করছেন গ্যেটের পরিবেশের সঙ্গে তাঁর নিজের পরিবেশের :

গেটের জীবনীটা তোর ভালো লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি—গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংশ্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মনিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল—হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্‌ট্‌ শিলার কাণ্ট প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি—আমরা

আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না ব'লে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি—তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক ব'লে একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম।...এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে—সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক—নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।

বোঝা যায় কবি তাঁর সাধনার ক্ষেত্রে কতটা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছিলেন। তবে এও সত্য যে বড় স্রষ্টারা চিরদিনই এমন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে এসেছেন।

এর পরের দিনের, অর্থাৎ ১৩ই অগস্টের, পত্রে কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর তুচ্ছ লেখার মূলেও যথেষ্ট যত্ন রয়েছে, আর তিনি অনুভব করেন, তাঁর লেখা যেন তাঁরই লেখা নয়, একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি যেন তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করছে:

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি—আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে। সম্প্রতি...ইংরাজি লেখা পড়েছিলুম—তার...লেখক...খ্যাতি-প্রাপ্ত একজন আর্টিস্ট্। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অনেক

অনৈক্য আছে, কিন্তু দুটি বিষয়ে আমাদের মিল দেখলুম। এক হচ্ছে এই চতুর্দিকের বাস্তবিক জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সৌন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা। অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়; কিন্তু যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিসটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক।

কবি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেন তাঁর সন্তান-স্নেহ তাঁর ভিতরে যেন হয়ে দাঁড়ায় উপাসনা:

…আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না—সে বিশ্বের সমস্ত মূল রহস্য মূল সৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি।

অনেক কবিই অনুভব করেছেন তাঁরা যেন এক উচ্চতর শক্তির হাতের

যন্ত্র। বোধ হয় এর কারণ, তাঁদের অতন্দ্রিত সাধনার ফলে ভিতরে ভিতরে তাঁদের মনের ক্ষমতা অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যায়, আর তাঁদের রচনায় বা অনুভবে সহসা তার পরিচয় পেয়ে তাঁরা বিস্মিত হন। কবির এই সব গুরুত্বপূর্ণ কথা তাঁর কোনো কোনো সমসাময়িকের মনে বিরূপতা উৎপাদন করেছিল। বলা বাহুল্য তাতে করে তাঁদের দুর্বলতারই পরিচয় তাঁরা দিয়েছিলেন।

১৯শে অগস্টের পত্রে কবি বৈদান্তিক মত সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, বলেছেন, তাঁর মন মোটের উপর বৈদান্তিক মতের প্রতি বিরূপ। তবে কখনো কখনো এর সমীচীনতা তিনি যেন ঈষৎ অনুভব করতে পারেন।

২৪শে অগস্ট নদীপথে চলতে চলতে কবি বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবছেন :

> আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে বোট ছুটে চলেছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে—এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব! খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে—প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দো-ঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়—এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলন-গাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্তবৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক সে রকম করে বৈষ্ণবপদ পড়ে না —বাইরে থেকে নিতান্ত সমালোচকভাবে দেখে' তারা প্রত্যেক লাইন প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র করে দেখে, সেইজন্যে অনেক দোষ দেখতে পায়।

প্রতিদিনের জীবন প্রতিদিনের আলো-বাতাসের স্পর্শ কবির জন্য কত সত্য, মায়া বা মোহ নয় আদৌ, তা অপূর্বভাবে ব্যক্ত হয়েছে ১৮৯৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বরের সাজাদপুর থেকে লেখা পত্রে। তার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

প্রতিদিনের শরৎকালের দুপুর বেলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়—পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে। …অনেক বোধশক্তি-বিহীন পাঠক আছে যারা নূতনকে কেবলমাত্র তার নূতনত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাবুকরা এই-সকল নূতনত্বের ফাঁকিকে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোনো কালেই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যখনি একটা জিনিস আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায়, তখনি তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নয়।… আমার পুনঃপুনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিস জীর্ণ হয় না; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই।

কাল্পনিকতা তাঁর রচনায় কিভাবে বাস্তবিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়ছে বৈ কমছে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে।…যারা নিজের জীবন দিয়ে এ-সব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অনুভব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে

আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দন্তের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি।

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখেই আর-একখানি পত্রে কবি লিখছেন ছড়ার জগতে ভ্রমণ করে তাঁর কত আনন্দ হচ্ছে। তিনি সেই আনন্দের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাও করছেন :

আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে, অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়—আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমার কাছে আসছে—প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।

এর পর আর্টে দুঃখের স্থান, বাস্তব জগৎ ও কাব্যজগৎ এই দুইয়ের পার্থক্য, এসব সম্বন্ধেও কবি আলোচনা করছেন :

সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতর-রূপে প্রতীয়মান হয়—এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখকষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই; কিন্তু বীভৎসকল্পনাজনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে-সকল বৃত্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়—মনে হয় যেন সেটা আর্টের

সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে ; ...কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বলতে পারি, উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল্‌ওয়ার্থ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না।

এর পর কবি বাস্তব জগৎ ও কাব্যজগৎ এই দুয়ের পার্থক্যের কথা তুলেছেন :

বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী ? তার কারণ হচ্ছে—বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারী জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিস জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক, তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, স্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্রভাবে অনুভব করবার অবসর পায় —কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত ; কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না—আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি।

দিঘপতিয়ার জলপথে ভ্রমণ করতে করতে কবির চোখে পড়ছে বর্ষায় গ্রামের অবস্থা কী শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে! অথচ আমাদের দেশের লোকদের তরফ থেকে তার কোনো প্রতিবাদ নেই :

আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে—তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে।...এ অঞ্চলের বর্ষায় গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ

দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে—এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত—এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।

উদার দিক্‌দিগন্তের আহ্বান আর গৃহের আহ্বান দুইই কবির জন্য কত প্রবল সেকথা ব্যক্ত হয়েছে কবির ২২শে সেপ্টেম্বরের পত্রে :

পুরীতে যেদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম—এক দিকে ধূসর বালি ধূ ধূ করছে, আর-এক দিকে গাঢ়নীল সমুদ্র এবং পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে—সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কী রকম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল—পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ছোটো বাড়ি তৈরী ক'রে প'ড়ে থাকি। এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জনশব্দ দূর স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগে। সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম। কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী

মুশকিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর—মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

বোয়ালিয়া থেকে লেখা ২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্রে কবি বলছেন মানুষের ক্ষণিক জীবন ও চিরজীবন এই দুইয়ের যোগাযোগের কথা :

আমি অনেক সময়ে ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতরে নিজের একটা বৃদ্ধি অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখদুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে। তুই বোধ হয় জানিস গাছের সবুজ পাতা সূর্যকিরণকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে কার্বন-নামক অঙ্গারপদার্থ-সঞ্চয়ের সাহায্য করে, যে কার্বন থাকাতে গাছ পোড়ালে আগুন হয়। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে—গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে—আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখদুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখদুঃখের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারে না—অথচ তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে। যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়, তার কার্বন-সঞ্চয়ও সামান্য। যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের অনুভব-শক্তি সুখদুঃখভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর।…যারা অনুভব-শক্তির জড়ত্ব-বশত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিকজীবনের সন্তোষসুখে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য—তারা সেটাকে কবিতার অলংকার বলে জ্ঞান করে, মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না।

২৪শে সেপ্টেম্বরের পত্রে কবি লিখছেন মানুষের সঙ্গ তাঁকে সাধারণতঃ কেমন পীড়া দেয়, অথচ ভিতরে ভিতরে তিনি যে সেই সঙ্গ কামনা করেন না তাও নয় :

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে—সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদ-প্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না—আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয় ; থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়—মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে—এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

কবির অন্তর্জীবনের বিকাশ তাঁর নিজের চেষ্টায় কেমন করে সম্ভবপর হয়েছে সে কথাটি কবি বলেছেন ২৫শে সেপ্টেম্বরের পত্রে :

ভেবে দেখ্‌, আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি। একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখদুঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিত্যনৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার

এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না—যেখানে দুঃখ দুঃখই নয় এবং সুখ একটা উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয় না—যেখানে আমরা সমস্ত ক্ষুদ্র নিয়মের অতীত, স্বাধীন।…আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার সৌন্দর্য আনন্দ আমার অন্তরের সেই নিগূঢ় আনন্দ-নিকেতনের দ্বার খুলে দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে দেয়, তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়—গানের সুরের দ্বারা গানের তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে।…যে-সমস্ত শুভ মুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি সেই মুহূর্তগুলিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য ক'রে ভবিষ্যতে পথপ্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে—সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে—নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে—অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।

কবির 'মালিনী' নাটকে সুপ্রিয় মালিনীকে বলছে :

পূর্ণকাম তুমি দেবী,
আপনার অন্তরের মহত্ত্বেরে সেবি
পেয়েছ অনন্ত শান্তি।

৫ই অক্টোবর কলিকাতা থেকে লেখা পত্রে কবি লিখছেন দুর্গাপূজার দেশ-ব্যাপী আনন্দ-উৎসবের কথা, আর তাতে তাঁর আনন্দ :

কাল দুর্গাপূজা আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা হয়েছে। ঘরে ঘরে

সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে (সুরেশ সমাজপতির) বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশেপাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দমাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক'রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়।...পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে: মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়—তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

এই বিষয়ে কবির কিছু ভিন্ন মত তাঁর 'পঞ্চভূতে' আমরা পেয়েছি, তাঁর আরো মতামত পরে পাব।

৭ই অক্টোবর কলকাতা থেকে লেখা পত্রে কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা পত্রে তাঁর মনের বিচিত্র ভাব যেমন সহজভাবে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কারো কাছে লেখা পত্রে হয় নি:

আমিও জানি (বব) তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যেরকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই,

ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না—তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। ···নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট তা ক'জন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? ক'জনই বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যেই তো আমি জীবনচরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস ব'লেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়।···তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে লেখা ২৪শে অক্টোবর তারিখের পত্রে কবি এই অদ্ভুত স্বীকারোক্তি করেছেন যে বিষয়-কর্মের নেশাও তাঁর ভিতরে অত্যন্ত প্রবল, এত প্রবল যে তিনি যদি ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান হতেন তবে সেই কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারতেন—সাহিত্যচর্চায় মন দেবার

কোনো আবশ্যক বোধ করতেন না। তিনি বলেছেন, এর কারণ যা বিশৃঙ্খল হয়ে আছে তার মধ্যে শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করার একটা মস্ত সুখ আছে।—কবির প্রতিভা যে কত সৃষ্টিধর্মী তার একটি অপূর্ব পরিচয় এই চিঠিখানির মধ্যে রয়েছে :

সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে যেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেঁড়া Letts' Diary নিয়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতুম তখন বোধহয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী, দুয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করার একটা মস্ত সুখ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়; সুবৃহৎ জমিদারি কার্যটাকেও ক্রমশ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসুখ লাভ করা যায়। আয় বাড়ছে ব'লে তো একটা সুখ থাকতেই পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুখ একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম—সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভব করতুম না। আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন, বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা, এতেই আমার সমস্ত মন অহর্নিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যিস আমি ব্যারিস্টার হয়ে আসি নি!

কিন্তু সত্যই কি এমনটি ঘটতে পারত? কবি গ্যেটে রাজমন্ত্রী হয়ে যৌবনে অনুভব করেছিলেন কাজই তাঁর স্বধর্ম, কবি-প্রতিভা তাঁর জন্য আকস্মিক। কিন্তু পরে ইতালিতে গিয়ে বুঝেছিলেন তাঁর স্বধর্ম কোন্‌টি।

কবি রবীন্দ্রনাথও স্বদেশী আন্দোলনে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই অশ্রান্ত কর্ম-উদ্দীপনার মধ্যেই লিখেছিলেন :

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

ভাব ও চিন্তা যাঁদের ভিতরে প্রবল তাঁরাও বড় কর্মী হতে পারেন—লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একজন বড় কর্মীও ছিলেন, শেখ সাদী তাঁর কালের একজন শ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক ছিলেন—কিন্তু সাধারণতঃ তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ হয় ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রেই।

২৫শে নভেম্বরে শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে কবি বলছেন বিশ্বজগতের ধ্বংসপ্রবণতা আর মানুষের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা এই দুয়ের দ্বন্দ্বের কথা :

আমার এক-এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি—একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর-একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে—তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না—এক সময় এক রকম ছিলুম আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনো রকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বেঁচে থাকব,' বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ—তাকে জয় করতেই হবে'—অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারে নি। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেই জন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক—বেঁচে থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারম্বার পরাভূত করছে।

এইজন্য লীলাবাদের কথা তাঁর কাব্যে থাকলেও লীলাবাদীর চাইতে বাস্তববাদী তিনি বেশি।—যা Conventional, চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত, সাহিত্য তাকে অতিক্রম করে যায়, আর তাতেই সার্থক হয়, এই কথা কবি বলেছেন ১৮৯৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি শিলাইদহ থেকে লেখা পত্রে :

মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন-অনুসারে তাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঠিক এক ভাবে চলতে হয়—আসলে তার ভিতরে যে-একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন ক'রে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-

চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ এমন বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে মানুষ যথার্থ আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ করে রাখে এবং ভাবরাজ্যে আপনাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। সেই জন্যে সাহিত্য Conventional হলে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; সেই জন্যে ড্রইংরুম-শিষ্টালাপে যে-সকল কথা উত্থাপন করা যায় না, সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা এবং উদারতা লাভ ক'রে অসংকোচে এবং সুন্দর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এমন-কি, ড্রইংরুম-চা-পান-সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে উদার বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

৭ই মার্চ তারিখে শিলাইদহ থেকে কবি যে পত্র লিখেছেন তাতে এক-জায়গায় এই অপূর্ব কথাটি আছে :

সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈ-বানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি (এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্য অন্য জীবসকল উপভোগ করে)।

এই চিঠিরই শেষের দিকে কবি লিখছেন :

কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি—এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

পরের দিনের পত্রে কবি লিখছেন চিঠির বিশেষ মূল্যের কথা :

পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। পোস্ট্ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখবৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর-একটা বন্ধন যোগ করে

দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা করে যতটা লাভ করি, আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস আছে—ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করে না। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পূরণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি হয়েছে। ...কথায় যে জিনিসটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিসটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়।

কলকাতা থেকে ১৫ই মার্চের পত্রে কবি লিখছেন আলস্য আর বসন্তের বাতাস কী নিবিড়ভাবে তিনি উপভোগ করছেন :

আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাতা ওল্‌টাচ্ছিলুম—মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফশিট্‌-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই—বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্তপ্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়—মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম,

> বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল—একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপূর অকর্মণ্যতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভালো গান শুনলেও তো পরিতাপ হত না। আমার পক্ষে এক-একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গানের কাজ করে। এই হাওয়া এবং আলো এবং ছোটোখাটো নানা প্রকার শব্দ আমাকে সর্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। তখন বেশ বুঝতে পারি কেবলমাত্র 'হওয়া'তেই একটা আনন্দ আছে—'আছি' এই কাণ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ। এই রকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

এই 'আলস্য' যে কত সৃষ্টিধর্মী সেকথা কবি নিজেই বলেছেন শেষের কটি ছত্রে। সৃষ্টিধর্মী চিত্ত যেন একটি তাজা গাছ—সব সময়ে সব অবস্থাতেই চলেছে তার বাড়।

কলকাতা থেকে ১৮ই মার্চের পত্রে কবি বলছেন আমাদের দেশে ভালো সমালোচনার অভাবের কথা আর তার প্রতিকারেরও কথা :

> আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই—তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোনটা নিত্য, কোন্‌টা সেন্টিমেণ্ট এবং কোন্‌টা সেন্টিমেণ্টালিজ্‌ম। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব।

কলকাতা থেকে লেখা ২০শে মার্চের পত্রে কবি বিশ্লেষণ করছেন শেলির অ-সাধারণ চরিত্র :

> শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়ো লোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস ? ওর চরিত্রে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি—ওর এক-রকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপে ভালো লাগে—তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি-দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজন-শক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়—সে জানেও না সে কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ সুখী করছে—তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার যো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার যো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা-মাত্রহীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে—কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনো জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খায় নি বলে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে।

এর পর কবি বলেছেন শেলির মতো চরিত্র আর মনঃপ্রধান চরিত্র এই দুয়ের পার্থক্যের কথা :

> যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা ক'রে কাজ করে, যারা জানে ভালোমন্দ কাকে বলে, তাদের সহজে ভালোবাসা ভারী শক্ত। তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা অনায়াস ভালোবাসা পায় না। তারা আত্মবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্মবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি তো আমার অনেক প্রবন্ধে লিখেছি মানুষের মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়

—আসল খাঁটি বড়ো লোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্য বলে আকর্ষণ করে নেয়।

এর সঙ্গে তুলনীয় কবি গ্যেটের এই উক্তি :

নেপোলিয়নের মতো অ-সাধারণ লোক নৈতিক গণ্ডীর বাইরে। তাঁদের কাজ প্রকৃতির মতো—আগুন জল প্রভৃতির মতো।

(কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ)

আর্টের ভিতরে খানিকটা সমাজনাশকতা আছে, সে কথা কবি বলেছেন কলকাতা থেকে লেখা ২রা মে-র পত্রে :

আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়—তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পারস্পেকটিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে।...ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজ-বন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্ মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়—সেই জন্যে আর্ট্ মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে—সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে—সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

কবি যাকে বলেছেন আর্টের সমাজনাশকতা তারই ভিতর দিয়ে ঘটে সমাজের বোধের সম্প্রসারণ। এই হিসাবে আর্ট সমাজ-মনের এক বড় পথিকৃৎ। তবে আর্টের নামে অনেক অসার্থক ব্যাপারও যে প্রশ্রয় পায় তা

মিথ্যা নয়। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে কোন্‌টি সার্থক আর কোন্‌টি অসার্থক তা বিচার করা অনেক সময়ে বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

আকাশ ও আলো কবির কত প্রিয় সেকথা কবি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বহু পত্রে। সাজাদপুর থেকে লেখা ২রা জুলাইয়ের পত্রে তাঁর আকাশ-আলো-প্রীতি একটি উচ্চাঙ্গের কবিতা হয়ে উঠেছে :

> এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়—অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ-সিংহাসন। এই আকাশের মধ্যে আমি একটি সুগভীর নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গ ভালোবাসা এবং অনন্ত শান্তিরসপূর্ণ সান্ত্বনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সর্বাঙ্গে এবং সর্বমনে অনুভব করি। এই আকাশের ভাণ্ডার, এই আলোক, এই শান্তি কখনো ফুরোবে না—আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না।

সৌভাগ্যক্রমে এই যোগ কবির জন্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

জীবনে মৃত্যুর বিরাট অর্থের কথা কবি ব্যক্ত করেছেন কলকাতা থেকে লেখা ২০শে জুলাইয়ের পত্রে :

> বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality—তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতা-সম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। বস্তুজগৎ যদি অটল কঠিন প্রাচীরে

আমাদের ঘিরে রেখে দিত, এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত তা হলে আমরা যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে।…ভালো কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্ছে তার Suggestiveness। জগৎ-রচনার মধ্যে সেই Suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে—সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি যে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই পৃথিবীই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে—তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি; যদি মৃত্যু না থাকত তা হলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সুকঠিন ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম; মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান, পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান, তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না।

সাধনা উত্তরোত্তর কবিকে খ্যাতিমান করছিল। খ্যাতি সম্পর্কে কলকাতা থেকে লেখা ৩ অগস্টের পত্রে কবি লিখছেন :

লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতায়ও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে। প্রথম উচ্ছ্বাসের পরেই সমস্ত শূন্য এবং মিথ্যা মনে হয়—মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকা উচিত, এই জিনিসটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মতো না দাঁড়িয়ে যায় সেজন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।…সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি খ্যাতি জিনিসটা ভালো নয়—ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

কাজ যে মানুষের জীবনে কতখানি সে সম্বন্ধে কবির নতুন বোধ ব্যক্ত হয়েছে তাঁর শিলাইদহ থেকে লেখা ১৪ই অগস্টের পত্রে :

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিসটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।...মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কষ্ট হল—কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে।...যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে—কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে—অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নীচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশিলা বহে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রীজ বেঁধে লক্ষ-লোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহু শব্দে চলে যায়—নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।

কোনো লেখা আরম্ভ করার বেলায় প্রথমে কবি কেমন অনাগ্রহ বোধ করেন সে কথা তিনি বলেছেন তাঁর শিলাইদহ থেকে লেখা ২১ সেপ্টেম্বরের পত্রে:

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো

একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। মন বলে, 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল—এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' আমি তাকে বলি, 'ঐ কথা তো তুমি বরাবর বলছ, কিন্তু লিখতেও তো কসুর করো না।' আমার মন একশ্রেণীর ঘোড়ার মতো যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাথি ছুঁড়ে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে-কেটে বাপুবাছা ব'লে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে।···লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শিলাইদহ থেকে লেখা ৪ অক্টোবরের পত্রে দেখা যাচ্ছে কবি উপলব্ধি করছেন তাঁর জীবনের অন্তস্তলে একটা নতুন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে :

আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে—কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু—আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য—সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিস হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সুখে থাকতুম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত, তা হলে এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম—কী বা জানতুম!

এই নতুন চেতনার উন্মেষ সম্বন্ধে কবি আরো বিস্তৃতভাবে বলছেন কুষ্টিয়া থেকে লেখা ৫ই অক্টোবরের পত্রে :

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে। জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করেছি—সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে, এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়—উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়। নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। Goethe-র একটি কথা আমি মনে রেখে দিয়েছি—সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—

Entbehren sollst du, sollst entbehren
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়—বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালো-রকমে পাওয়া যায়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অল্পকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটোখাটো সুখসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

এই নতুন চেতনার জন্য কবি প্রস্তুত ছিলেন না :

কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান—শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সব-শেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া-রকম অনুভব পাই। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে—যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্‌ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। আর কাউকে তা ঠিক বোঝানো যাবে না, এবং বোঝাবার দরকারও নেই—তারা তার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ করলেও বিকৃত করে ফেলবে—কিন্তু সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়—তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

কবির এই চিঠিখানি খুব বিখ্যাত। তাঁর এই নতুন চেতনার পরিচয় এখন থেকে তাঁর গদ্য পদ্য সব লেখাতেই মাঝে মাঝে আমরা পাব। একটি বিশিষ্ট নবজন্মের পরিচয় রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে রয়েছে এটি সে-সাহিত্যের উচ্চ মর্যাদার এক হেতু।

ইংরেজ কবিদের মধ্যে কীট্‌সের সঙ্গে কবি যে সবচাইতে বেশি আত্মীয়তা অনুভব করেছিলেন সে কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর শিলাইদহ থেকে লেখা ১৪ই ডিসেম্বরের পত্রে। টেনিসন, সুইনবরূন, এঁদেরও রচনা সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্প দিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সময় পেয়েছিল।...কীট্‌সের ভাষার

মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে—যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন স্থইন্‌বর্‌ন প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরেখোদা ভাব আছে—তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষরকরা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং স্থতীব্র হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্‌সের লেখায় কবি-হৃদয়ের স্বাভাবিক স্থগভীর আনন্দ তার রচনার কলা-নৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি; কিন্তু একটি অকৃত্রিম স্থন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে।

ছোটগল্পে, পঞ্চভূতে আর ছিন্নপত্রাবলীতে রবীন্দ্র-মানসের একটা অপূর্ব উৎকর্ষের পরিচয় আমরা পেলাম। সেই মানস সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা পরে আমরা করবো।

এইবার তাঁর সাধনার যুগের 'চিত্রা' কাব্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক।

চিত্রা

সোনার তরীর শেষ কবিতাটি রচিত হয় ১৩০০ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণে। তার পরের দুই বৎসরের কবিতাগুলো চিত্রায় সংগৃহীত হয়। চিত্রা প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালের ফাল্গুনে।

চিত্রার প্রথম কবিতাটির রচনার তারিখ ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল। ভূমিকা হিসাবেই এটি গ্রন্থের সূচনায় স্থান পেয়েছে। চিত্রার বা চিত্রার

মুখ্য ভাবধারার আরো দুইটি ভূমিকা কবি লেখেন—সে দুইটি অবশ্য গদ্যে। প্রথমটি ১৩১১ সালে, 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য, দ্বিতীয়টি ১৩৪৭ সালে তাঁর রচনাবলী সংস্করণের জন্য। দুটি ভূমিকাই তাঁর রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর দুটি-ই যত্ন করে পড়া দরকার।*

প্রথম ভূমিকাটি দীর্ঘ—অন্তর্যামী কবিতাটির আলোচনাকালে তা থেকে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করব। আমরা ছিন্নপত্রাবলীতে দেখেছি, কবির ভিতরে এই চেতনা জেগেছে যে তাঁর লেখা যেন তাঁরই লেখা নয়, একটা জগৎ-ব্যাপ্ত শক্তি যেন তাঁর ভিতর দিয়ে কাজ করছে। ১৩১১ সালে কবি যে ভূমিকাটি লেখেন তাতেও এই কথাই তিনি বলেন কিছু বিস্তৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে। কিন্তু ১৩৪৭ সালে যে ভূমিকাটি তিনি লেখেন তাতে এই কথাটির উপরে জোর দেন যে এই শক্তি ভগবান বলতে যা বোঝায় তা নয়, এই শক্তিতে কবির ব্যক্তিত্বেরই এক বিশেষ পরিচয়। এর ভিতরে মিলিত হয়েছে তাঁর দুই সত্তা—তার একটির ভিতরে রয়েছে তাঁর অন্তরে যে পূর্ণতার অনুশাসন রয়েছে তার প্রেরণা, অপর সত্তাটি জগতের বিচিত্র রূপ নিয়ে ব্যস্ত, সেই সব রূপকে একান্ত করে দেখা তার স্বভাব। কবি লক্ষ্য করেছেন, অন্তরের পূর্ণতার অনুশাসন, আর বাইরের বিচিত্র রূপের আকর্ষণ, এই দুইয়ের ভিতরকার এমন বিরোধ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যেও দেখা গেছে—সেই বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটে নি বলে সৃষ্টিতে বার বার বিরাট রকমের ধ্বংস ঘটেছে। একালে তেমন বিরোধ ভীষণাকার ধারণ করেছে মানবের সভ্যতায়।

কবির ১৩১১ সালের ভূমিকা আর তাঁর ১৩৪৭ সালের ভূমিকা এই দুইয়ের মধ্যে যে কিছু পার্থক্য রয়েছে তা আমরা পরে দেখব।

১৩১১ সালের ভূমিকা চিত্রা কাব্যের অনেকটা সমসাময়িক বলে এই কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে সেইটিই আমরা অগ্রগণ্য বিবেচনা করি। ১৩৪৭ সালের ব্যাখ্যায় মানুষের জীবনের ভিতরকার বিরোধের কথা কবি যা বলেছেন সেটি খুব মনে রাখবার মতো। বাস্তবিক ভাববার মতো এই কথা

* জীবনদেবতা সম্পর্কে কবির আরও কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আছে। যথাস্থানে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে মহৎ পরিণতি ঘটল তা নাও ঘটতে পারত, অন্তত, অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিভায় তেমন বাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে নি। কবি এর জন্য যে প্রস্তুত ছিলেন তাও নয়।

তবে এও সত্য যে কবি নিজের জীবনের সুন্দর ও মহৎ মুহূর্তগুলি লালন করে এসেছেন—তাঁর ছিন্নপত্রাবলীতে তার উল্লেখ রয়েছে—সেটি তাঁর এমন সৌভাগ্যের একটি বড় কারণ। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে কবির প্রয়াস চলেছিল এক মহৎ সার্থকতা লাভের পথে।

আমাদের পূর্বের সেই লেখাটিতে কবির জীবনদেবতাকে আমরা বলেছিলাম কবির প্রতিভা। সেই অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাখ্যাটি আজও আমরা পরিত্যাজ্য জ্ঞান করি না, কেননা, 'নবনবোন্মেষশালিনী', 'অঘটনঘটনপটীয়সী', এই সব প্রতিভার সুপরিচিত বিশেষণ। বাস্তবিক কবি তাঁর চেতনার ও শক্তির এমন 'নবনবোন্মেষ' দেখে এক গভীর আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন—সেই গভীর আনন্দ ও বিস্ময় এই কাব্যের, বিশেষ করে এর 'জীবনদেবতা'র ভাবে অনুপ্রাণিত কবিতাগুলোর, প্রধান রস—অন্তত কবির জীবনের এই স্তরে। (নৈবেদ্যের সময় থেকে অথবা তার পরে তাঁর জীবনদেবতার বা প্রতিভার কিছু ভিন্ন রূপ আমরা দেখব।)

কবি গ্যেটেও নিজের ভিতরে এক প্রবল রহস্যময় শক্তির প্রভাব অনুভব করতেন—তাকে তিনি বলেছেন দানব-স্বভাবের (demoniac)।

রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন:

দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।

অথবা

কর্ণ ধরে বসেছে তার যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।

বড় প্রতিভার কাজ বাস্তবিকই এমন অচিন্তিতপূর্ব—দানোয় পাওয়ার মতো।

চিত্রার প্রথম কবিতাটি যে উক্ত কাব্যের ভূমিকাস্থানীয় সে কথা বলা হয়েছে। চিত্রা, অর্থাৎ জগতের বিচিত্রমূর্তি সৌন্দর্য, তারই রূপ খুব সংক্ষেপে কবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন এই কবিতায়। বিশ্বজগতে সেই সৌন্দর্য কত রঙে কত ধ্বনিতে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে শূন্যে

জলেস্থলে যে প্রকাশ পাচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। সৌন্দর্যের সেই বিচিত্র মূর্তি কবির নানা রচনায় স্বভাবতই ধরা পড়েছে।

কিন্তু এই সৌন্দর্য বাইরে বিচিত্র হলেও কবির অন্তরে 'একা একাকী' হয়ে দেখা দিয়েছে—দেশকালের বোধ তাতে যেন তলিয়ে গেছে, শুধু আছে সেই সৌন্দর্যমূর্তি আর তার পরম ভক্ত, তাতে একান্তসমর্পিতচিত্ত, কবি। কবির সত্তাও যেন সেই সৌন্দর্যমূর্তিতে বিলীন হয়ে গেছে।

কবির এই সৌন্দর্য-উপলব্ধিকে কেউ কেউ যোগী প্রভৃতির মরমী উপলব্ধির মতো ব্যাপার জ্ঞান করেছেন। কিন্তু কবির উপলব্ধি খুব নিবিড় হলেও মরমী উপলব্ধি বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ বিশ্ব অন্তর্হিত হয়ে গেছে, আছে শুধু একক দেবতা, পুরোপুরি সেই ভাবটি যে নয় 'ছিন্নপত্রাবলী'তে তার বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি। পদ্মাবক্ষে, শান্তিনিকেতনে, কলকাতার গঙ্গাতীরে, সমুদ্রবক্ষে, সর্বত্র এই একক সৌন্দর্যের অপূর্ব রূপ কবি নিরীক্ষণ করেছেন। সেই সৌন্দর্যের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হয়েছে তাঁর সমস্ত মন; তবু যাকে বলা হয় সম্বিৎহারা, তা তিনি হন নি—দেশকালের জ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় নি। অর্থাৎ, কবি তাঁর পার্থিব সত্তা নিয়ে, 'দুইটি নয়ন মেলে', পৃথিবীর উপরেই প্রত্যক্ষ করেছেন সৌন্দর্যের এক দিব্য রূপ। অপরূপকে দেখার কবির এই নিজস্ব ভঙ্গি খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর বলাকার একটি কবিতার এই কটি ছত্রেও:

যে কথা বলিতে চাই
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

চিত্রার অনেক কবিতায় সৌন্দর্যের বিচিত্র রূপ আর তার প্রবল একক রূপ দুই-ই আমরা দেখব।

চিত্রার দ্বিতীয় কবিতাটি—'সুখ'—১২৯৯ সালের চৈত্রে লেখা। অর্থাৎ 'সোনার তরী'র যুগে। কিন্তু চিত্রার কবিতাগুলোর সঙ্গে এটির মিল বেশি বলে এটি চিত্রার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমাদের সেই পুরোনো আলোচনাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলোতে প্রধানত তাঁর প্রতিভার দুই রূপ আমরা দেখেছিলাম—রহস্যময় বংশীবাদকের রূপ, আর সমাহিতচিত্ত দ্রষ্টার রূপ। (কবি এই দুই রূপের নাম দিয়েছেন ছবি ও গান।) বলা বাহুল্য এই দুই রূপের বিচিত্র মিশ্রণও তাঁর কবিতায় ঘটেছে; তবে মোটামুটিভাবে এই দুই রূপে তাঁর কবিতাগুলো দেখা যেতে পারে। মোটের উপর চিত্রাতে কবির দ্রষ্টার রূপ বেশি ফুটেছে। এই 'সুখ' কবিতাটিতে কবির শান্ত দ্রষ্টার রূপটি খুবই স্পষ্ট—মেঘমুক্ত দিনে যে একটি সহজ প্রসন্নতা কবি সর্বত্র দেখছেন, সহজ ভাষায় ও ভঙ্গিতে তা চমৎকার ধরা পড়েছে। এই সৌন্দর্য কবিকে গভীর আনন্দ দিয়েছে। তিনি এই সহজ সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন 'কাননের প্রস্ফুটিত ফুল', 'শিশু-আননের হাসি', এসবের সঙ্গে।

মোহিতবাবু এই কবিতাটিকে বলেছেন বাংলা ভাষায় একটি খাঁটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় কবিতা। ঠিকই বলেছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্‌, এঁদের শ্রেষ্ঠ ভাব ও ভঙ্গি কবি আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন; অথবা, সহজ ভাবে সে-সব তাঁতে দেখা দিয়েছিল। সে-সবের সঙ্গে অবশ্য ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল তাঁর পরম আদরের বৈষ্ণব মাধুরী। আর কালে কালে তাঁর জীবন-সাধনা এই বিখ্যাত কবিদের চাইতে অনেক ব্যাপক হয়। সেজন্য রবীন্দ্র-প্রতিভা যথার্থত তুলনীয় মহাকবি গ্যেটের প্রতিভার সঙ্গেই।

তৃতীয় কবিতা 'জ্যোৎস্না রাত্রে'। কিন্তু জ্যোৎস্নার মৌন শান্ত অসীমতা কবি যতটা উপলব্ধি করছেন তার চাইতে বেশি পরিচয় দিচ্ছেন সৌন্দর্যের দিব্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করবার জন্য তিনি যে 'অনন্ত তৃষ্ণায় কাতর' সেই ভাবটি।—বিশ্বসৌন্দর্যকে বা বিশ্বরহস্যকে নিঃশেষে বুঝবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কখনো কখনো কবির মনে জেগেছে। বলা বাহুল্য এরূপ মনোভাব থেকে উৎকৃষ্ট কবিতার সৃষ্টি প্রায়ই হয় না। কবির বিক্ষুব্ধ মানসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু সেই বিক্ষোভ রূপ-রেখায় তেমন মূর্তি ধরে ওঠে নি—যতটা উঠেছে তাতে কবির বিক্ষোভ সর্বমানবের বিক্ষোভ কতটা, অথবা সর্বমানবের মনোযোগ তা কতটা আকর্ষণ করার যোগ্য, তা বোঝা যাচ্ছে না।

চতুর্থ কবিতা 'প্রেমের অভিষেক'। এটি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> এর প্রথম যে পাঠ লিখেছিলুম, তাতে কেরানি-জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুণ্ঠিত কলমে আঁকা, পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেটা তুলে দিয়েছিলুম।

এই কবিতার সেই বর্জিত লাইনগুলো গ্রন্থপরিচয়ে উদ্ধৃত হয়েছে।

কবির বন্ধু লোকেন পালিত কবিতাটির সেই পাঠে আপত্তি করেছিলেন এই সব কারণে :

> কোনও আফিস বিশেষের কেরানি বিশেষের সহিত জড়িত না করিয়া সাধারণভাবে, আত্মহৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস সহকারে ব্যক্ত করিলে প্রেমের মহিমা ঢের বেশি সরল উজ্জ্বল উদার এবং বিশুদ্ধ ভাবে দেখানো হয়—সাহেবের দ্বারা অপমানিত অভিমান-ক্ষুণ্ণ নিরুপায় কেরানির মুখে এ কথাগুলো যেন কিছু অধিকমাত্রায় আড়ম্বর ও আস্ফালনের মত শুনায়—উহার সহজ স্বতপ্রবাহিত সর্ববিস্মৃত কবিত্বরসটি থাকে না— মনে হয়, সে মুখে যতই বড়াই করুক-না কেন আপনার ক্ষুদ্রতা এবং অপমান কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না।*

পালিত মহাশয়ের যুক্তির প্রথম অংশ গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, 'সাধারণে'র চাইতে 'বিশেষ' কবিতাকে বেশি সার্থক রূপ দিতে পারে। কিন্তু তাঁর যুক্তির শেষের অংশটি গ্রহণযোগ্য, আর সেইজন্য কেরানি-জীবনের কিছু-বেশি-উঁচুগলার অভিযোগ বাদ পড়ায় কবিতাটির তেমন ক্ষতি হয় নি। কেরানি-জীবনের কিছু পরিচয় প্রচলিত পাঠেও রয়েছে :

> হেথা আমি কেহ নহি,
> সহস্রের মাঝে একজন—সদা বহি
> সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
> কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
> সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
> প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্মাধীন
> মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
> কী কারণে।

* রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কেরানির বা কেরানির স্থলাভিষিক্ত কবির প্রিয়াকে মোহিতবাবু জ্ঞান করেছেন 'নিখিলের কাব্যলক্ষ্মী' বা সেই জাতীয় কিছু। সেই ভাবটি যে এই 'প্রিয়া'য় একেবারেই নেই তা নয়। কিন্তু কেরানির বা কেরানিরূপী কবির 'প্রিয়া'র বিশেষ রূপটির সঙ্গে যুক্ত সেই 'নিখিল কাব্যলক্ষ্মী'র রূপ। 'সাধারণ' আর 'বিশেষ' এই দুয়ের উৎকৃষ্ট যোগ ভিন্ন সার্থক কবিতা হয় না।

পঞ্চম কবিতাটি 'সন্ধ্যা'। সমস্ত দিনের বিচিত্র কর্মব্যস্ততার পরে সন্ধ্যার শান্তি কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই শান্তির পরিবেষ্টনে কবি অনুভব করছেন তাঁর নিজের অন্তরাত্মার শান্তি লাভের প্রয়োজনের কথা—

আজি এই শুভক্ষণে
শান্ত মনে, সন্ধি করো অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কবির মনে পড়ছে কত অবস্থার ভিতর দিয়ে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কবি অনুভব করছেন নিঃসঙ্গিনী বিশাল ধরণীর অন্তর থেকে এই একটি ব্যথিত প্রশ্ন ক্লিষ্ট ক্লান্ত স্বরে শূন্যপানে উঠছে—কোথায় তার পরিণতি, আরও কত দূরে তাকে যেতে হবে।

বলা বাহুল্য এই ক্লিষ্ট-ক্লান্ত প্রশ্ন কবির নিজেরই অন্তরাত্মার।

এই কবিতাটি লেখা হয় ১৩০০ সালে ৯ই ফাল্গুনে। এর পরের কবিতাটি 'এবার ফিরাও মোরে'—লেখা হয় ২৩শে ফাল্গুনে। সেই কবিতাটিতে কবির যে একটি নতুন চেতনা পরিব্যক্ত হয়েছে এই 'সন্ধ্যা' কবিতাটিতে যেন তারই কিঞ্চিৎ বেদনাময় পূর্বাভাস।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিকে আমাদের সেই পুরোনো লেখায় বলেছিলাম কবির প্রতিভা-নির্ঝরের দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গ। অবশ্য এর পূর্বেই আমরা অনেকগুলো কবিতায় লক্ষ্য করেছি, একটা মহত্তর সার্থকতা লাভের জন্য, মানুষের বৃহত্তর জীবনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য কবির ভিতরে একটা আকুলতা, তাঁর আত্মায় আত্মায় একটা ক্রন্দন, ধ্বনিত হচ্ছে। সেই আকুলতা, সেই ক্রন্দন, খুব একটা স্পষ্ট রূপ নিয়ে ব্যক্ত হয়েছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়।

এই কবিতাটিতে আরও বিশেষ লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই যে কবি শুধু দুঃস্থ ও অত্যাচারিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার সংকল্প গ্রহণ করেই

শান্তি পাচ্ছেন না—তাঁর অন্তরাত্মা ধাবিত হয়েছে আরও কিছুর দিকে। সেই আরও-কিছু কি? সহজেই মনে হতে পারে এই আরও-কিছু ভগবান। কিন্তু কবি বলছেন :

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী, যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে—
অন্তর-প্রদীপখানি।

কবি এ পর্যন্ত ব্রহ্ম-সংগীত অনেক লিখেছেন। সে-সব সংগীতে তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল এ কথা মনে করবার কারণ নেই। তাঁর কয়েকটি ব্রহ্মসংগাতের জন্য পিতার কাছ থেকে তিনি পুরস্কার লাভ করেন তা আমরা জানি। এসব ভিন্ন অন্যান্য কবিতায়ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তবু বলা যায়, সেই সব সংগীতের ও কবিতার ভিতরকার ব্রহ্ম বা ভগবান প্রধানত পরম্পরাগত ধারণা। পরম্পরাগত ধারণাও কখনো কখনো অনুভূতি-সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু সেই ব্রহ্ম বা ভগবান কবির নিজস্ব-কিছু যে হয়ে ওঠে নি তা সত্য—কবি নিজেও সে কথা ছিন্নপত্রাবলীতে বলেছেন। কিন্তু আজ তাঁর ভিতরে এক মহা-অজানার উদ্দেশ্যে এক অতিশয় প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—কবি সেই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের বহু বরেণ্যের অন্তরে—সেই আকাঙ্ক্ষার প্রভাবাধীন হয়ে দুঃখ ক্ষতি মৃত্যু সব তাঁরা অকাতরচিত্তে বরণ করতে পেরেছিলেন।

তাহলে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি ফিরতে চাচ্ছেন তাঁর যে এতদিনের সাহিত্য ও সৌন্দর্য-চর্চার ভাববিভোর জীবন তা থেকে একটা মহত্তর জীবন-সাধনার দিকে। সেই মহত্তর জীবন-সাধনার দুই রূপ—দুঃস্থ ও নির্যাতিতদের সেবা, আর একটা মহত্তর জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।

কবির সেই মহত্তর জীবন-চেতনা যাঁর দিকে অথবা যাঁকে কেন্দ্র করে উচ্ছলিত হয়েছে তাঁকে তিনি বলেছেন বিশ্বপ্রিয়া :

সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,

সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে-মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।

এই বিশ্বপ্রিয়া প্রকৃতই ভগবান—যুগে যুগে মানব-জীবনে মহৎ-প্রেরণা-দাতা প্রবলপ্রতাপান্বিত দেবতা, ঠিক কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নন। ভারতবর্ষে সাধারণত ঈশ্বরকে প্রিয়া-ভাবে সাধনা করা হয় নি, তাঁকে পরমমোহিনী পরমপ্রিয়া এসব রূপে দেখেছেন প্রধানত সুফীরা। রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে 'পরমপ্রিয়া' রূপে, 'মোহিনী' 'ছলনাময়ী' এই সব রূপে, কখনো কখনো দেখেছেন। একটা মহত্তর জীবনের দিকে কবি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছেন বলে সেই আকর্ষণ যাঁর তরফ থেকে এসেছে তাঁকে তিনি ভেবেছেন পরম-আকর্ষণ-স্থল বিশ্বপ্রিয়া। সুফীশিরোমণি হাফেজ ছিলেন মহর্ষির একান্ত প্রিয়,—সেই সূত্রে বিশ্বপ্রিয়া ভাবটির দিকে কবির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।*

মহাবিশ্বজীবনের দিকে একটা প্রবল ও মরমী আকর্ষণ এর পরে মালিনী নাটিকায়ও আমরা দেখব।

এই কবিতাটির শেষে কবি বলেছেন :

হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

অর্থাৎ বিশ্বপ্রিয়ার বা ঈশ্বরের প্রসন্নতা যদি কবির লাভ হয় তবে তাঁর 'সর্বপ্রেমতৃষা', সকল আকাঙ্ক্ষা, সকল গ্লানি, দূর হয়ে যাবে। কবি এখানে ভক্তের পরিচিত ভাষায় কথা বলেছেন। তার কারণ, এ সময়ে এ বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। পরে আমরা দেখব ভক্তির সাধনায় বহু কাল কাটিয়ে কবি কিছু ভিন্নভাবে কথা বলছেন।

কিন্তু এখন থেকে তাঁর ঈশ্বর-চেতনা বা ধর্ম-চেতনার কালই বিশেষভাবে

* হাফিজের একটি সুপরিচিত গজলের দুটি চরণ এই :
প্রভু, কবে আমাদের এই কামনা পূর্ণ হবে—
আমাদের তদ্গত চিত্ত আর তোমার আলুলায়িত কুন্তল এই দুয়ের মিলন।

শুরু হ'ল। অবশ্য এর পরেও সাধারণ সাহিত্যিক ভাব-কল্পনা কবির ভিতরে যে আমরা না দেখব তা নয়। কিন্তু ক্রমেই তিনি যে একটা নতুন গভীর অনুভূতির ভিতরে, ত্যাগ-বৈরাগ্য বলতে বা বোঝায় সেই ধরনের ব্যাপারের মধ্যে ডুবছেন তার পরিচয় আমরা পাব। ছিন্নপত্রাবলীর শেষের দিকেও আমরা দেখেছি, কবি বুঝেছেন তাঁর জীবনে এমন একটা পরিবর্তন এসেছে।

তাহলে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় প্রকৃতই আমরা দেখছি কবির ঈশ্বর অভিমুখে যাত্রা—অবশ্য সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে নয়। সেই অনেকটা মরমী চেতনার সূচনা এই কবিতার বিশেষ কথা—বিশেষ রস—দুঃস্থ ও নির্যাতিত-দের সেবা তার সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্র-সাধনায় ঈশ্বর-প্রেম আর মানব-প্রেম নিত্যযুক্ত—আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রধানদের সাধনাও তাই ছিল। কবির প্রৌঢ়কালে ঈশ্বর-প্রেম মোটের উপরে কিছু বেশি তীব্রতা লাভ করে; কিন্তু তাঁর জীবনের শেষের দিকে দেখা যায়, সেই তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে।

এই কবিতাটি মোহিতবাবু খুব ভুল বুঝেছেন। বোধ হয় তার বড় কারণ—তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনা বা ধর্মসাধনা বুঝতে চান নি, তাঁকে দেখেছেন শিল্পীরূপেই। বোঝা অবশ্য কঠিন। ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে একটি সাহিত্য-সভায় কবি একবার বলেছিলেন, তাঁকে বুঝবার পথে তিনি নিজেই বড় বাধার সৃষ্টি করেছেন, কেননা তিনি ধর্মের কথা বলেছেন আবার রঙ্গমঞ্চে নেচেওছেন।

সপ্তম কবিতা 'স্নেহের স্মৃতি'। চাঁপা ও বেলফুল উপহার পেয়ে পূর্বজীবনের কত মধুময় স্মৃতি কবির মনে পড়েছে, গভীর আনন্দ নিয়ে সেই কথা তিনি বলেছেন।

যা সুন্দর তা যে কখনও কবির কাছে পুরাতন হয় না সে কথা বহুবার তিনি বলেছেন 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। সুন্দর তাঁর কাছে সর্বশ্রেষ্ঠের প্রতীক। মৃত্যুর পরের অবস্থাটা কি তার কিছুই তিনি জানেন না; কিন্তু তিনি বলছেন যেদিন মৃত্যু হাজির হবে সেদিন যেন স্নেহের সঙ্গে বহু-স্মৃতি-উদ্রেককারী আর সুন্দর চাঁপা ও বেলফুল তাঁর হাতে দেওয়া হয়।

নববর্ষে কবি স্মরণ করছেন জীবন কত ভুল-ভ্রান্তিতে, কত ব্যর্থতায় পূর্ণ। কিন্তু তিনি বলছেন:

বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও
ক্ষমা করো আজিকার মতো
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যত।

যে বৎসরের সূচনা হ'ল তা কেমন ভাবে কাটবে, অর্থাৎ সবার প্রতি কতটা প্রীতি কবি নিজের অন্তরে রাখতে পারবেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে তাঁর সাহস হয় না। তবু এই নব অতিথিকে তিনি বলছেন :

এস এস, নূতন দিবস!
ভরিলাম পুণ্য অশ্রুজলে
আজিকার মঙ্গল-কলস।

প্রেম প্রীতি এসব ছিল কবির জীবনের পরম অবলম্বন।

'দুঃসময়' ও 'মৃত্যুর পরে' ৫ই বৈশাখে লেখা। দশ বৎসর পূর্বে ৮ই বৈশাখে কবির পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী তাঁর নতুন-বৌঠাকরুনের মৃত্যু হয়। তাঁরই স্মৃতি-বিজড়িত যে এই দুইটি কবিতা সে কথা প্রভাতবাবু বলেছেন। দশ বৎসর পরেও সেই স্মৃতির বেদনা কত গভীর কবির মনে! শোক-কবিতা হিসাবে এই দুইটি খুব মর্মস্পর্শী।

জীবন ও মৃত্যুর সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক কথার অবতারণা কবি 'মৃত্যুর পরে' কবিতাটিতে করেছেন। সেসব পরবর্তীকালে আরো স্পষ্ট রূপ পায়।

এর পরের কবিতা 'ব্যাঘাত'; আরও পরের 'সাধনা' কবিতাটির সঙ্গে পঠনীয়।

'চিত্রা'র দ্বাদশ কবিতা 'অন্তর্যামী'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন। ১৩১১ সালের সেই লেখাটির কিছু কিছু অংশ এই :

> আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না।

এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে-অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই,
কোথা ভেসে যাই দূরে।

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ-কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এম্‌নি তাহার সৌন্দর্য, এম্‌নি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয়, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষমাত্র, সে-কথা গোপনে থাকে—বর্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় নাই। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সে-ই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে এ-কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এম্‌নি করিয়া প্রকৃতি ফুলের মধ্যে ফুলের চরমতা, ফলের

মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটি পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি সে-সকল উপলক্ষমাত্র;—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না।··· শুধু কি কবিতালেখার এক জন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া-জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে কখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ ঘরের সম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক্ লইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্বত-অধিত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

···গ্রামের যে-পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শত বার যাতায়াতে,

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে-পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে-পথ সে-পথের 'পরে
চলেছি পাগল বেশে।

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি।

'জীবনদেবতা' কবিতাটির আলোচনাকালে এ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা এসে পড়বে।

কবি তাঁর প্রতিভার বিচিত্র গতি, তার নতুন অপ্রত্যাশিত রূপ, এসব দেখে গভীর বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়েছেন, সেই নিবিড় বিস্ময়ই এই কবিতাটির প্রধান রস—একথা আমরা বলেছি। কবি তাঁর ভিতরকার প্রতিভাকে অনুভব করেছেন যেন জলন্ত বহ্নি :

যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়িতে নাড়িতে জলে।

তাঁর প্রতিভার এই দহন-জ্বালা, বিচিত্র পথে তাঁকে চালিত করার তার অসাধারণ শক্তি, এসব পরম অকৃত্রিম পরম হৃদয়গ্রাহী ভাষা পেয়েছে এই কবিতায়। এটি কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর অন্যতম—জগতের সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা রূপে আদৃত হবার যোগ্য। এতে একই সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মানস, তার নবনবোন্মেষ, আর প্রতিভা বলতে যা বোঝায় তার প্রায়-অন্তহীন দহন ও দীপ্তি। প্রতিভা যে

অনল-কণার মতো সেকথা গ্যেটেও তাঁর ভিল্‌হেলম্ মাইস্‌টারে বলেছেন। অজানা মনোহরের জন্য প্রেমের দহন স্থফী সাহিত্যে, বিশেষ করে হাফিজে ও রুমীতে, বহুভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু এমন অপূর্ব কবিতা কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে জাগিয়েছিল কবির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা! বড় কিছুকে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখলে এমন বিভ্রাট কখনো কখনো ঘটে।

এর পরের 'সাধনা' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, তিনি আশা ও আয়োজন করেছিলেন বিপুলভাবে, কিন্তু তাঁর সত্যকার পরিচয় এই যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর চেষ্টায় অবশ্য কোনো ত্রুটি ছিল না; এজন্য কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যদি তাঁকে করুণার চোখে দেখেন তবে তাঁর ব্যর্থতাই হয়ে উঠবে সার্থকতা।

জগতের অনেক বড় প্রতিভাবান বলেছেন তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। কবি ব্রাউনিঙ্-এর একটি কবিতার একটি বিখ্যাত চরণ এই:

The petty done, the undone vast.

ধর্ম-সাধনায়ও খুব বড় কথা হচ্ছে ঈশ্বরের করুণা—সাধকের কৃচ্ছ্রতম সাধনার চাইতেও তার মূল্য অনেক বেশি।

কবির প্রকৃতিতে বিনয় ও প্রেমের ভাব সুপ্রচুর,—এই কবিতায় তাও ব্যক্ত হয়েছে। শুধু এই কবিতায় নয় অন্যান্য লেখায়ও তিনি বলেছেন, যা তিনি উপলব্ধি করেছেন তার কিছুই তিনি ব্যক্ত করতে পারেন নি।

এইকালে দীর্ঘদিন কবি 'সাধনা'র সম্পাদকতা করেন। খুব যোগ্য ভাবেই করেন, তা আমরা জানি। কিন্তু 'শীতে ও বসন্তে' কবিতাটিতে নিজের সেই সম্পাদক-রূপকে তিনি মন খুলে উপহাস করেছেন। শীতকালে যেমন বহু শুক্‌নো পাতা জমে, সর্বত্র একটা আড়ষ্ট ভাব দেখা দেয়, কিন্তু বসন্তের বাতাস দিতেই সেই সব শুকনো পাতা কোথায় উড়ে যায়, সব আড়ষ্ট ভাবও দূর হয়ে যায়; তেমনি কবি এতদিন সম্পাদক-রূপে সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, লোকশিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা পুঁথিপত্র ঘেঁটে বহু লেখা জড়ো করেছিলেন, তাঁর কবিত্ব-রূপ বসন্তের পুনরাবির্ভাবে সেসব কোথায় দূর হয়ে গেছে! তিনি তাঁর কবিত্ব-রূপী প্রাণের বন্ধুকে আহ্বান করছেন এইভাবে:

এস এস বঁধু এস,
আধেক আঁচরে বসো,
অবাক অধরে হাসো
ভুলাও সকল তত্ত্ব।
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—
ডুবে যাক ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে
যত মিছা যত সত্য।

আনো বাসনার ব্যথা,
অকারণ চঞ্চলতা,
আনো কানে কানে কথা,
চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি।
অসম্ভব, আশাতীত,
অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত
যত কিছু অনাসৃষ্টি।

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, মনীষীও—কবি-প্রতিভার মতো মনীষাও তাঁর ভিতরে যেন সহজাত। কবি বারবার চেষ্টা করেছেন এই মনীষার বোঝা ফেলে দিতে ; কিন্তু পারেন নি। কবির কবিত্বের মতো কবির মনীষাও দেশকে যে নতুন সম্পদ দিয়েছে তার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি, আরও পাব। কিন্তু কবি খুব অনিচ্ছুক হয়েই স্বীকার করেছেন তিনি কবি ভিন্ন আরো কিছু।

'নগর-সংগীত' কবিতাটিতে একালের নগর-জীবনের বা নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু আসলে অন্ধ, কর্মব্যস্ততার এক অপূর্ব চিত্র কবি এঁকেছেন। এর ছন্দটিও অপূর্ব—সেই কর্মব্যস্ততার সুরে ও তালে বাঁধা। কর্ম কবি নিজেও ভালোবাসেন ; আন্তরিক ভাবে ভালোবাসেন—তা আমরা জেনেছি। কিন্তু একালের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতায় কর্মব্যস্ততার যে উৎকট রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাকে কবি কোনো দিন ভালো বলতে পারেন নি। সেই অন্ধ কর্মোন্মাদনার কিছু কিছু ছবি এই :

ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ,
বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ,
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ,
পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

* * *

হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য,
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্মম, আমি নৃশংস,
সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ
তুলিব আপন কবলে।

* * *

মানবজন্ম নহে তো নিত্য
ধনজনমান খ্যাতি ও বিত্ত
নহে তারা কারো অধীন ভৃত্য,
কাল-নদী ধায় অধীরা।
তবে দাও ঢালি—কেবল মাত্র
দু-চারি দিবস, দু-চারি রাত্র,
পূর্ণ করিয়া জীবনপাত্র
জন-সংঘাতমদিরা।

গ্যেটের ফাউস্‌টে দেখা যায়, ফাউস্‌ট যখন জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে পুরোপুরি আশাহীন হয়ে পড়েছে, তখন সে মেফিস্‌টোফিলিস্‌কে বলছে :

প্রকৃতির রহস্যের দ্বার রুদ্ধ আমার সামনে,
ছিন্ন হয়েছে অবশেষে চিন্তার সূত্র—
জ্ঞান আনে অবর্ণনীয় বিরক্তি।
সন্ধান করা যাক এখন ভোগ-সমুদ্রের তলকূল,
তাতে যদি প্রশমিত হয় কামনার জ্বালা!
মায়ার দুর্ভেদ্য গুণ্ঠনে আবৃত হয়ে
আসুক নব নব বিস্ময় চকিত মোহিত করতে!
যোগ দিই কালের উদ্দাম নৃত্যে,
ঘটনার প্রবাহে।
আনন্দ ও দুঃখ,
দুর্ভাবনা ও সাফল্য,
আবর্তিত হয়ে চলুক যেমন খুশী;
মানুষের পরিচয় অশ্রান্ত উদ্দীপনায়।

প্রভাতবাবু ও চারুবাবু এই কবিতার কিছু ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু সে-ব্যাখ্যা বোধ হয় দেওয়া যায় না।

'নগর-সংগীতে' এক বিক্ষুব্ধ মানসিকতার বর্ণনা দেবার পরে কবি পর পর কয়েকটি কবিতায় মুখ্যভাবে রত হয়েছেন সৌন্দর্যের ধ্যানে।

নগর-সংগীতের পরের কবিতাটি 'পূর্ণিমা'। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে ছিন্নপত্রাবলীতে পাওয়া যাচ্ছে :

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট্ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল— এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়—মনে হয় এর বারো-আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল। এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দিলুম। নিবিয়ে দেবা মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানালা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছুরিত

হয়ে উঠল। এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতি ক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম—যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম, তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বর্তিকাশিখার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই অস্ত যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষ বারের মতো শুতে যেতুম তা হলেও সেই বাতির আলোরই জিত থেকে যেত, অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত—আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

কবি যা বলেছেন তা মোটের উপর এই : সৌন্দর্য জগতে সত্যই আছে ; সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ নেই ; কিন্তু তা উপলব্ধি করা যায় সহজভাবে আপন অন্তরাত্মা দিয়ে ; পণ্ডিতের তত্ত্বকথায় সৌন্দর্য প্রকাশিত না হয়ে বরং আবৃতই হয় বেশি।—গ্যেটেও বলেছেন :

সৌন্দর্যতাত্ত্বিকদের চেষ্টা দেখে না হেসে পারি না, তাদের কৃচ্ছ্রসাধনা হচ্ছে যে বর্ণনাতীত ব্যাপারকে সৌন্দর্য নাম দেওয়া হয়েছে কতকগুলো সাধারণ শব্দের দ্বারা তারই সংজ্ঞা নির্দেশ করা। সৌন্দর্য এক আদি ব্যাপার, তা রূপ ধরে কখনো আমাদের সামনে আসে না, সৃষ্টিধর্মী চিত্তের বাণীতে নানা ভঙ্গিতে আমরা পাই তার আভাস, প্রকৃতিরই মতো তা বিচিত্র। (কবিগুরু গ্যেটে, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১)

'পূর্ণিমা'র পরের কবিতাটি 'আবেদন'। সৌন্দর্য কবির জন্য যে কত বড় সত্য বস্তু সে সম্বন্ধে কবির বহু উক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। 'আবেদন' কবিতাটিতে সৌন্দর্য-পূজায় কবির আনন্দ খুব সমৃদ্ধ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি বিশ্বের রাজরাজেশ্বরীর কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন, রাজ-রাজেশ্বরীর কোনো উচ্চ ও সম্মানিত কাজের ভার তিনি চান না, তিনি চান অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়—তাঁর আবেদন তিনি রাজ-রাজেশ্বরীর মালঞ্চের মালাকর হবেন :

যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন—সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি।······
·························সন্ধ্যাকালে
সে মঞ্জু মালিকাখানি জড়াইবে ভালে
কবরী বেষ্টন করি,—আমি নিজ করে
রচি সে বিচিত্র মালা সান্ধ্য যূথীস্তরে,
সাজায়ে স্বর্ণ পাত্রে তোমার সম্মুখে
নিঃশব্দে ধরিব আসি অবনত মুখে···।

এই সব কাজের জন্য কি পুরস্কার কবি-মালাকর চায় রানীর এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলছেন :

প্রত্যহ প্রভাতে
ফুলের কঙ্কণ গড়ি কমলের পাতে
আনিব যখন,—পদ্মের কলিকাসম
ক্ষুদ্র তব মুষ্টিখানি করে ধরি মম
আপনি পরায়ে দিব, এই পুরস্কার।
প্রতি সন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলিপ্রান্তে
লেশমাত্র রেণু চুম্বিয়া মুছিয়া লব
এই পুরস্কার।

সৌন্দর্যের নিবিড় উপলব্ধিই কবির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এ কথা অনেক কবি বলেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যের ধ্যান এতখানি প্রাণময় হয়েছে খুব কম কবির কাব্যে। কীট্‌স্ কবির এত প্রিয় ছিলেন এই গুণে। কীট্‌স্-এর Ode to Psyche-র সঙ্গে এই কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। অবশ্য আবেদন-এর পরিবেশ পুরোপুরি আমাদের দেশের।

কিন্তু এই অতি নিবিড় সৌন্দর্য-পূজা রবীন্দ্রপ্রতিভার যে একটি দিক,—

একটি বড় দিক নিঃসন্দেহ, কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় যে এতে নয় —তা আমরা জেনেছি।

এর পরের কবিতা 'উর্বশী'। রবীন্দ্রনাথের অতি প্রসিদ্ধ কবিতা এইটি। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন :

> উর্বশী যে কী, কোনো ইংরেজি তাত্ত্বিক শব্দ দিয়ে তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাই নে, কাব্যের মধ্যেই তার অর্থ আছে। এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্—সে তো বস্তু নয়—সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। 'নারী'র মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য—সেইজন্য কোনো কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যে-হেতু নারী-রূপকে অবলম্বন করে এই সৌন্দর্য, সেইজন্যে তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে। শেলি যাকে ইন্‌টেলেক্চুয়াল বিউটি বলেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তাকেই অবিকল মেলাতে গিয়ে যদি ধাঁধা লাগে তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই। গোড়ার লাইনে আমি যার অবতারণা করেছি, সে ফুলও নয়, প্রজাপতিও নয়, চাঁদও নয়, গানের সুরও নয়,—সে নিছক নারী—মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী, সেই।
>
> ...দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে। হোক না সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এই রূপ-সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানবরূপের চরমতাই স্বর্গীয়। উর্বশীতে সেই দেহ-সৌন্দর্য ঐকান্তিক হয়েছে, অমরাবতীর উপযুক্ত হয়েছে। সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।
>
> কামনার সঙ্গে লালসার পার্থক্য আছে। কামনায় দেহকে আশ্রয় করেও ভাবের প্রাধান্য, লালসায় বস্তুর প্রাধান্য। রসবোধের সঙ্গে পেটুকতার যে তফাৎ, এতেও সেই তফাৎ। ভোজনরসিক যে, ভোজ্যকে অবলম্বন ক'রে এমন কিছু সে আস্বাদন করে যাতে তার রুচির উৎকর্ষ সপ্রমাণ করে। পেটুক যে, তার ভোগের আদর্শ পরিমাণগত, রসগত

নয়। সৌন্দর্যের যে আদর্শ নারীতে পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যদিও তা দেহ থেকে বিশ্লিষ্ট নয়, তবুও তা অনির্বচনীয়। উর্বশীতে সেই অনির্বচনীয়তা দেহ ধারণ করেছে, সুতরাং তা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ নয়।
মানুষ সত্যযুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্ত-ভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায়, সে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট্ ভাবে কেবলমাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিষয়ীকৃত হয় নি, এ-কথা মানতে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গলোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন যে-কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যহ দেখতে পাই নে অথচ যা আছে আমাদের ভাবে, সত্যযুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তবরূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই।—তেমনি এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারী-রূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী-মেনকা-তিলোত্তমায়। সেই বিগ্রহিণী নারীমূর্তির বিস্ময় ও আনন্দ উর্বশী কবিতায় বলা হয়েছে।
অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় এই উর্বশী একদিন সত্য ছিল যেমন সত্য—তুমি আমি। তখন মর্ত্যলোকেও তার আনাগোনা ঘটত, মানুষের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ ছিল—সে-সম্বন্ধ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ নয়, বাস্তব। যথা পুরুরবার সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্বশী। আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে—কিন্তু সেই পূর্ণতার প্রতিমা কোথায় গেল।

ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরবশশী।

...উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হ'ত—হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচুসুর লাগত। কিন্তু রসিক লোকে কাব্যের বিচার এমন করে করে না। উর্বশী উর্বশীই, তাকে যদি নীতি-উপদেশের খাতিরে লক্ষ্মী করে গড়তুম তা হলে ধিক্কারের যোগ্য হতুম।
সংক্ষেপে বলা যায়, নারীর যে মোহিনী রূপ পুরুষকে চিরদিন চঞ্চল করে, তাই কবি আঁকতে চেষ্টা করেছেন উর্বশীতে—কোনো Abstract

Beauty, বিমূর্ত সৌন্দর্য বা সৌন্দর্য-তত্ত্ব তিনি যে রূপ দিতে চেষ্টা করেন নি তা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। কবিতাটির বিভিন্ন স্তবকে সেই মোহিনীর রূপায়ণ হয়েছে। আর রূপায়ণ হয়েছে যেন পাথরে। জগতের সাহিত্যে এক অপূর্ব রূপায়ণ এটি।—১৮৯০ সালে বিলাতে গিয়ে লণ্ডনে এক এক্‌সিবিশনে তিনি যে একটি 'বসনহীনা মানবী'র ছবি দেখেছিলেন, সেই ছবি তাঁকে বিজয়িনী লিখবার বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল এই আমাদের ধারণা; হয়তো উর্বশী রচনার কিছু প্রেরণাও তা থেকে তিনি পেয়েছিলেন।

তাছাড়া সেখানে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাইসীয়ম নাট্যশালায় কবি একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলেন, তার এই বর্ণনা তিনি দিয়েছেন :

> আমাদের সম্মুখবর্তী একটি বক্সে দুইটি মেয়ে বসে ছিল। তার মধ্যে একটি মেয়ের মুখ রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দুরবিন আকৃষ্ট করেছিল। নিখুঁত সুন্দর ছোটো মুখখানি, অল্প বয়স, দীর্ঘ বেণী পিঠে ঝুলছে, বেশভূষার আড়ম্বর নেই। অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জ্বলছিল এবং সেই আলো স্টেজের অনতিদূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল —তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল। হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন—অভিনয়কালে সে দিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু দুরবিন কষাটা আমার আসে না। নির্লজ্জ স্পর্ধার সহিত পরস্পরের প্রতি অসংকোচে দুরবিন প্রয়োগ করা নিতান্ত রূঢ় মনে হয়।

এই মেয়েটির রূপও কবিকে হয়ত আংশিকভাবে উর্বশী রচনায় সাহায্য করেছিল। উর্বশীর সপ্তম স্তবকে এই ক'টি চরণ আছে :

> প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
> সর্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
> বারিবিন্দুপাতে।

এই 'নয়ন-আঘাতে'র সঙ্গে উপরিউক্ত 'দুরবিন কষা'র সম্পর্ক আছে এই আমাদের মনে হয়েছে।

অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে—উর্বশী কামনার মূর্তি, তবে সে কেন এমন 'নয়ন-আঘাতে' অস্বস্তি বোধ করবে। এর উত্তর কবির দেওয়া ব্যাখ্যার মধ্যেই রয়েছে। তিনি কামনা আর লালসার ভিতরে পার্থক্য করেছেন। এই নয়ন-আঘাতে বা দুরবিন কষায় কামনার 'রসবোধ' তেমন নেই, যেমন আছে লালসার 'পেটুকতা'। কামনার রস কবি পরিবেশ করেছেন। লালসার 'পেটুকতা'য় তাঁর আনন্দ নেই।

কবির এই সূক্ষ্ম বিচার তাঁর কাব্যের সমঝদারির ক্ষেত্রে খুব মনে রাখবার মতো। তাতে অনেক দুর্ব্যাখ্যা এড়ানো যাবে। সুইনবার্নের আফ্রোদিতে-বন্দনার কোনো কোনো লাইনের সঙ্গে 'উর্বশী'র কোনো কোনো লাইনের মিল থাকলেও এই দুই কবিতার মধ্যে দৃষ্টি-ভঙ্গির পার্থক্য অনেক। সেইটিই যে বড় ব্যাপার তা ভুললে চলবে না। ভালো কবিতার ভালোত্ব অনেকটা তার অনন্যতার গুণে।

উর্বশী'র পরের কবিতা 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। এটিও খুব প্রসিদ্ধ।

১৮৯১ সালে জানুয়ারিতে কালীগ্রাম থেকে লেখা একটি পত্রে কবি লেখেন, তিনি পৃথিবীর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ দেখতে পান, যেন পৃথিবীর ভাবখানা এই—"আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে।" কবি বলেন, "এজন্য স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরও বেশি ভালোবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।"

এই মনোজ্ঞ ভাবটি স্বর্গ হইতে বিদায় কবিতায় রূপ পেয়েছে।

কবিতাটি যে খুব হৃদ্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিতা হিসাবে 'উর্বশী'র যে মর্যাদা সেটি এর লাভ হয়েছে বলা যায় না। তার কারণ, শুধু প্রকাশের অপূর্বতাই নয় একটি বড় সত্যও 'উর্বশী'তে রূপ লাভ করেছে; কিন্তু 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে একটি মনোহর sentiment-ই। 'আবেদন' কবিতাটির মর্যাদাও 'স্বর্গ হইতে বিদায়ে'র চাইতে বেশি মনে হয়—তাতেও রূপ পেয়েছে সৌন্দর্যের একটি সত্য। sentiment-এর

(ব্যক্তিগত অনুভূতির) দাম কাব্যে কম নয়; তবে যে sentiment-এর অন্তরে রয়েছে একটি গভীর সত্য তার প্রকাশ সাধারণত মহত্তর হয়।

এর পরের কবিতাটি 'দিনশেষে'। দিনশেষের উদাস ভাব আর ম্লান মাধুরী ভাষায় ও ছন্দে চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে।

সমস্ত দিনের বিচিত্র কর্মব্যস্ততার পরে শান্ত সন্ধ্যায় শান্ত মনে ঘরে ফিরবার সুরটি এর প্রধান সুর। কবির অন্তরাত্মা শান্ত হয়ে আপনার জনের সান্নিধ্যময় পরিবেশে ফিরবার জন্য কিঞ্চিৎ ব্যাকুল হয়েছে:

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই,
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি,—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী।

এর পরের কবিতাটি 'সান্ত্বনা'।

এর পূর্বে 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটিতে আমাদের দেশের সংকীর্ণ ও প্রতিকূল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের জীবনের অকৃতার্থতা আর আমাদের গার্হস্থ্য-জীবনে নারীর প্রেম-প্রীতিময় জীবনের সার্থকতার ছবি কবি এঁকেছেন। তেমনি একটি ছবি একটু ভিন্নভাবে এই সান্ত্বনা কবিতায়ও আঁকা হয়েছে। এতে পুরুষের অকৃতার্থতা ও অপমানের বেদনা আরো তীব্র করে আঁকা হয়েছে। আর সেই তীব্র বেদনায় নারীর পরম আন্তরিক সমাদর পুরুষকে গভীর সান্ত্বনা দান করছে।

কিন্তু যতই সান্ত্বনা দান করুক পুরুষের অকৃতার্থতার বেদনা নারীর অন্তরেও যে বাজছে সেই সুরটিও এতে ভিতরে ভিতরে অনুরণিত হচ্ছে— সেইটেই এর বিশেষ রস:

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,

এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধরে
লইব বরণ করে,
পুষ্প-সিংহাসন 'পরে
বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার
আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার
কনক-বীণায় ;
আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন,
নয়নের জলে।

জাতির অপমান কবিকে অতি তীক্ষ্ণভাবে বিঁধত। 'কেরানি-জায়া'র বেদনা অবশ্য কবিরই বেদনা।

এর পরের কবিতাটি 'শেষ উপহার'। কবির মনে হচ্ছে তাঁর জীবন-দেবতাকে যা-কিছু দেবার সবই তিনি নিঃশেষে দান করেছেন। বসন্তে সব ফুল ফুটিয়ে দিয়ে তরু যেমন রিক্ত হয় আজ তেমনি রিক্ত তিনি।

তাই আজ কবি তাঁর জীবন-দেবতার কাছে প্রার্থনা করছেন করুণা-কোমল আঁখিপাত, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জীবনদেবতার সামনে এই অভিমান-ভরা কথাটিও তিনি নিবেদন করছেন :

দিই নি কি প্রাণপূর্ণ হৃদিপদ্মখানি
পাদপদ্মে আনি ?
দিই নি কি কোনো ফুল অমর করিয়া
অশ্রুতে ভরিয়া।

অর্থাৎ কবি যখন জীবনদেবতার পূজায় কোনো শৈথিল্য দেখান নি তখন তাঁর দুর্দিনে জীবনদেবতা যেন তাঁর প্রতি করুণার দৃষ্টি রাখেন।

এর পরের কবিতাটি 'বিজয়িনী'—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম স্বনামধন্য কবিতা।

উর্বশীতে কবি রূপায়িত করছেন মোহিনী নারীকে; বিজয়িনীতে নারীর রূপ-যৌবনের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তার স্থান মোহ ও কামনার ঊর্ধ্বে। সেই রূপ-যৌবনের মূর্তি কবি দাঁড় করিয়েছেন বসন্তের পূর্ণ-উচ্ছ্বসিত পরিবেশে :

বসন্ত-পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের কিছু কিছু ছায়া স্বতঃই এর উপরে পড়েছে। কিন্তু রমণীর যে অপূর্ব যৌবনকান্তি কবির তূলিকায় রূপ ধরে উঠেছে তা যেন সেই কামনার সরোবরের উপরে প্রস্ফুটিত অনিন্দ্য কমল। মদন এর প্রতি তার ভুবনবিজয়ী বাণ নিক্ষেপ করতে উদ্যত হ'ল; কিন্তু সৌন্দর্যের সেই পূর্ণ-প্রস্ফুটিত, লালসার সেই চির-অধৃষ্য, মূর্তির পানে চেয়ে সে থমকে দাঁড়াল :

পরক্ষণে ভূমি 'পরে
জানু পাতি বসি, নির্বাক বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।

আর—

নিরস্ত্র মদন পানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

নারী-সৌন্দর্যের একটি অপূর্ব স্তব এই কবিতাটি। এর কয়েক বৎসর পরে রচিত 'পতিতা' কবিতাটির দুইটি লাইন এই :

যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে—

সেই লাইন দুইটি এই 'বিজয়িনী' সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এর প্রেরণা সম্ভবত কবি পান ১৮৯০ সালে লণ্ডনের এক একসিবিশনে 'বসনহীনা মানবী'র ছবি দেখে সে-কথা আমরা বলেছি। কিন্তু এর প্রকৃত উৎস কবির অন্তরাত্মায়ই, যেখানে সৌন্দর্যের অপূর্ব ধ্যান আর কমনীয়তার প্রতিমূর্তি নারীর প্রতি সীমাহীন সম্ভ্রম আমরা দেখেছি।

বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সৌন্দর্যবর্ণনা ও সৌন্দর্যপ্রীতি চরম

উৎকর্ষ লাভ করেছে তাঁর 'আবেদন', 'উর্বশী' আর 'বিজয়িনী' এই তিনটি কবিতায়।

'বিজয়িনী'র পরের কবিতাটি 'গৃহ-শত্রু'। এতে কবির বক্তব্য সংক্ষেপে এই : আমাদের যা শ্রেষ্ঠ ভাব ও ভাবনা তার সার্থকতা লাভে প্রতিবন্ধকতা করে আমাদেরই ভিতরকার অন্য ধরনের প্রবণতা যাকে বশীভূত করা যেন আমাদের সাধ্যাতীত। মানুষের অন্তরের মধ্যে যে এমন সব পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার রয়েছে এর পূর্বে ছিন্নপত্রাবলীতে কবি সে কথা বলেছেন।

এই কবিতাটির চারটি স্তবকে চারটি রূপ-কল্পনার সাহায্যে কবি তাঁর সেই ভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রথম স্তবকে অভিসারিকার রূপ এঁকেছেন; সে নীরব নিশীথে নিঃশব্দে প্রিয়-সম্মিলনের জন্য চলেছে; কিন্তু তার পায়ের নূপুর তার সেই নিঃশব্দ যাত্রার প্রতিবন্ধক হয়েছে। দ্বিতীয় স্তবকে প্রেমিকা প্রিয়তমের আসার পায়ের শব্দ শুনবার জন্যে জানালায় নীরবে কান পেতে বসেছে; কিন্তু তার নিজের উতলা অন্তর সেই নিঃশব্দ প্রতীক্ষার প্রতিবন্ধক হয়েছে। তৃতীয় স্তবকে মধুর মিলনরাত্রির ছবি আঁকা হয়েছে যাতে প্রেমিকার একান্ত আত্মনিবেদন তার পরম কাম্য; কিন্তু সেই নিবিড় ও নিঃশেষ মিলনের মধ্যে প্রেমিকার ভূষণের দীপ্তি অসংগতভাবে আত্মঘোষণা করে।—বহু পরে অন্য একটি কবিতায়ও কবি লেখেন :

অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে।

চতুর্থ স্তবকে কবি একজন বাজিয়ের ছবি দিয়েছেন। তার মনের ভাব সে মুখে আদৌ প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু তার গোপনতম ভাবটিও তার বীণায় বেজে ওঠে। এই সব গৃহশত্রুর শত্রুতায় নায়িকা বা কবি বিব্রত; কিন্তু কখনো কখনো গোপন আনন্দও যে অনুভব না করে তা নয় কেননা এই শত্রুরাও সেই পরম মোহনের পূজারি।

এর পরের কবিতা 'মরীচিকা।' এটি একটি সনেট। মরীচিকা যে দহন-সর্বস্ব, 'চির-পিপাসার রঙ্গভূমি', তৃষ্ণার্ত পথিককে শুধু দিক্-ভ্রান্তই করে, তাতে মধুরসে ভরা পক্ক ফল, পিপাসার জল, স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণ, বৃক্ষপল্লবের মধ্যে বিহঙ্গ, মধুকরদল, এসব কিছুই নেই, এই ছবি কবি এঁকেছেন।

কবি মরীচিকা বলেছেন কাকে? মানুষের বিচিত্র অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কি? মনে হয় তাই। অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ নিজে তো সুখ-শান্তি পায়ই না, অপরের জন্যও সে হয় মরীচিকা।

এর পরের কবিতা 'উৎসব'। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের বিবাহ-উৎসবে এটি রচিত হয়েছিল। বলেন্দ্রনাথ অল্পবয়সেই সাহিত্যে কৃতী হয়েছিলেন। তিনি কবির একান্ত অনুরাগী ছিলেন।

কবির নিজের ভিতরে যে একটি চির-নবীন সত্তা রয়েছে তাঁর সেই সত্তা এই উৎসব-দিনে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। সেই উল্লাসে কবি অনুভব করছেন, তিনি পরম সুন্দর—যেন অমৃত-নির্ঝর—যেন তিনিই বসেছেন নব বরবেশ গ্রহণ করে।

সৌন্দর্য, অকৃত্রিম আনন্দ, এসব কবিকে চিরদিন উল্লসিত করত।

এর পরের 'প্রস্তর-মূর্তি'ও একটি সনেট। সুন্দর পাষাণ-মূর্তি চিরদিন আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে, কিন্তু সে চির-উদাসিনী—চির-নীরব। তার পদতলে মহাকাল যেন চিরদিন বলছে—কথা কও, কথা কও প্রিয়ে। কিন্তু সে চির-বাক্যহীনা—তার মহাবাণী পাষাণেই আবদ্ধ রয়ে গেল।

এর পরের কবিতা 'নারীর দান'। একদিন এক অন্ধ বালিকা পত্রপুটে কবিকে একটি পুষ্পমালিকা দিয়েছিল। সেই মালিকার শোভা-সৌন্দর্য কত অন্ধ বালিকা স্বভাবতই তার কিছুই জানত না। কবি বলেছেন, নারীর কাছ থেকে প্রেম ও প্রীতির যেসব অমূল্য সম্পদ আমরা জীবনে পাই নারী তা অজানিত ভাবেই দান করে। অন্ধ বালিকা যেমন তার দেওয়া পুষ্পমালিকার শোভা-সৌন্দর্য সম্বন্ধে কিছুই জানত না, নারীও তেমনি তার প্রকৃতির ধর্মে অজানিত ভাবে অমূল্য সব সম্পদ মানুষকে দান করে চলেছে।

এর পরের কবিতা 'জীবনদেবতা'।

'অন্তর্যামী'র যে ব্যাখ্যা সেইটি মোটের উপর 'জীবনদেবতা'রও ব্যাখ্যা।

এই কবিতায় জীবনদেবতাকে কল্পনা করা হয়েছে মহিমান্বিত বররূপে আর কবি যেন তাঁর বধূ। বধূ বিচিত্র লীলাচাঞ্চল্য ও তুচ্ছ কর্মের দ্বারা বরকে খুশী করতে চেষ্টা করে এসেছে। এতদিন আনন্দেই তার কেটেছে। কিন্তু আজ সে বরকে বলছে :

লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে।
... ...
যে-সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি।

কবি আরও বলেছেন 'জীবনদেবতা' যদি তাতে অর্থাৎ বধূরূপী কবিতে আনন্দ না পান তবে তাঁর বধূকে আর-এক নতুন সার্থক রূপে গ্রহণ করুন :

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

এ পর্যন্ত কবির অনেক সার্থক রূপ আমরা দেখেছি—আরও বহু সার্থক রূপ আমরা দেখব। রবীন্দ্র-প্রতিভা যত বিচিত্র সার্থক রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে জগতে তেমনটি খুব কম দেখা গেছে।

কবির বয়স এ সময়ে পঁয়ত্রিশ। এই বয়সে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আত্ম-প্রকাশের সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবছেন। এর থেকে অনেকটা বোঝা যায় তাঁর আন্তর বীর্যবত্তার পরিমাণ।

এর পরেই তাঁর প্রতিভার অতিশয় বীর্যবন্ত নতুন এক রূপ আমরা দেখব।

কবি তাঁর ১৩৪৭ সালের ব্যাখ্যায় তাঁর জীবনদেবতাকে বলেছেন তাঁর 'অন্তরে পূর্ণতার অনুশাসন'। ১৩১১ সালের ব্যাখ্যায়ও মোটের উপর সেই কথা তিনি বলেন। তবে তখন 'জীবনদেবতা' যে 'বিশ্বদেবতা'র আভায়ও কখনো কখনো রঞ্জিত হয়ে না উঠেছেন তা নয়। 'এবার ফিরাও মোরে'র

'বিশ্বপ্রিয়া' যে বিশ্বদেবতাই তা আমরা দেখেছি। তাছাড়া এই সময় থেকে 'জীবনদেবতা'র কথা কবি যা বলেছেন, 'বিশ্বদেবতা'র কথা তার চাইতে অনেক বেশি বলেছেন। (চিত্রার পরে চৈতালিতে তাই আমরা দেখব।) অন্যভাবে বলা যায়, এই যুগে কবির জীবনদেবতা ক্রমে যেন বিশ্বদেবতায় মিশে গেছেন।

কিন্তু তাঁর জীবনের শেষের দিকে কবি বলেন—বার বার ডেকেছেন তিনি দেবতাকে কিন্তু সাড়া দিয়েছে মানুষ। আমাদের ধারণা, মানবিকতা সম্বন্ধে কবির সেই বর্ধিত চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর ১৩৪৭ সালের ব্যাখ্যায়।

অবশ্য সেইটিই যে কবির শেষ কথা নয়—তাও আমরা দেখব।

'জীবনদেবতা'র পরের কবিতা 'রাত্রে ও প্রভাতে'। এটিও জীবনদেবতার ভাবে অনুপ্রাণিত।

কবি তাঁর প্রেরণাদাত্রীর দুই রূপ দেখেছেন—এক রূপে তিনি মনোহারিণী প্রেয়সী, অপর রূপে তিনি মহীয়সী দেবী। প্রেয়সীরূপে তিনি কবির সকল আদর ও সোহাগের অত্যাচার হাসি-মুকুলিত মুখে সহ্য করেছেন; সেই প্রেয়সীকেই কবি আবার দেখেছেন দেবীর রূপে—পরম শুচিশুভ্র বেশে তিনি পূজার ফুল সংগ্রহ করছেন। জীবনদেবতার এই দুই রূপ দেখে কবি একই সঙ্গে মোহিত ও সম্ভ্রমচকিত হয়েছেন :

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে।
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে।

এর পরের কবিতা '১৪০০ সাল'। একশত বৎসর পরের পাঠকদের লক্ষ্য করে কবি বলছেন, কবি তাঁর কালে যে পরিবেশে বসে কাব্য রচনা করেছেন এক শত বৎসর পরে সে-পরিবেশের অনেক বদল হয়ে যাবে; যে

ফুল, যে পাখি, যে অনুরাগ কবিকে আজ প্রেরণা দিচ্ছে তাঁর কবিতা রচনায় সেই সবের কিছুই একশত বৎসর পরের পাঠকদের তেমন করে জানবার সুযোগ হবে না। তবে সেদিনেও আজকার মতো বসন্ত ধরণীতে আসবে, আর বসন্তের আগমনে জলস্থল ও মানুষের প্রাণ আনন্দে উতলা হবে। তাদের সেই আনন্দ-উতলা প্রাণ নিয়ে তারা যেন উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে শতবর্ষ পূর্বের কবির বসন্ত-দিনের আনন্দ-উন্মাদনা।

এর পরের কবিতা 'নীরব তন্ত্রী'।

বীনের সব তার বাজে একটি কেন নীরব, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে বীনকার বললে, সেটি ছিল তার বীণার সোনার তার, সেই তারে বাজত সব চাইতে মধুর ও উদাত্ত স্বর; কিন্তু সেটি বীনকার তার দেবতাকে নিবেদন করে এসেছে; কাজেই সেটি আর বাজে না।

মনে হয় কবি এখানে বলতে চাচ্ছেন, তিনি অনেক বিষয়ে কবিতা রচনা করছেন বটে, কিন্তু যেটি তাঁর অন্তরতম বিষয় সেটি তাঁর দেবতারই জন্য, সাধারণ্যে যে সম্বন্ধে কোনো আলাপ তিনি করেন না বা করতে চান না বা করতে পারেন না।

অবশ্য পরে সে বিষয়ে তিনি আলাপ না করে পারেন নি।

এর পরের 'দুরাকাজ্ক্ষা' কবিতায় পর পর তিনটি ছবির অবতারণা করে কবি বলেছেন দুরাকাজ্ক্ষা আমাদের জীবনে কোনো চরিতার্থতা সাধন করে না, বরং সমূহ অনর্থই ঘটায়।

এর পরের দুইটি কবিতা হচ্ছে 'প্রৌঢ়' আর 'ধূলি'। দুটিই সনেট। প্রৌঢ় কবিতাটিতে কবি বলেছেন, যৌবনের উচ্ছ্বাস ও মত্ততার পরে প্রৌঢ়কাল তাঁর জন্যে কিছু প্রশান্তি এনেছে, সেই প্রশান্তির ফলে তাঁর মত্ত দশা কেটে গেছে, তিনি এখন অনেকটা শান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে পারছেন জল স্থল অন্তরীক্ষের পানে।

'ধূলি' কবিতায় কবি বলেছেন, ধূলিকে সবাই জানে নগণ্য, সবার পায়ের নীচে তার স্থান, কিন্তু আসলে তার গৌরবের অন্ত নেই। সে দেখতে শুষ্ক ও কঠিন; কিন্তু সে-ই পৃথিবীকে উপহার দেয় ধন ধান্য শ্যামল শোভা। সবাইকে সে নির্বিচারে পালন করছে, আর সবারই আশ্রয় সে।

মায়াবাদের প্রতিবাদ, তুচ্ছতমের জন্য প্রেমপ্রীতি, এই সব এতে ব্যক্ত হয়েছে।

চিত্রার শেষ কবিতাটি 'সিন্ধু-পারে'। এটি একটি রূপক কবিতা। কবি এর এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

যে প্রাণলক্ষ্মীর সঙ্গে ইহজীবনে আমাদের বিচিত্র সুখদুঃখের সম্বন্ধ, মৃত্যুর রাত্রে আশঙ্কা হয় সেই সম্বন্ধ-বন্ধন ছিন্ন করে বুঝি আর কেউ নিয়ে গেল। যে নিয়ে যায়, মৃত্যুর ছদ্মবেশে, সেও সেই প্রাণলক্ষ্মী। পরজীবনে সে যখন কালো ঘোমটা খুলবে তখন দেখতে পাব চিরপরিচিত মুখশ্রী। কোনো পৌরাণিক পরলোকের কথা বলছি নে, সে-কথা বলা বাহুল্য, এবং কাব্য-রসিকদের কাছে এ-কথা বলার প্রয়োজন নেই যে বিবাহের অনুষ্ঠানটা রূপক। পরলোকে আমাদের প্রাণসঙ্গিনীর সঙ্গে ঠিক এই রকম মন্ত্র পড়ে মিলন ঘটবে সে আশা নেই। আসল কথা পুরাতনের সঙ্গে মিলন হবে নূতন আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি নন, মনীষীও, তার স্পষ্ট পরিচয় আমরা মানসী থেকে পেতে শুরু করেছি। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র সমৃদ্ধ রূপ-কল্পনার ও সৌন্দর্য-তন্ময়তার মধ্যেও তাঁর মনীষা কেমন সুপরিণতি লাভ করে চলেছে তা আমরা দেখলাম। কবি তাঁর মনীষী-রূপকে যেন অবিশ্বাস করতে চেয়েছেন। কিন্তু আসলে এই যুগ্মরূপই তাঁর সত্যকার রূপ। যেমন, মহাকবি গ্যেটে একই সঙ্গে কবি ও মনীষী। এ-যুগের কবির মনীষী না হয়ে হয়ত উপায় নেই। অথবা সর্বযুগেই বড় কবি বড় মনীষীও।

'চিত্রা'র অব্যবহিত পরের 'চৈতালি'তে প্রধানত কবির মনীষার—জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির—সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হবে।

নদী

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা। প্রকাশিত হয় ১৩০২ সালের মাঘে বলেন্দ্রনাথের বিবাহে উপহার রূপে।

কিন্তু আসলে এটি একটি শিশু-কবিতা। এর বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছিলেন :

এই কাব্যগ্রন্থখানি বালকবালিকাদের পাঠের জন্য রচিত হইয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছি ইহার ছন্দ শিশুরা সহজেই আবৃত্তি করিতে পারে। বয়স্ক পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক ছত্রের আরম্ভ শব্দটির পরে যেখানে ফাঁক দেওয়া হইয়াছে সেখানে স্বল্পমাত্র কাল থামিতে হইবে।

এর প্রথম অংশে বর্ণিত হয়েছে দুর্গম পর্বত-শিখর থেকে নদীর উৎপত্তি আর পাহাড়ী অঞ্চলে তার বিচিত্র গতি। সেইটিই এই কবিতার বিশিষ্ট অংশ :

* * *

আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হতে এল নাবি।

* * *

সেথা নাহি তরু নাহি ঘাস,
নাহি পশু পাখিদের বাস,
সেথা শবদ কিছু না শুনি,
পাহাড় বসে আছে মহামুনি।

* * *

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা সাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে।

* * *

নিচে পাহাড়ের বুক জুড়ে
গাছ উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে।
তারা বুড়ো বুড়ো তরু যত
তাদের বয়স কে জানে কত।

* * *

তারা মিলায়ে মিলায়ে কাঁধ
যেন পেতেছে আঁধার ফাঁদ।
তাদের তলে তলে নিরিবিলি
নদী হেসে চলে খিলি খিলি।
তারে কে পারে রাখিতে ধরে
সে যে ছুটোছুটি যায় সরে।

সে যে সদা খেলে লুকোচুরি
তাহার পায়ে পায়ে বাজে নুড়ি।
পথে শিলা আছে রাশি রাশি,
তাহা ঠেলি চলে হাসি হাসি।
পাহাড় যদি থাকে পথ জুড়ে
নদী হেসে যায় বেঁকে চুরে।

বিদায়-অভিশাপ

বিদায়-অভিশাপ নাট্যকাব্যটি রচিত হয় ১৩০০ সালের শ্রাবণে অর্থাৎ সোনার তরীর যুগে। এতে যে মনোরম প্রকৃতি-বর্ণনা আছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মোহিতবাবু এটিকে সোনার তরীর অন্তর্গত করে দেখেছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে সেই সরস প্রকৃতি-চিত্রের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কচ ও দেবযানীর চরিত্র—তাদের জীবনে প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাত। মোহিতবাবু কচের চরিত্রে প্রেম আদৌ পান নি, আর মোহিতবাবু ও প্রভাতবাবু দুজনেই দেবযানীর চরিত্রকে খুব দুর্বল জ্ঞান করেছেন। তাঁদের বিচার আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। মোহিতবাবুর বিচার তো খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে।

আমাদের বিবেচনায় এই রচনাটিতে যথেষ্ট লক্ষণীয় হয়েছে কচ ও দেবযানী দুইজনেরই চরিত্র; তাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে গভীর প্রেমের প্রভাব তাদের চরিত্রের উপরে বিভিন্ন ধরনের হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউই নগণ্য বা নিন্দনীয় নয়—তারা দুজনেই আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—কাব্য হচ্ছে রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ বিশেষ-অনুভূতি-উদ্রেককারী বাক্য, এটি কাব্য সম্বন্ধে একটি সর্বজনগ্রাহ্য কথা, তেমনি কাব্য সম্বন্ধে আর একটি অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথা হচ্ছে: কাব্যে অর্থাৎ সৎকাব্যে অভিব্যক্ত হয় মানুষের ব্যক্তিত্বের গূঢ় পরিচয়।*

এই কবিতাটিতে আমরা পাচ্ছি একটি তপোবন—তাতে ফলপুষ্প লতা-গুল্ম ও বনস্পতির ভিড়, তার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কলস্বনা বেণুমতী,

* দ্রষ্টব্য "রস ও ব্যক্তিত্ব"—শাশ্বত বঙ্গ।

তাতে প্রসন্ননয়না হোমধেনু যেন মাতৃস্বরূপা, তাতে ঋষিবালক ও রাখাল-বালকদেরও সাক্ষাৎ আমরা কখনো কখনো পাই। কিন্তু এই সুগভীর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিশেষ করে চোখে পড়ে দুইটি তরুণ-তরুণী—কচ ও দেবযানী। দেবযানী আশ্রমগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা আর কচ আশ্রমে আগত শিক্ষার্থী—দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কাছে এসেছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য। প্রথম থেকেই দেবযানীর সহানুভূতি সে লাভ করেছে, আর দেবযানীর অনুনয়ে শুক্রাচার্য তাকে শিষ্য করে নিয়েছেন। দৈত্যরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে তিনবার তাকে হত্যা করে, কিন্তু তিনবারই সে প্রাণ পায় দেবযানীর আনুকূল্যে। দেবযানীর জন্য পূজার ফুল তুলে দিয়ে, আলবালে জলসিঞ্চনে তাকে সাহায্য করে, তার মৃগশিশুটি পালন করে, অবসরকালে তাকে স্বর্গ থেকে শিখে আসা গান শুনিয়ে কচ দেবযানীর প্রতি তার সম্ভ্রম দেখিয়ে চলে। এই পূজা কালে কালে তারও অন্তরে পরিবর্তিত হয় গূঢ় অনুরাগে। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ-সন্তান, বিদ্যার্থী, এখানে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করে স্বর্গে ফিরে গিয়ে দেবসমাজকে নূতন দেবত্ব দিয়ে স্বীয় জীবন সার্থক করবে এই তার ব্রত, তাই প্রেম তার অন্তরে যত প্রবলই হোক তারও উপরে সে স্থান দেয় তার ব্রতকে। কিন্তু কালক্রমে কচের প্রতি দেবযানীর অন্তরে যে অনুরাগের সঞ্চার হয় তা তার সহজ প্রবল রূপে দেবযানীর চিত্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে। কচের অন্তরও দেবযানীর প্রতি উদাসীন নয় তার বিদায়-সম্ভাষণ-কালে সে কথা জানতে পেরে দেবযানী অকপটে তাকে প্রেম নিবেদন করে অনুনয় জানায়:

…থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতী-তীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল বিস্মৃত।…

…সহস্র বৎসর ধরে
সাধন করেছ তুমি কি ধনের তরে

আপনি জান না তাহা। বিদ্যা একধারে
আমি একধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে···
আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও।···
রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

কিন্তু কচ তপস্বী—স্বাপ্নিক—বাস্তবের চাইতে স্বপ্নের আকর্ষণ তার জন্য অনেক বড়; তাই সে বললে:

স্বর্গ আর স্বর্গ বলে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগ সম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

কিন্তু একান্ত কাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে না পাওয়া দেবযানীর জন্য সমূহ ব্যর্থতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, সেই ব্যর্থতার নিদারুণতায় তার চোখে অর্থহীন হয়েছে কচের তপস্যা—দুর্লভ্যের জন্য তার আত্মনিবেদন। কিন্তু ব্রতত্যাগ কচের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে তাই একান্ত দুঃখিত চিত্তে দেবযানীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে। দেবযানী উত্তর দিলে:

ক্ষমা কোথা মোর মনে।
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশকঠোর,
হে ব্রাহ্মণ। তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্য-পুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব?···

ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন করে নিয়ে, মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে-মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে। লুটাইল ধূলি'পরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা।

জীবনের দারুণ শূন্যতাবোধে সে কচকে এই বলে অভিশাপ দিলে :

যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

কিন্তু এমন কঠোর অভিশাপ দেবার মূলে দেবযানীর কতখানি মর্মপীড়া রয়েছে কচ তা পুরোপুরি বুঝল, তাই সে পরম আন্তরিকতার সঙ্গে কামনা করলে :

দেবী, তুমি সুখী হবে।
ভুলে যাবে সর্ব গ্লানি বিপুল গৌরবে।

কবিতাটি যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে যদি ভাবা যায় যে এতে কচের ব্রতনিষ্ঠা ও মহানুভবতা আর দেবযানীর অধৈর্য নিপুণতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে তবে কবিতাটির প্রতি অবিচার ভিন্ন আর কিছুই করা হয় না। এমন নির্মম অভিশাপ উচ্চারণ করেও দেবযানী আমাদের শ্রদ্ধা হারায় না, বরং তার তলকূলহীন মর্মবেদনাই প্রকাশ করে। কচও দেবযানীর জন্য অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করে কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না, বরং যে আঘাত সে দেবযানীকে না দিয়ে পারে নি তার মর্মান্তিকতা পরম বিনয়ে স্বীকার করে।

অকৃত্রিম প্রেমের প্রভাবে ব্রতনিষ্ঠ কচের চরিত্র ও প্রেমবিহ্বল দেবযানীর চরিত্র—অথবা নরের চরিত্র ও নারীর চরিত্র—যে এমন অপূর্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হ'ল সেইটিই এই কবিতায় কবির একটি বিশেষ লক্ষণীয় কৃতিত্ব। করুণরসও এতে নিবিড় হয়ে জমেছে। তার কথা কবি পঞ্চভূতে বলেছেন। কিন্তু তা যে যুক্ত হতে পেরেছে জীবনের জটিলতার এমন নিপুণ চিত্রণের সঙ্গে তাতেই রচনাটি লাভ করেছে এক উচ্চতর মর্যাদা।

মূল উপাখ্যানটি মহাভারতের। কিন্তু কবি তাকে নতুন করে গড়েছেন অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে।

রবীন্দ্র-সাহিত্য-ভাণ্ডারে এটি একটি অনবদ্য রত্ন।

চৈতালি

চৈতালির কবিতাগুলো—কয়েকটি কবিতা ভিন্ন এর সবগুলোই সনেট—লেখা হয় ১৩০২ সালের চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে ১৩০৩ সালের শ্রাবণের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এর অধিকাংশ কবিতা পতিসরে লেখা।

এর বেশির ভাগ চৈত্র মাসে লেখা। সেই জন্য কবি এর নাম দেন চৈতালি। শিলাইদহ অঞ্চলে—অন্যান্য বহু অঞ্চলেও—চৈত্র মাসে যে ফসল তোলা হয় তাকেও চৈতালি (কথ্য ভাষায় চোতেলি) বলে।

এই ছোট কবিতা-সংগ্রহটির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

> চৈতালি···একটুকরো কাব্য, যা অপ্রত্যাশিত। স্রোত চলছিল যে রূপ নিয়ে অল্প কিছু বাইরের জিনিসের সঞ্চয় জমে ক্ষণকালের জন্যে তার মধ্যে আকস্মিকের আর্বিভাব হল।
>
> পতিসরের নাগর নদী নিতান্তই গ্রাম্য। অল্প তার পরিসর, মন্থর তার স্রোত। তার এক তীরে দরিদ্র লোকালয়, গোয়ালঘর, ধানের মরাই, বিচালির স্তূপ, অন্য তীরে বিস্তীর্ণ ফসলকাটা শস্যখেত ধূ ধূ করছে। কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে কাটিয়েছি। দুঃসহ গরম। মন দিয়ে বই পড়বার মতো অবস্থা নয়। বোটের জানলা বন্ধ করে খড়খড়ি খুলে সেই ফাঁকে দেখছি বাইরের দিকে চেয়ে। মনটা আছে ক্যামেরার চোখ নিয়ে, ছোটো ছোটো ছবির ছায়া ছাপ দিচ্ছে অন্তরে। অল্প পরিধির মধ্যে দেখছি বলেই এত স্পষ্ট করে দেখছি।

সেই স্পষ্ট দেখার স্মৃতিকে ভরে রাখছিলুম নিরলংকৃত ভাষায়। অলংকার-প্রয়োগের চেষ্টা জাগে মনে যখন প্রত্যক্ষবোধের স্পষ্টতা সম্বন্ধে সংশয় থাকে। যেটা দেখছি মন যখন বলে এটাই যথেষ্ট তখন তার উপরে রং লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। চৈতালির ভাষা এত সহজ হয়েছে এইজন্যেই।

এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে। সেই প্রথম সংস্করণে এর সূচনায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল এই ছয় লাইন কবিতা :

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরান-বল্লভ,
তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে,—
কোনো ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

কবি চৈতালির কবিতাগুলোকে বলেছেন তাঁর কাব্যধারায় অপ্রত্যাশিত। এই কথাটি আরও একটু স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন এইভাবে : তাঁর কবিতার সাধারণ রূপ এই যে তা একই সঙ্গে ছবি আর গান ; চৈতালির কবিতাগুলোয় ছবির দিকটা খুব স্পষ্ট ; কিন্তু যদিও গানের বেদনা তাতে আছে গানের রূপ তাতে তেমন নেই।

কিন্তু চৈতালির কবিতাগুলোকে আকস্মিক না ভেবে কবির কাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট প্রকাশও ভাবা যেতে পারে। এতে ছবির দিকটা স্পষ্ট নিঃসন্দেহ, কিন্তু শুধু ছবি নয় কবির জীবন-দর্শনের দিকটাও এতে স্পষ্ট, আর সেই দর্শন শুধু পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির ব্যাপার নয় গভীর উপলব্ধিরও ব্যাপার। আমরা দেখেছি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁর ভিতরে একটি বিশিষ্ট চেতনা। সেই চেতনা যে তাঁতে প্রবল হয়ে চলেছে তার পরিচয় রয়েছে ছিন্নপত্রাবলীর ১৩০২ সালের মাঝামাঝি সময়ের কয়েকখানি চিঠিতে, তার একখানিতে কবি স্পষ্ট ভাবেই বলেন :

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত

করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে!

এই অনেকটা গভীর গম্ভীর ভাবে জীবন ও জগৎকে দেখার মনোভাব চৈতালির কবিতাগুলোর মুখ্যভাব বলা যেতে পারে। আর কাব্য হিসাবে এর বৈশিষ্ট্য এই যে সনেটের অপেক্ষাকৃত কঠিন বন্ধনের ভিতরে এই ভাবগুলো ধরা পড়েছে বলে সেগুলো একই সঙ্গে হয়েছে লক্ষণীয়ভাবে সংহত আর মার্জিতশ্রী। চৈতালির অনেক লাইন প্রবচন রূপে দাঁড়িয়ে গেছে। এর পরে নৈবেদ্যেও আমরা কবির প্রতিভার এই ধরনের পরিচয় পাব। এ সব কাব্যে রবীন্দ্রমনীষার বিশিষ্ট পরিচয়।

চৈতালির ভূমিকাস্থানীয় যে ছয় লাইন কবিতা—সেটি আমরা উদ্ধৃত করেছি—তার 'তুমি' কে? কবির জীবনদেবতা, না, বিশ্বপ্রিয়া—অর্থাৎ বিশ্বদেবতা? দুই-ই ভাবা যেতে পারে। তবে বিশ্বপ্রিয়া বা বিশ্বদেবতার ভাব এতে বেশি। এই কবিতায় পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে কবির অন্তঃপ্রবাহী ভগবদ্‌ভক্তির। চৈতালির কবিতাগুলোয় মাঝে মাঝে সেই অন্তঃপ্রবাহী ভাবের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। অথবা বলা যায়, চৈতালির কাল থেকে এই ভাবের প্রাধান্য ঘটেছে।

চৈতালির প্রথম কবিতাটি 'উৎসর্গ'। এটি চৈতালির ভূমিকা-স্থানীয়। কবির জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে যেসব ভাব-দ্রাক্ষাগুচ্ছ সুপরিণত হয়েছে কবি সেসব নিবেদন করছেন তাঁর জীবনদেবতাকে। জীবনদেবতার ওষ্ঠে ও দশন-দংশনে টুটে গিয়ে সেই ফলগুলো তাদের ফলবার চরম সার্থকতা লাভ করুক এই কবির কামনা। মোহিতবাবু বলেছেন এতে ভক্তের সর্বসমর্পণের ভাব খাঁটি বৈষ্ণবীয় রসে উচ্ছল হয়েছে।—সেই সমর্পণের ভাবটি এর প্রধান ভাব বটে; কিন্তু সেই ভাবটি এতে যে রূপ পেয়েছে তাও অপূর্ব। গাম্ভীর্যের, ঔজ্জ্বল্যের আর মাধুর্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এই ছোটো কবিতাটিতে। একটি স্তবক উদ্ধৃত করা যাক:

শুক্তিরক্ত নখরে বিক্ষত
ছিন্ন করি ফেলো বৃন্তগুলি,

সুখাবেশে বসি লতামূলে
সারাবেলা অলস অঙ্গুলে
বৃথা কাজে যেন অন্যমনে
খেলাচ্ছলে লহ তুলি তুলি
তব ওষ্ঠে দশন-দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।

এর দ্বিতীয় কবিতা 'গীতহীন'। কবির মনে হচ্ছে তিনি গীতহীন হয়ে পড়েছেন ; তাঁর বীণাপাণি তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন, তাই তাঁর অন্তরে নতুন সুর আর বাজছে না।

কবির মাঝে মাঝে এমন মনে হয়। এই কালে কোনো ভাব-উচ্ছ্বাস বা সংগীত-উচ্ছ্বাস কবি নিজের ভিতরে তেমন অনুভব করছেন না বলে তাঁর এমন মনে হয়েছে। কিন্তু আসলে তাঁর সৃষ্টি অন্য রূপ নিয়েছে—তা উচ্ছ্বাস-পূর্ণ নয়, কিন্তু সত্যই সার্থক সৃষ্টি।

এর পরের কবিতাটি 'স্বপ্ন'। কবি তাঁর কোনো লোকান্তরিত পরম আপনার জনকে স্বপ্নে দেখে, তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করতে পেরে, মর্মস্পৃষ্ট হয়েছেন। আকুলভাবে জেগে উঠে তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর সেই প্রিয়জনও হয়তো তাঁরই মতো স্বপ্ন দেখছেন।—যাঁরা আমাদের পরম আপনার জন মৃত্যুতেও তাঁদের সঙ্গে আমাদের অন্তরের সম্বন্ধ নষ্ট হয় না—মনে হয় এই কবি বলতে চেয়েছেন।

স্বপ্নের পরের কবিতা 'আশার সীমা'। কবি বলছেন, আশার সীমা নেই। যতই পাই না কেন আমাদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমে না। কিন্তু যাকে ভালোবাসি তাকে যদি পাই তবে তাকে নিয়ে আমাদের মন প্রকৃতই খুশী হয়—আমাদের অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হয়।

এর পরের সনেট 'দেবতার বিদায়'। দরিদ্রকে ঘৃণা করে, তার অভাব অভিযোগের প্রতি অন্ধ হয়ে, দেবতার প্রকৃত পূজা থেকে আমরা ভ্রষ্ট হই, তা দেব-পূজার আড়ম্বর যতই আমরা করি না কেন। এই ভাব কবির বহু রচনায় ব্যক্ত হয়েছে।

পরের সনেটটি 'পুণ্যের হিসাব'। এটি সুপ্রসিদ্ধ। পুণ্যের সত্যকার অর্থ কি? সত্যকার পুণ্যকর্ম তাই যা আমাদের অন্তর্-প্রকৃতির উৎকর্ষ

ঘটায়। কিন্তু সাধারণত যা পুণ্যকর্ম নামে পরিচিত সে-সব আমরা করি যান্ত্রিকভাবে। কাজেই আমাদের অন্তর্-প্রকৃতির উন্নয়ন সে-সবের দ্বারা ঘটে না। কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে যখন আমরা ভালবাসি সেই ভালবাসা আমাদের অন্তর্-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়—অকৃত্রিম প্রেম-প্রীতি আমাদের মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়, আমাদের মনে অনন্তের বোধ জাগায়। এর শেষ চরণে সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে :

যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।

এটি একটি গভীর জ্ঞানগর্ভ উক্তি। ছিন্নপত্রাবলীতেও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এর পরের সনেট 'বৈরাগ্য'। এটিও সুবিখ্যাত। এর পূর্বে অনেক কবিতায় দেশপ্রচলিত মায়াবাদের প্রতি আমরা কবির বিতৃষ্ণা দেখেছি। এই বৈরাগ্য কবিতাটিতে কবির সেই বিতৃষ্ণা ও প্রতিবাদ খুব স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। অতি সরল ভাষায় এমন একটি ছবি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন যা সহজে আমাদের অন্তরে সায় পায়। কবির দৃষ্টির অসাধারণ স্বচ্ছতা চৈতালির অনেক কবিতায়ই প্রকাশ পেয়েছে। সে-সবের মধ্যে এই বৈরাগ্য কবিতাটি প্রথম সারের :

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
"গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছ এখানে ?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, "কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা ?"
দেবতা কহিলা, "আমি।"—কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি, "তুমি কোথা প্রভু।"
দেবতা কহিলা, "হেথা।" শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি,—
দেবতা কহিলা, "ফির।"—শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়।"

এর পরে কবিতাটি 'মধ্যাহ্নে'। মধ্যাহ্নে বোটে বসে কবি অনুভব করছেন প্রকৃতির অপূর্ব শান্তি। শূন্য ঘাটের নিচে রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক পাখা ঝাপটিয়ে স্নান করছে, তীরে খঞ্জন পুচ্ছ দুলিয়ে ফিরছে, চিত্রবর্ণ পতঙ্গ পাখা মেলে বাতাসে ভাসছে, রাজহাঁস ঘাটে কলরব তুলেছে, গ্রামের কুকুর কলহে মেতেছে, কখনো গাভীর হাম্বা রব শোনা যাচ্ছে, শালিক ডাকছে, দূর থেকে চিলের সুতীব্র ধ্বনি ভেসে আসছে, বাতাস বইছে বলে বাঁধা নৌকোর আর্তশব্দ উঠছে,—কিন্তু এ-সব যেন মধ্যাহ্নের করুণ একতান, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি এতে ব্যাহত হচ্ছে না। সেই শান্তিরাশির মাঝে বসে কবির মনে হচ্ছে যদিও তিনি প্রবাসে আছেন কিন্তু আসলে তিনি আছেন পরম আত্মীয়দের মাঝখানে :

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে,—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন্ নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন—
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

কবির 'বসুন্ধরা' কবিতায় তাঁর এই নিবিড় 'সর্বানুভূতি'র সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। কবির সেই অনুভূতি খুব অল্প পরিসরে এখানে চমৎকার ব্যক্ত হয়েছে।

এর পরের কবিতা 'পল্লীগ্রামে'। কবি ছিন্নপত্রাবলীর অনেক জায়গায় বলেছেন, পৃথিবী যে কি অপূর্ব সুন্দরী তা কলকাতার বাইরে শিলাইদহের মতো জায়গায় না এলে বোঝা যায় না। এই কবিতাটিতে পল্লীগ্রামের সেই অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা তিনি বলেছেন। বলেছেন, পল্লীগ্রামের যে ফুলফল, পাখির গান, জলের কলতান, অরণ্যের শ্যামলতা, শিশির-নির্মলা উষা, আকাশের শুকতারা, নিশায় সুখসুপ্তি—

হেথায় তাহারে পাই কাছে।

'তাহারে' বলতে কবি কাকে বুঝেছেন? তাঁর চোখে সকল দেবতার

যিনি দেবতা সেই সৌন্দর্যকে। কীট্‌সের যে কথা Beauty is truth, truth beauty সেটি রবীন্দ্রনাথের কথা।

এর পরের কবিতা 'সামান্য-লোক'। কবি বলছেন, আজ আমাদের চোখে যে সামান্য লোক, যে আমাদের মনোযোগ একটুও আকর্ষণ করে না, সে যদি অতীতের মৃত্যু-রাজ্য থেকে মূর্তি ধরে ওঠে, অর্থাৎ তাকে যদি দূর অতীতের লোক বলে আমরা বুঝি, তবে সেই সামান্য লোকই আমাদের চোখে অসামান্য হয়ে উঠবে, তার বেশ-ভূষা, তার প্রতিকথা, তার সুখদুঃখ, তার পরিবেশ, সবই সাধারণ রূপ ত্যাগ করে অসাধারণ হবে।

দূর আমাদের আকর্ষণ করে, তার বড় কারণ, তা আমাদেরই মতো অথচ তাকে স্পষ্টভাবে আমরা জানি না, আর জানি না বলে দূরকে আমরা কবিত্বের আভায় মণ্ডিত করে দেখি।

এর পরের দুইটি সনেট 'প্রভাত' ও 'দুর্লভ জন্ম'। পল্লীর প্রভাতের অপূর্ব সরসতা ও শান্তি কবির হৃদয়-মন গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। তিনি বলছেন :

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো,
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

'দুর্লভ জন্মে' কবি বলছেন, আজ তিনি পৃথিবীর অপরূপ শোভা-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছেন। কিন্তু একদিন তিনি পৃথিবীতে আর থাকবেন না। সেদিনও জাগ্রত জগতের উপরে এমনি প্রভাত দেখা দেবে। এই সব শোভা-সৌন্দর্য দেখবার জন্য তিনি যে সেদিন জগতে থাকবেন না সেই জন্য জগতের সব-কিছু আজ উৎসুক নয়নে দেখছেন :

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এর পরের 'খেয়া' সনেটটিতে কবি জগতের সাধারণ লোকদের সাধারণ জীবনযাপনের ধারার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। জগতে নানা দ্বন্দ্ব নানা রক্তক্ষয়কর যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে চলেছে, কিন্তু জগতের সাধারণ লোকের সাধারণ জীবনধারা তারও মধ্যে অব্যাহত রয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবন-ধারার এই চিত্র কবি তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'ওরা কাজ করে' ধুয়ার কবিতায় আরও ফলাও করে এঁকেছেন।

এর পরের কবিতা 'কর্ম'। ছিন্নপত্রাবলীতে এর উল্লেখ কবি করেছেন। তাঁর সাজাদপুরের ভৃত্য মোমিন মিঞা একদিন দেরি করে কাজে আসাতে তিনি খুব রাগ করেছিলেন। কিন্তু মোমিন মিঞা তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়ে মারা গেছে," এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে ঝাড়পোঁচের কাজে লেগে গেল। এই সম্পর্কে কবি বলেছেন, কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে, কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে স্বীকার করতে হবে তা জীবনের জন্য ভালো, কেননা যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্য শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্য রীতিমত খাটতে হবে।

এই কবিতাটির উল্লেখ কবি তাঁর 'সাহিত্য-তত্ত্ব' প্রবন্ধেও করেছেন; সেখানে এইটি অবলম্বন করে বলতে চেষ্টা করেছেন সাহিত্যে বাস্তবতা বলতে কি বোঝায়। কবির বক্তব্য এই :

> সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে, সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। কিন্তু এই মোমিন মিঞা, একে কী বলব? সুন্দর বলা তো চলে না। মেয়ের বাপও তো সংসারে অসংখ্য, সেই সাধারণ তথ্যটা সুন্দরও না অসুন্দরও না। কিন্তু সেদিন করুণরসের ইঙ্গিতে গ্রাম্য মানুষটা আমার মনের মানুষের সঙ্গে মিলল, প্রয়োজনের বেড়া অতিক্রম করে কল্পনার ভূমিকায় মোমিন মিঞা আমার কাছে হল বাস্তব।···

অর্থাৎ মোমিন মিঞা একটি করুণ ঘটনার আঘাতে কবির মনে যে একটি বিশেষ রূপ নিল সেইটি ধরা পড়ল তাঁর কবিতায়—মোমিন মিঞার যে প্রতিদিনের পরিচিত রূপ সেটি নয়। এই কথা কবি বহুভাবে বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় এর উল্লেখ আমরা দেখব।

এর পরে 'বনে ও রাজ্যে' সনেটটিতে কবি রামের বনবাসকালের অবস্থা আর তাঁর রাজা হওয়ার পরের অবস্থা এই দুইয়ের তুলনা করে বলছেন, বনবাসকালে তাঁর স্বর্ণ-মণি-মাণিক্য ছিল না আদৌ কিন্তু সঙ্গে ছিলেন সীতা, কিন্তু

রাজা হয়ে প্রচুর মণি-মাণিক্য তাঁর লাভ হয়েছে কিন্তু তিনি হারিয়েছেন সীতাকে :

নিত্যসুখ দীনবেশে বনে গেল ফিরে,
স্বর্ণময়ী চিরব্যথা রাজার মন্দিরে।

সত্যকার সুখ পাওয়া যায় আপনার জনের সঙ্গ লাভ করে, সেই আপনার জনের অভাবে স্বর্ণ, মণি-মাণিক্য, এসব 'স্বর্ণময়ী চিরব্যথা'।

এর পরের সনেট 'সভ্যতার প্রতি'। লৌহ, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ, প্রস্তর, এসব যে নব সভ্যতার প্রধান উপকরণ তার পরিবর্তে কবি চাচ্ছেন অরণ্য —সেকালের তপোবনে বাস। সেই তপোবনের যে গ্লানিহীন স্বল্প অভাবের জীবন, সেই সরল জীবন যাপনের সঙ্গে জীবনের বড় তত্ত্বগুলোর নিত্য আলোচনা, নিত্য ধ্যান, এই-ই কবি কাম্যতর বিবেচনা করেন, কেননা তাতেই আত্মার সত্যকার স্বাধীনতা, অনন্ত জগতের হৃদয়ের স্পন্দনের সঙ্গে মানব-জীবনের যোগ উপলব্ধি করা যায় তার সাহায্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই সনেটটির সঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের The World Is Too Much With Us শীর্ষক সনেটটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। দুটিতেই আধুনিক সভ্যতার প্রতি প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে ; তবে ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের সনেটে প্রতিবাদের সুরই মুখ্য, কিন্তু এই 'সভ্যতার প্রতি' সনেটে রবীন্দ্রনাথ যে-তপোবনকে ফিরে পাবার কথা বলেছেন সেই তপোবন তাঁর দীর্ঘদিনের চিন্তার বিষয় হয়েছিল। পরে পরে তা আমরা দেখব।

'সভ্যতার প্রতি'র পরের সনেট 'বন'। 'সভ্যতার প্রতি' সনেটে কবি যে বনের বা তপোবনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেছেন তাই-ই কিছু ভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই সনেটটিতে। বনে প্রকৃতির যে স্পর্শ পাওয়া যায় তার অকৃত্রিম ও গভীর প্রভাবের কথা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন।

এর পরের 'তপোবন' সনেটে কবি স্মরণ করেছেন কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে ও শকুন্তলায় প্রাচীন ভারতের আশ্রমের যে ছবি এঁকেছেন মুখ্যত সেটি। রাজার মহিমা সেখানে তপোবনের মহিমার কাছে নতশির। ঋষি-কন্যাদের স্বাভাবিক যৌবন-চাঞ্চল্যও সেখানে সংযমিত হয়েছে।

এর পরের 'প্রাচীন ভারত' সনেটে কবি প্রাচীন ভারতের মহাপরাক্রান্ত রাজাদের ক্ষাত্র গরিমা আর তপোবনের মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা এই দুইটি

পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখেছেন। তাঁর পক্ষপাত যে মৌন ব্রাহ্মণমহিমার দিকে তা বোঝা যায়।

এর পরের দুটি সনেটে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' ও 'মেঘদূতে'র কথা বলা হয়েছে। 'ঋতুসংহারে' ভোগের আর 'মেঘদূতে' কর্তব্যে অবহেলার জন্য অভিশাপগ্রস্ততার ছবি কালিদাস এঁকেছেন।

জীবনে ও সাহিত্যে ভোগ ও ত্যাগের সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় বলেছেন। সে-সবের সঙ্গে যথাসময়ে আমাদের পরিচয় হবে।

এর পরের সনেটটি 'দিদি'। পশ্চিমী মজুরদের একটি ছোট মেয়ের ও সেই মেয়েটির ছোট ভাইয়ের ছবি এতে আঁকা হয়েছে। ছোট মেয়েটি নদীর ঘাটে থালাবাসন মাজা, নদী থেকে জল নিয়ে যাওয়া, এসব শ্রমসাধ্য সাংসারিক কাজ সযত্নে করে, তার সঙ্গে তার নেড়ামাথা কাদামাথা ছোট ভাইটিকেও যথাসম্ভব যত্নে আগলে রাখে। কবি এই মেয়েটিকে বলেছেন :

জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

সে একটি ছোট বালিকামাত্র, কিন্তু জননীর কাজ সহজপটুত্বের সঙ্গে করে যাচ্ছে।

এই মেয়েটির ও তার ছোট ভাইটির আর-একটি চিত্র কবি এঁকেছেন এর পরের 'পরিচয়' সনেটটিতে। এদেরই একটি ছাগলছানা নদীর তীরে চরছিল। সেটি এসে বালকের মুখ চেয়ে ডেকে উঠল, তাতে বালকটি ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। ছোট দিদিটি তখন ঘটি মাজা ফেলে ছুটে এসে নিজের ছোট ভাইটিকে এক কোলে ও ছাগশিশুটিকে অন্য কোলে তুলে নিলে। পশু ও মানুষের এই অপূর্ব আত্মীয়তা সম্পর্কে কবি বলছেন :

এক কক্ষে ভাই লয়ে অন্য কক্ষে ছাগ
দু-জনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু,—দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়-ডোরে।

মানুষ, পশু, সবার প্রতি কবির নিবিড় প্রীতি ব্যক্ত হয়েছে এই সনেটটিতে, আর ব্যক্ত হয়েছে অতি সহজ সরল ভাষায়।

পশ্চিমী মজুরদের সেই ছোট মেয়েটির কথা কবি বলেছেন এর পরের

'অনন্ত পথে' সনেটটিতেও। তিনি ভাবছেন, এই মেয়েটি তার বাপমায়ের সঙ্গে কর্ম-অবসানে দেশে ফিরে যাবে, সেখানে সে ক্রমে বধূ হবে মাতা হবে এবং তার পরে একদিন তার জীবন শেষ হয়ে আসবে। কিন্তু তার পরেও অনন্তের পথে সে চলবে—কিন্তু কোথায় কিভাবে তা কে জানে!

জীবনের বিচিত্র পরিবর্তন আর শেষে অনির্দেশ্য অনন্তের মধ্যে জীবনের নতুন অজানিত আরম্ভ—এই সব কথা কবি ভাবছেন।

সর্বস্তরের জীবন যে কবির গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল এই সনেট ক'টিতে তারও পরিচয় রয়েছে।

এর পরের সনেটটিতেও কবি ভাবছেন, আমরা যে আপনার জনের সঙ্গে মিলিত হই তা ক্ষণকালের জন্যই; অত্যন্ত আপনার জনের সঙ্গেও আমাদের জানাশুনা যা হয় তা সামান্য—পরস্পরের সম্বন্ধে আমরা অপরিচিত তার চাইতে অনেক বেশি। কিন্তু জীবনের অপূর্ব মাধুর্য এই যে, এই ক্ষণ-মিলন কত মনোহর:

> এ ক্ষণ-মিলনে তবে, ওগো মনোহর,
> তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।
> মুহূর্ত আলোকে কেন, হে অন্তরতম,
> তোমারে চিনিনু চিরপরিচিত সম?

এর পরের সনেট 'প্রেম'। মানব-জীবনে প্রেমের স্থান কি তাই কবি ভাবছেন। মানব-জীবন যেন এক নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে লক্ষ দিকে লক্ষ জনের পার হওয়ার মতো ব্যাপার। এই অন্ধকারে কাউকে আমরা চিনি না, কে যে কোথায় যাচ্ছে তাও জানি না; কিন্তু আমাদের মনে এই আশা আছে যে চির-জীবনের সুখ এখনই হাসিমুখে দেখা দেবে। চলার পথে বিচিত্র স্পর্শ গন্ধ গান আমাদের প্রাণে শিহরন জাগায়। কখনো কখনো আমাদের প্রাণে আনন্দ ও প্রীতির বিদ্যুতের আলো ঝলকে ওঠে, আর সেই আলো যার মুখে পড়ে তাকেই বলি—তোমাকে ভালবাসি, জীবনে যত নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করেছি সব তোমাকে পেয়ে সার্থক হয়েছে।—আমাদের অন্তরের এই আলোক যাদের উপরে পড়ে না তারা আমাদের পক্ষে অন্ধকারেই থেকে যায়, আমরা জানতেও পারি না তারা আছে কি নেই।

জীবনে আনন্দ ও সার্থকতা এনে দেয় প্রেম; যেখানে প্রেম নেই সেখানে

সব অন্ধকার। পরস্পরকে আমরা অত্যন্ত কম জানি। মনে হয় এই কবির বক্তব্য।—পরস্পরকে আমরা অত্যন্ত কম জানি একথা কবি ছিন্নপত্রাবলীতেও বলেছেন।

এর পরের সনেট 'পুঁটু'। কবি চৈত্রের দুপুরের কড়া রোদের মধ্যে শুনতে পেলেন কে একজন ডাকছে "পুঁটুরানী আয়"। বই পড়া বন্ধ করে বোটের দরজা খুলে তিনি দেখলেন, এক যুবক নদীতে নেমে তীরে দাঁড়ানো কাদামাখা এক প্রকাণ্ড মোষকে স্নান করিয়ে দেবার জন্য অমন আদর করে ডাকছে। কবি বলেছেন :

> হেরি সে যুবারে, হেরি পুঁটুরানী তারি
> মিশিল কৌতুকে মোর স্নিগ্ধ সুধাবারি।

এর পরের চারটি সনেটে কবি মানুষের হৃদয়-ধর্মের কথাই বলেছেন—যে হৃদয়-ধর্ম তরুলতা পশুপক্ষী সবার সঙ্গে মানুষের প্রীতির যোগ ঘটায়। মানুষের বুদ্ধি এমন যোগকে আমল দিতে চায় না, বলে, এসব চিন্তা মূঢ়তা ভিন্ন আর কিছু নয়; কিন্তু মানুষের হৃদয় এই সব সম্বন্ধকে মহামূল্য বলেই জানে। মানুষের কাব্যে—যেমন শকুন্তলায়, এই জড় জীব ও মানুষের অপূর্ব সম্বন্ধের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। জড় জীব সবার প্রতি কবির সুনিবিড় প্রীতি এই সনেটগুলিকে খুব উপভোগ্য ও লক্ষণীয় করেছে।

এইগুলোর পরের সনেটটির নাম 'সতী'। এটি সুপ্রসিদ্ধ, বিশেষ করে এর চিন্তার কিছু নূতনত্বের জন্য। কবি বলেছেন, সতী-নারীরা মানুষের গভীর শ্রদ্ধার পাত্রী; সেই সতীদের অনেকে সুপ্রসিদ্ধা, তাঁদের উজ্জ্বল কথা পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা রাজার ঘরে বা দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন, কিন্তু তেমন খ্যাতির অধিকারিণী হন নি—জগতে অপূর্ব প্রীতির দৃষ্টান্ত রেখে তাঁরা সতী-স্বর্গে স্থান গ্রহণ করেছেন। কবি বলছেন, এই সতীদের মধ্যে এমন নারীদেরও স্থান হয়েছে মর্ত্যে যারা পরিচিত ছিল অসতী বলে। সতীরা তাদের দেখে লজ্জা পান; কিন্তু কবির নিবেদন—এরা মর্ত্যে কলঙ্কিনী নামে পরিচিত হলেও স্বর্গে সতী-শিরোমণি :

> তুমি কী জানিবে বার্তা, অন্তর্যামী যিনি
> তিনিই জানেন তার সতীত্ব-কাহিনী।

কবির এই চিন্তা ছিন্নপত্রাবলীর শেষের দিকে ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে :

> মানুষের সঙ্গে যখন মানুষের ক্ষণিক সম্বন্ধ তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষেরা মানুষকে বিচার করবে এইটেই স্বাভাবিক, যাঁর সঙ্গে মানুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব, অনেক সাধুর চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট পল্, সেণ্ট্ অগষ্টিন্, যদি অল্প বয়সে মারা যেতেন তা হলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত ?

এটিও একটি ভাববার দিক এই কবির বক্তব্য।

এর পরের সনেটে মাতৃ-স্নেহের একটি দৃশ্য কবি এঁকেছেন। সন্তান মৃত্যু-পথ-যাত্রী হয়েছে, কিন্তু মা প্রতিদিন তাকে বাইরে নিয়ে আসে লোকজন গাড়িঘোড়া এই সব দেখাতে। প্রতিদিনের এই সব চঞ্চল দৃশ্য দেখে তার মুমূর্ষু অনাসক্ত মন যদি একটুও সচেতন হয়ে ওঠে—এই মায়ের মনের আশা।

এর পরের কবিতা 'করুণা'। একটি ছোট ছেলে রাস্তায় কাটা ঘুড়ি ধরতে গিয়ে গাড়ির নিচে পড়ে গেল, দেখে রাস্তার লোকেরা হায় হায় করে উঠল। দেখা গেল একটি দোতলায় একটি মেয়ে এই ছেলেটির এমন বিপদে আকুল হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে কাঁদছে। সেই মেয়েটি বারাঙ্গনা; কিন্তু একটি ছোট ছেলের এমন বিপদে তার অন্তরের মাতৃস্নেহ—করুণা—পুরোপুরি জেগে উঠেছে।

এর পরের কবিতা 'পদ্মা'। পদ্মার সঙ্গে কবির যে অন্তরঙ্গ যোগ তারই কথা তিনি বলেছেন। বলেছেন, এ যোগ এমন যে তা যেন জন্মান্তরেও নষ্ট হবে না।

এর পরের দুটি সনেট 'স্নেহ-গ্রাস' ও 'বঙ্গমাতা'। কবির বক্তব্য এই : বঙ্গমাতা অথবা বঙ্গদেশের মাতারা সন্তানদের অতিরিক্ত স্নেহ দিয়ে যেন বন্দী ও পঙ্গু করে রেখেছে, তার ফলে তারা জননীর উপরে নির্ভরশীল চিরশিশু হয়ে আছে। কিন্তু জননীর উচিত সন্তানরা যাতে প্রাণ দিয়ে দুঃখ সয়ে ভালোমন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রকৃত মানুষ হতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা।

জীবনের নানা ক্ষেত্রে স্বজাতির নানা ধরনের দুর্বলতা লক্ষ্য করে কবি বহুভাবে এই ধরনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। এসবের অর্থ অতি পরিষ্কার

—বুঝতে কারোই বেগ পাবার কথা নয়। কিন্তু 'বঙ্গমাতা' কবিতাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মোহিতবাবু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজকে কখনো আত্মীয় বলে মনে করেন নি, তাই তাঁর এই উক্তি বাঙালীর প্রতি কঠিন গালির মতো হয়েছে, প্রেমের পরিচায়ক হয় নি।

অত্যন্ত সোজা কথাও কত বাঁকা করে বোঝা যায় তাঁর এই ব্যাখ্যা তার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

এর পরের 'দুই উপমা' আট লাইনের কবিতা। কবি নদীর ধারার সঙ্গে জাতির জীবন-ধারার তুলনা করেছেন। নদীতে যতদিন স্রোত থাকে ততদিন তাতে তৃণগুল্ম জন্মাতে পারে না ; কিন্তু যখন নদী সেই স্রোত হারায় তখন তা শৈবাল-দামে বাঁধা পড়ে। কোনো জাতিও তেমনি যখন জীবনের বেগ হারিয়ে ফেলে তখন সে বিচিত্র জীর্ণ-লোকাচারে বাঁধা পড়ে—বিচার ও কাণ্ডজ্ঞানের পথে এগিয়ে চলার শক্তি তার নষ্ট হয়ে যায়, সে শুধু তন্ত্র-মন্ত্র-সংহিতার নির্দেশ পালনে ব্যস্ত হয়।

জাতীয় জীবনের এই দুর্গতির চিত্র কবি বার বার এঁকেছেন আর বহু-ভাবে এর প্রতিবাদ করেছেন।

এর পরের দুইটি সনেট হচ্ছে 'অভিমান' ও 'পর-বেশ'। ইংরেজের ঔদ্ধত্য আর বাঙালীর আত্মসম্মানবোধের অভাব এই দুই-ই কবির কতখানি মনঃ-পীড়ার কারণ হয়েছিল ছিন্নপত্রাবলীতে তা আমরা দেখেছি। পর-বেশ গ্রহণের লজ্জার কথাও তাঁর বহু লেখায় ব্যক্ত হয়েছে। 'অভিমান' সনেটটির কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরণ এই :

যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।

*　　*　　*

নিজের বিচার যদি নাই নিজ হাতে,
পদাঘাত খেয়ে যদি না পার ফিরাতে,
তবে ঘরে নতশিরে চুপ করে থাক্,
সাপ্তাহিকে দিগবিদিকে বাজাস্ নে ঢাক।

এর পরের 'সমাপ্তি' সনেটে কবি বলেছেন, তাঁর কবিতা-রচনার ক্ষমতা যে সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেচে তা স্বীকার করে নেওয়াই সংগত। এখনো দুই

একটি কবিতা হয়ত তাঁর কলমে ওৎরাতে পারে, কিন্তু আসলে তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয়েছে। তাই কবি বলছেন :

আসুক বিষাদভরা শান্ত সান্ত্বনায়
মধুর মিলন অন্তে সুন্দর বিদায়।

নিজের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে এমন কথা কবি বহুবার বলেছেন। এসব তাঁর অসাধারণ বিনয়ের পরিচায়ক—তাঁর মন যে এক নতুন দিকে চলতে চাচ্ছে তারও পরিচায়ক বটে। আমরা দেখেছি এই কালেও তাঁর বাণীতে মাঝে মাঝে কী শক্তি ও দীপ্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

এর পরের 'ধরাতল' ও 'তত্ত্ব ও সৌন্দর্যে' কবি বলেছেন, ধরণীর উপরেই কত শোভা-সৌন্দর্য আমাদের চোখে পড়ে আর তাতে আমাদের হৃদয়-মন কত মোহিত হয়; পণ্ডিতরা যে ধরার উপরকার শোভা-সৌন্দর্যের কথা না ভেবে এর নিচেকার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার জন্য নিশিদিন ব্যস্ত সে ব্যস্ততা তাঁতে নেই।—গ্যেটের একটি বিখ্যাত উক্তি এই সম্পর্কে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

মোটের উপর, কতটুকুই বা আমরা জানি, বুদ্ধি-বিদ্যার সাহায্যে কতদূরই বা যেতে পারি? মানুষের জন্ম হয় নি বিশ্বজগতের সমস্যাবলীর রহস্য ভেদ করবার জন্যে, বরং তার কাজ হচ্ছে কোথায় সেই সমস্যার আরম্ভ তা উপলব্ধি করা আর নিজেকে ব্যাপৃত রাখা যা জ্ঞেয় সেই পরিধির মধ্যে।

এর পরের 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' চতুষ্পদীতেও এই কথা কবি বলছেন :

যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

কবির মায়াবাদের প্রবল বিরুদ্ধতা লক্ষণীয়।

এর পরের সনেট 'মানসী'। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা। এতে কবির যা প্রধান কথা তা ব্যক্ত হয়েছে সূচনার আড়াই চরণে :

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

এর পরের লাইনগুলোয় কবি ব্যক্ত করেছেন কেমন করে পুরুষ তার মনের ও হাতের নির্মাণ-ক্ষমতার দ্বারা নারীর দেহকে বসনে ভূষণে মণ্ডিত করেছে আর কাব্যে তার জন্যে কত মনোহর উপমার সৃষ্টি করেছে। এই সবের ফলে নারী পুরুষের চোখে যা দাঁড়িয়েছে তা শুধু ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, তা পুরুষেরও সৃষ্টি :

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।

এই কবিতাটি খুব জ্ঞানগর্ভ; সেই সঙ্গে কবির বর্ণনাও খুব শক্তিশালী হয়েছে। তবে জ্ঞান এতে হয়ত কিঞ্চিৎ বেশি প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে এটি মর্মস্পর্শী কিছু কম।

নারী যে অনেকখানি পুরুষের মানস-রূপিণী, মানসী হয়েই পুরুষকে গভীর আনন্দ দেয়, প্রধানত সেই ভাব ব্যক্ত হয়েছে এর পরের 'নারী' ও 'প্রিয়া' সনেটেও। 'প্রিয়া' সনেটে কবি বলেছেন :

যখন তোমার 'পরে পড়ে নি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাই নি তখন।

* * *

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো।

* * *

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

সুইট্জারল্যাণ্ড ভ্রমণকালে কবি গ্যেটেও তাঁর লিলি-কে স্মরণ করে লিখেছিলেন :

না যদি তোমারে বাসিতাম ভালো হে মোর লিলি,
মধুর ললিত এমন স্বভাব-শোভা,
কিন্তু না যদি বাসিতাম ভালো তোমারে লিলি,
এত সুখ কভু দিত কি স্বভাব-শোভা?

এর পরের 'ধ্যান' সনেটে কবি বলেছেন :

যত ভালোবাসি, যত হেরি বড়ো করে
তত, প্রিয়তমে আমি সত্য হেরি তোরে।

যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।

আজ প্রিয়ার এক অপূর্ব মূর্তি কবির ধ্যান-নেত্রে আবির্ভূত হয়েছে :

আজি এ বসন্ত-দিনে বিকশিত মন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব স্বপন ;—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহাপারাবার।

* * *

যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

ধ্যানের দিকে কবির প্রবণতা লক্ষণীয়।

এর পরের দুটি সনেট—'মৌন' ও 'অসময়'—খুব অর্থপূর্ণ। কবির মন ভিতরে ভিতরে যে একটা গভীর কিছুর সন্ধান করছে তার বিশেষ পরিচয় রয়েছে এই দুটিতে। 'মৌন' সনেটে তিনি বলেছেন :

যাহা কিছু বলি আজি সব বৃথা হয়,
মন বলে মাথা নাড়ি—এ নয়, এ নয়।
যে-কথায় প্রাণ মোর পরিপূর্ণতম
সে-কথা বাজে না কেন এ বীণায় মম।

আর 'অসময়'-এ বলছেন :

বৃথা চেষ্টা রাখি দাও। স্তব্ধ নীরবতা
আপনি গড়িবে তুলি আপনার কথা।
আজি সে রয়েছে ধ্যানে,—এ হৃদয় মম
তপোভঙ্গ-ভয়ভীত তপোবনসম।
এমন সময়ে হেথা বৃথা তুমি প্রিয়া
বসন্তকুসুমমালা এসেছ পরিয়া ;
এনেছ অঞ্চল ভরি যৌবনের স্মৃতি,—
নিভৃত নিকুঞ্জে আজি নাই কোনো গীতি।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সূক্ষ্ম অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অনেক কবিতায়। তার ফলে তাঁর গভীর ও মহৎ ব্যক্তিত্ব এক অপূর্ব প্রতিফলন লাভ করেছে তাঁর কাব্যে। কবির অন্তরাত্মার এমন বিস্তৃত পরিচয় বেশি কবির কাব্যে বিধৃত হয় নি।

এর পরের কবিতা 'গান'। তার 'তুমি' কে? মনে হয়, সৌন্দর্য-লক্ষ্মী। কবির জীবনদেবতাও হতে পারেন।

এর তিনটি স্তবকে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বা জীবনদেবতার তিন রূপ কল্পনা করা হয়েছে। প্রথম স্তবকে ভাবা হয়েছে, তিনি যেন সমুদ্রের জোয়ার—সেই জোয়ার কবির নির্জন হৃদয়-বেলাভূমির উপরে বার বার তালে তালে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় স্তবকে এই জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বলা হয়েছে জাগরণ-রূপিণী:

জাগরণসম তুমি আমার ললাট-চুমি
উদিছ নয়নে।

তৃতীয় স্তবকে অনুভব করা হয়েছে ইনি যেন কুসুমরাশি:

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ 'পরে।
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।

এই কবিতায় কবি দেখছেন, তাঁর জীবনে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বা জীবনদেবতার বিচিত্র লীলা চলেছে আর সেই লীলার পাশে আজ তাঁর মনে বিরাজ করছে গম্ভীর স্তব্ধতা।

এর পরের সনেট 'শেষ কথা'। কবি বলছেন মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় ভাব-সিন্ধুর কত যে কলধ্বনি তাঁর চিত্তে বাজছে তার আর ইয়ত্তা নেই, তাঁর মনে হয় জগতের যত কবির কাব্যে যত ছন্দ যত গাথা ধ্বনিত হয়েছে সব তাঁর হৃদয়ে এক মহাগানে পরিণত হতে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর বুক ফেটে মাত্র এই ধ্বনি উত্থিত হয়:

হে চিরসুন্দর, আমি তোরে ভালোবাসি।

ভেবে দেখলে বোঝা যায় জগতের ভাবুকরা ও কবিরা শেষ কথা যা

বলেছেন তা এই : হে সুন্দর, হে মধুর, হে মহান, তোমাকে ভালবাসি।—এর অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করে বলা যেন মানুষের সাধ্যাতীত।

এর পরের সনেট 'বর্ষশেষ'। কবি বলছেন, একটি বৎসর যে শেষ হয়ে গেল এই নিয়ে দুশ্চিন্তা মানুষ ভিন্ন আর কারো নেই। গাছে গাছে যত পাখি সব আজকার প্রভাতে নাচছে গাইছে, উড়ে বেড়াচ্ছে; যতদিন এ আকাশে এই জীবন আছে ততদিন বৎসরের শেষ তাদের কাছে নেই। তাদের প্রতিদিন আনন্দেই কাটবে।

এই অভয় ও আনন্দের কথা কবি আরও জোর দিয়ে বলেছেন এর পরের 'অভয়' সনেটটিতে। ঈশ্বর আনন্দময়, আকাশে বাতাসে তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন আনন্দ ও আশ্বাসের বাণী; কাজেই তাঁর ভয়ে ভীত হতে হবে এ কথা যারা বলে তারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কবির অন্তরের কথা এই :

তিনি নিজে মৃত্যুকথা ভুলায়ে ভুলায়ে
রেখেছেন আমাদের সংসার-কুলায়ে।
তুমি কে কর্কশ কণ্ঠ তুলিছ ভয়ের।
আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

এর পরের সনেট 'অনাবৃষ্টি'। অনাবৃষ্টির ফলে নদী শুকিয়ে গেছে, মাঠ পুড়ে যাচ্ছে—কিন্তু সব মেঘ বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষক-কন্যারা সুর করে করে বলছে—'আয় বৃষ্টি হানি'; কিন্তু ফল কিছুই হচ্ছে না। কবি বলছেন :

কলিযুগে হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

এর পরের দুটি সনেট হচ্ছে 'অজ্ঞাত বিশ্ব' ও 'ভয়ের দুরাশা'। প্রকৃতির সৌন্দর্যময় ও আনন্দময় রূপ কবি অনেক এঁকেছেন। কিন্তু তার ভয়ংকর রূপও তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই দুটি সনেটে প্রকৃতির সেই ভয়ংকর রূপ কবি এঁকেছেন—যে রূপে প্রকৃতিকে মহাভীষণ মহাহিংস্র ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না—মানুষের প্রাণের জন্য তার যেন ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। কবি প্রকৃতির সেই ভয়ংকর মূর্তি দেখে ভাবছেন :

আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি।
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।

এই ভয়ংকরী প্রকৃতিকেও আমরা জননী বলে ডাকি এই আশায়:

যদি ব্যাঘ্রিনীর মতো
অকস্মাৎ ভুলে গিয়ে হিংসা লোভ যত
মানবপুত্রেরে কর স্নেহের লেহন।

প্রকৃতির অহেতুক ধ্বংসপ্রবণতা সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ সচেতন। তা সত্ত্বেও তার আনন্দরূপ তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। ছিন্নপত্রাবলীতে তিনি বলেছেন জগৎ যেন দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি—ধ্বংসশক্তি আর রক্ষণী শক্তি।

এর পরের সনেট 'ভক্তের প্রতি'। কবি বলেছেন, তাঁর তরুণ ভক্তের অনুরাগ তাঁর অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করেছে; ভক্তের তরুণ হৃদয়ের শ্রদ্ধার সৌন্দর্য তাঁকে যেন দেবতার আকার দান করেছে। কিন্তু তাতে কবি সংকোচ বোধ করছেন; সবিনয়ে তিনি বলছেন:

গেয়ে গেয়ে ফিরি পথে আমি শুধু কবি
নহি আমি ধ্রুবতারা, নহি আমি রবি।

ভক্তের ভক্তি কবিকে যে প্রীত না করত তা নয়, কিন্তু সে-ভক্তিতে কবি যথেষ্ট অস্বস্তিও বোধ করতেন। বার বার নানাভাবে সেই কথা তিনি বলেছেন।

এর পরের সনেট 'নদীযাত্রা'। ভরা বর্ষায় কবি নদীযাত্রা করেছেন। নদীর ভীষণতার আজ কোনো পরিচয় নেই, জলস্থল সব স্থির। কবি বলছেন, চিরপুরাতন মৃত্যু আজ ম্লান-আঁখি:

সেজেছে সুন্দর বেশে, কেশে মেঘভার
পড়েছে মলিন আলো ললাটে তাহার।

এর পরের সনেট 'মৃত্যুমাধুরী'। কবি অনুভব করছেন, জলে স্থলে যে অপূর্ব শান্তি আজ বিরাজ করছে তা যেন আজ মৃত্যুর অপূর্ব মাধুরীর দ্বারা মণ্ডিত হয়েছে। তাঁর মনে কিছুদিন ধরে যে একটি গোপন তপস্যা চলেছে অনেকটা তার ফলে মৃত্যু তাঁর চোখে ভয়ের বস্তু বা অবাঞ্ছিত-কিছু আর নয়:

প্রথম মিলনভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহবাঁশি উঠিতেছে বাজি,
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

এই সময়ে কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী অভিজ্ঞা অল্প বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি খুব সুকণ্ঠী ছিলেন—কবি তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর স্মৃতির বেদনা ব্যক্ত হয়েছে এর পরের 'স্মৃতি' সনেটে :

স্নেহের দৌরাত্ম্য তার নির্ঝরের প্রায়
আমারে ফেলিত ঘেরি বিচিত্র লীলায়।
আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়ানে।

এর পরের সনেট 'বিলয়'। এটিও তাঁর সেই লোকান্তরিতা ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্মৃতি-বিজড়িত। কবি দেখছেন, প্রকৃতির সহস্র লীলায় তার স্নেহলীলা প্রকাশ পাচ্ছে, দিগন্তের শ্যাম প্রান্তের মেঘে মেঘে যেন শতরূপে তারই মুখ ভাসছে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না—অনন্ত জগতের মধ্যে তা হারিয়ে গেছে।*

এর পরের দুটি সনেট হচ্ছে 'প্রথম চুম্বন' ও 'শেষ চুম্বন'। প্রেমিক-প্রেমিকা অথবা বর ও বধূ প্রথম যেদিন পরস্পরকে চুম্বন করেছিল সেদিন যেন শুধু তাদের দুজনের দ্বারাই জগৎ পূর্ণ ছিল, যেন দিক্‌-দিগন্তরের দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছিল। কিন্তু শেষ চুম্বন যেদিন তারা পরস্পরকে দিচ্ছে সেদিন তাদের জীবনে আনন্দস্রোত মন্দীভূত হয়ে এসেছে, সেদিন সংসারের পথে কর্মের ঘর্ঘর মন্ত্রই তাদের কানে বাজছে।

এর পরের সনেট 'যাত্রী'। কবি অনুভব করছেন তিনি বহু দূরের যাত্রী, তাই আপাততঃ যে সুখ বা দুঃখ তাঁর জীবনে এসে দেখা দিয়েছে তা তাঁকে বিহ্বল না করুক। অনন্তের পথে তাঁকে চলতে হবে :

নীরবে জ্বলিবে তব পথের দু-ধারে
গ্রহতারকার দীপ কাতারে কাতারে।

* রবীন্দ্রজীবনী দ্রষ্টব্য।

সেই অনন্ত ভুবনে একা যাকে চলতে হবে আজকার কুশাঙ্কুর-ক্ষত তার জন্য একান্তই উপেক্ষণীয়।

এই সময়ে তাঁদের বিরাট এজমালি জমিদারি ভাগ করা হয়—পতিসর পড়ে মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্রদের ভাগে। পতিসর কবির প্রীতি আকর্ষণ করেছিল ; তাই তাকে ছেড়ে যেতে কবি বেদনা বোধ করছেন।

বিষয়বণ্টন নিয়ে কবির ও তাঁর স্বজনের মধ্যে সম্ভবতঃ যে মনোমালিন্য ঘটেছিল তারই ছায়া পড়েছে এর পরের 'তৃণ', 'ঐশ্বর্য', ও 'স্বার্থ' এই তিনটি সনেটের উপরে।

'তৃণ' সনেটটিতে কবি তাঁর স্বজনদের বলছেন, তাঁরা ক্রোধ দূর করুন, কেননা তিনি কারো সঙ্গে বিরোধ করতে চান না ; তিনি যে-পথ ধরে চলতে চান সে-পথে সপ্তলোক পাশে পাশে চলেছে কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ ঘটছে না। ঐশ্বর্যের যা-কিছু গৌরব তা গৃহের মধ্যে, বিশ্বপথে তাকে বার করলে তার সেই গৌরব ক্ষুদ্র ও ম্লান হয়ে যায়। সেই বিশ্বের পথে বরং নবতৃণদলের গৌরব বেশি, আর কবির ক্ষুদ্র গানেরও গৌরব সেখানে বেশি।

কেন বেশি, সেই কথা বলা হয়েছে এর পরের 'ঐশ্বর্য'-এ। বিশ্বজগতের যা মহান সম্পদ, যেমন প্রভাতের সূর্য, নিশীথের শশী, শ্রাবণের ধারাপাত, বনের মর্মর, এসবের সঙ্গে এক আসন লাভ করেছে নবতৃণদল। কবির গানও তাই। কিন্তু বিলাসীর ঐশ্বর্যের স্থান শুধু তার রুদ্ধগৃহের মধ্যে, আর তা ক্ষণভঙ্গুর—মুহূর্তেই তা শীর্ণ ম্লান মিথ্যা হয়ে যায়।

'স্বার্থ' সনেটে তুচ্ছ স্বার্থের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে কবি বিস্মিত হয়ে বলছেন :

> কে রে তুই, ওরে স্বার্থ, তুই কতটুক,
> তোর স্পর্শে ঢেকে যায় ব্রহ্মাণ্ডের মুখ,
> লুকায় অনন্ত সত্য,—স্নেহ সখ্য প্রীতি
> মুহূর্তে ধারণ করে নির্লজ্জ বিকৃতি ;—
> থেমে যায় সৌন্দর্যের গীতি চিরন্তন
> তোর তুচ্ছ পরিহাসে।

কিন্তু কবি বলছেন তিনি বেছে নিয়েছেন চির-প্রেমের পথ যার মুখে অনন্তের বাণী অমৃতে অশ্রুতে মাখা :

মোর তরে থাক্
পরিহাস্য পুরাতন বিশ্বাস নির্বাক।
থাক্ মহাবিশ্ব, থাক্ হৃদয়-আসীনা
অন্তরের মাঝখানে যে বাজায় বীণা।

সেই অন্তরের প্রেয়সী, শ্রেয়সী ও বীণাবাদিনীর প্রসাদ যে কবির লাভ হয়েছে এজন্য তিনি পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করেছেন এর পরের 'প্রেয়সী' সনেটে :

হে প্রেয়সী, হে শ্রেয়সী, হে বীণাবাদিনী,
আজি মোর চিত্তপদ্মে বসি একাকিনী
ঢালিতেছ স্বর্গসুধা ; মাথার উপর
সদ্যস্নাত বরষার স্বচ্ছ নীলাম্বর
রাখিয়াছে স্নিগ্ধহস্ত আশীর্বাদে ভরা,
সম্মুখেতে শস্যপূর্ণ হিল্লোলিত ধরা
বুলায় নয়নে মোর অমৃত চুম্বন ;

* * *

তুমি আজি মুগ্ধমুখী আমারে ভুলালে,
ভুলাইলে সংসারের শতলক্ষ কথা—
বীণাস্বরে রচি দিলে মহা নীরবতা।

এর পরের সনেট 'শান্তিমন্ত্র'। কবি পতিসর ছেড়ে কলকাতায় যাচ্ছেন ; তিনি তাঁর অন্তর্যামিনী দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন সেই দেবী যেন তাঁকে কখনো পরিত্যাগ না করেন :

সেথা সর্ব ঝঞ্ঝনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি। বিদ্বেষের বাণে
বক্ষ বিদ্ধ করি যবে রক্ত টেনে আনে
তোমার সান্ত্বনাসুধা অশ্রুবারিসম
পড়ে যেন বিন্দু বিন্দু ক্ষতপ্রাণে মম।
বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী,
তুমি মৃদুস্বরে দিয়ো শান্তিমন্ত্রধ্বনি—

স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা—ব'লো কানে কানে—
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে।

এর কয়েকদিন পূর্বে কবি বলেছিলেন তাঁর বীণাপাণি তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন, তার ফলে তাঁর মনোবীণা আর বাজছে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁর অন্তরের বীণাবাদিনী তাঁকে ত্যাগ করে যান নি, বরং দুর্দিনে তিনিই হয়েছেন তাঁর পরম আশ্রয়।

এর পর চারটি সনেটে কবি স্মরণ করেছেন কবি কালিদাস ও তাঁর কাব্য-সাধনার কথা। কবিকে তাঁর নিজের পরিবেশে যে-সব দুঃখকর ক্ষুদ্র ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হয়েছে উজ্জয়িনীর রাজসভায় তেমন সব ক্ষুদ্র ব্যাপারের সম্মুখীন কবি কালিদাসকেও হতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর কালের ও জীবনের সেই সব নগণ্য বিশেষত্বের কথা আজ আর কেউ ভাবে না। আজ কালিদাস সমাদৃত হচ্ছেন চির-আনন্দ ও চির-সৌন্দর্যের কবিরূপে। তিনি যেন ছিলেন মহেশ্বর আর পার্বতীর সভায় চিরানন্দময় গায়ক—যাঁর গানে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেবী নিজের কান থেকে ময়ূরপুচ্ছ খুলে তাঁর শিরোভূষণে পরিয়ে দিতেন।

কালিদাস ও তাঁর কাব্য-সাধনা সম্পর্কে দ্বিতীয় সনেট হচ্ছে 'কুমারসম্ভব-গান'। 'কুমারসম্ভব' কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য। এই কাব্যের উল্লেখ বহুভাবে কবি করেছেন। এর সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত আলোচনা আমরা পাব কবির 'প্রাচীন সাহিত্যে'।

কুমারসম্ভবের অর্থ কুমারের জন্মকথা। কিন্তু হর ও পার্বতীর তপস্যা আর তার পরে তাঁদের বিবাহ, প্রচলিত কুমারসম্ভব কাব্যে এই আছে। তাছাড়া সংস্কৃত মহাকাব্য অন্যূন আট সর্গে সমাপ্ত হওয়া চাই, কিন্তু কুমারসম্ভবের প্রচলিত পাঠে কাব্যখানিতে সাত সর্গ পাওয়া যায়—শেষ সর্গে হর-পার্বতীর বিবাহ বর্ণনা করা হয়েছে। কুমারসম্ভবের অপ্রচলিত পাঠে সপ্তম সর্গের পরে হর-পার্বতীর বিহারের বিস্তৃত বর্ণনা আছে; কিন্তু পণ্ডিতদের কাছে সেই সব বর্ণনার আদর হয় নি, তার কারণ, হর-পার্বতী হচ্ছেন জগতের পিতামাতা—পিতামাতার বিহারের বর্ণনা করা বা তার কথা শোনা সন্তানদের পক্ষে অশোভন।

কালিদাস কুমারসম্ভব কেন সাত সর্গ পর্যন্ত লিখলেন, এর পর আর অগ্রসর হলেন না, তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রচলিত

মতেরই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু অনুসরণ করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। তিনি বলেছেন : কুমারসম্ভবের প্রথম দিকে হিমালয়ের শোভাসৌন্দর্যের এবং উমাদেবীর তপস্তার যে-সব বর্ণনা আছে তা তিনি অর্থাৎ দেবী আনন্দের সঙ্গে শুনলেন ; মহাদেবের জন্য দেবী যে-সব কৃচ্ছ্র সাধনা করেছেন সে-সব শুনে তিনি কখনো দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন, কখনো তাঁর চোখে অশ্রুধারা প্রবাহিত হ'ল। কিন্তু কালিদাস যখন তাঁদের বিহার বর্ণনা আরম্ভ করলেন তখন দেবী লজ্জায় নত-আঁখি হলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, দেবীর চোখে সেই ব্যাকুল লজ্জা দেখে হে কবিশিরোমণি কালিদাস, তুমি সহসা তোমার বর্ণনার গতি রুদ্ধ করলে, তাই কুমারসম্ভব সাত সর্গের বেশি আর লেখা হল না।

এই সনেটটির গঠন এবং লালিত্য দুই-ই অপূর্ব। এটি রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সনেট ও শ্রেষ্ঠ রচনা। সনেটটি উদ্ধৃত করা যাক :

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভবগান,—চারি দিকে ঘিরে
দাঁড়াল প্রমথগণ, শিখরের 'পর
নামিল মন্থর শান্ত সন্ধ্যামেঘস্তর,—
স্থগিত বিদ্যুৎলীলা, গর্জন বিরত,
কুমারের শিখী করি পুচ্ছ অবনত
স্থির হয়ে দাঁড়াইল পার্বতীর পাশে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা। কভু স্মিতহাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ,—কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল,—কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে—যবে অবশেষে
ব্যাকুল শরমখানি নয়ন-নিমেষে
নামিল নীরবে,—কবি, চাহি দেবীপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

এর তৃতীয় সনেটের নাম 'মানসলোক'। কবি বলেছেন, কবি কালিদাস যে উজ্জয়িনীর রাজসভায় নবরত্নের অন্যতম ছিলেন, তাঁর রাজা ছিলেন বিক্রমাদিত্য, এসব আজ মনে হয় স্বপ্ন। আজ কবি কালিদাসের সত্যকার পরিচয় এই যে তিনি মানুষের মানসলোকের চির-আনন্দময় কবি।

বড় কবিরাও বিশেষ কালে ও বিশেষ দেশে জন্মান, সেই সব পরিচয়েই তাঁরা প্রথমে পরিচিত হন। কিন্তু কালে কালে তাঁরা সকল মানুষের প্রেম-প্রীতি লাভ করেন, সকল জাতির ও দেশের আপনার জন হন। বহু পরে শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধেও কবি এই কথা বলেছেন।

এর চতুর্থ সনেটের নাম 'কাব্য'। কবি বলছেন, হে অমর কবি কালিদাস, তুমি আনন্দের ও সৌন্দর্যের কবি নিঃসন্দেহ, কিন্তু আমাদেরই মতো সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব এসব কি তোমারও জীবনে ঘটে নি ?

ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর, নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।

কবি বলছেন এসবই কালিদাসের জীবনে ঘটেছিল, কিন্তু এসবের ঊর্ধ্বে মাথা তুলতে পেরেছিল তাঁর কাব্য-রূপ কমল :

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

এই দুইটি চরণ বিখ্যাত। মহৎ জীবন, কবির মহৎ রচনা, এসব সম্বন্ধে এ অতি সার্থক উক্তি।

এই সময়ে কবি ও তাঁর স্বজনদের মধ্যে যে অপ্রীতি দেখা দিয়েছিল তারই বেদনায় রঞ্জিত হয়েছে কালিদাস সম্বন্ধে তাঁর এই সনেটগুলো। বেদনার সৃষ্টি বলে এই কবিতাগুলো বিশেষভাবে চিত্তগ্রাহী হয়েছে।

'বক্ষে শেল গাঁথি' কথাটির অর্থ বক্ষে শেল গাঁথা অবস্থায়। বাংলায় এই জাতীয় প্রয়োগ হচ্ছে—'চোট খাওয়া পাখি', 'বাণ খেয়ে যে পড়ল ধরায়', ইত্যাদি।

এর পরের কবিতা 'প্রার্থনা'। কবি বলছেন, তাঁর 'পরান-বল্লভে'র চরণ-কমল-রতন-রেণুকা তাঁর অন্তরে সঞ্চিত আছে, তাই জগতের কোনো সত্যকার ধন থেকে কেউ তাঁকে বঞ্চিত করতে পারে না।

এর পরের চারটি সনেট হচ্ছে ইছামতী নদী সম্বন্ধে। এগুলো চৈতালির

শেষ সনেট। এর প্রথমটিতে ইছামতীকে কবি তুলনা করেছেন দেবী দুর্গার সঙ্গে। দেবী দুর্গা শরৎকালে মহাসমারোহে পর্বতগৃহ ত্যাগ করে ভক্তগৃহে আসেন, তাঁর আগমনে ভক্তরা সারা বৎসরের জন্য কৃতার্থ হয়। ছোট ইছামতী নদীও তেমনি বর্ষাকালে বিপুল কলেবর ধারণ করে মহাসমারোহে প্রবাহিত হয়, তার সেই প্রবাহ সারা বৎসর ধরে তীরে তীরে গৃহে গৃহে সমৃদ্ধি ও শান্তি বিতরণ করে। কবি বলছেন, যখন তিনি থাকবেন না, তাঁর গানও থাকবে না, তখনো বঙ্গের পার্বতী ইছামতী এমনি ভাবে ঘরে ঘরে ধন-ধান্য ও শান্তি বিতরণ করে চলবে।

এর দ্বিতীয় সনেটটি 'শুশ্রূষা'। কবি বলছেন, ইছামতীর দুই তীরের গভীর শান্তি থেকে তাঁর ব্যথা-ক্ষত প্রাণে অমূল্য শুশ্রূষা লাভ হয়েছে, তা যেন তাঁর দগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সুধা এনে দিয়েছে, ইছামতী যেন চুপি চুপি কবিকে বলে দিয়েছে :

বৎস, জেনো সার,
সুখ দুঃখ বাহিরের, শান্তি সে আত্মার।

এর তৃতীয় সনেট 'আশিস-গ্রহণ'। কবি চলেছেন রণক্ষেত্রে সংগ্রামের পথে, তাই ইছামতীর কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে তার কাছে তিনি এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন :

এই আশীর্বাদ করো, জয় পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।
বিশ্বস্ত স্নেহের মূর্তি দুঃস্বপ্নের প্রায়
সহসা বিরূপ হয়—তবু যেন তায়
আমার হৃদয়সুধা না পায় বিকার,
আমি যেন আমি থাকি নিত্য আপনার।

এর চতুর্থ সনেটটি হচ্ছে—'বিদায়'। এটি চৈতালির শেষ সনেট। কবি ইছামতীর কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে বলছেন, যেখানে তিনি যাচ্ছেন সেখানে তটিনীর কলস্বন নেই; সেখানে অলিখিত মহাশাস্ত্র-রূপ উদার গগনও নেই; সেই অকূলের মাঝে কবির একমাত্র সম্বল তাঁর নিজের অন্তর, তাই কবি এই নদীর তীর থেকে বিদায় নিতে চাচ্ছেন না; ভীত

শিশুর মতো তিনি এসব প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছেন। কবি নদী ও এই উদার পরিবেশকে বলছেন :

শুভ শান্তিপত্র তব
অন্তরে বাঁধিয়া দাও, কণ্ঠে পরি লব।

প্রকৃতি কবির জন্য শুধু শোভা-সৌন্দর্যের আধার ছিল না—তাঁর দেহ-মন-আত্মার সর্বাঙ্গীণ পরিপোষণ সেই প্রকৃতির কাছ থেকে তাঁর লাভ হ'ত।

ভারতীয় চিন্তায় এ অনেকখানি নতুন। আর সেই 'নতুন' এল এক অপূর্ব প্রাণমাতানো রূপে। আমাদের সাহিত্যে ইহ-প্রীতি ও মানবিকতার পূর্ণ বিজয়-ঘোষণা হ'ল রবীন্দ্রসাহিত্যে।

অথচ ইহ-প্রীতি ও মানবিকতা বলতে সাধারণত যা বোঝায় রবীন্দ্রনাথের ইহ-প্রীতি ও মানবিকতা ঠিক তাই নয়। তাঁর ইহ-প্রীতি ও মানবিকতার সঙ্গে 'অনন্তে'র ও 'অমৃতের'ও নিবিড় যোগ।—এ প্রসঙ্গ পরে আরও আসবে।

মালিনী

মালিনী নাটিকাটি রচিত হয় ১৩০৩ সালের সূচনায় কবির উড়িষ্যায় বাসকালে। এর মূল উপাখ্যানটি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal থেকে গৃহীত। অবশ্য মূল উপাখ্যানটির অনেক বদল হয়েছে কবির রচনায়।

কবি বলেছেন, এটি তাঁর একটি স্বপ্নলব্ধ প্লট। এই রকম স্বপ্নঘটিত রচনা যে তাঁর আরও আছে তা আমরা জেনেছি। এই নাটকটি সম্বন্ধে কবি 'বঙ্গভাষার লেখকে' বলেছিলেন :

আমি বালক-বয়সে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখিয়াছিলাম······তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে।······

পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যে ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি।—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব-সমর্পণ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে।

এর বহু পরে রচনাবলীতে 'মালিনী'র সূচনায় কবি তাঁর বক্তব্য আরো কিছু স্পষ্ট করে বলেন এইভাবে :

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথরে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আর্বিভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবির 'মহাবিশ্বজীবন'-চেতনার প্রবল রূপ আমরা দেখেছি। 'মালিনী'তেও তা প্রবল, তবে তার বাইরের চেহারা অনেকটা শান্ত। মালিনীর সেই শান্তশ্রী খুব লক্ষণীয়।

মালিনীর একটু বিস্তৃত পরিচয় এই :

এটি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দৃশ্য রাজ-অন্তঃপুর। বৌদ্ধসন্ন্যাসী কাশ্যপ মালিনীকে বলছেন ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে—সুখ-আশা দুঃখভয় বিষয়-পিপাসা সংসারবন্ধন এসব ছিন্ন করতে, প্রমোদপ্রলাপ চঞ্চলতা এসব পরিহার করে রাত্রিদিন চিত্তে প্রজ্ঞার শান্ত সুনির্মল আলো ধারণ করতে।

মালিনী বললে :

ভগবন্ রুদ্ধ আমি, নাহি হেরি চোখে ;
সন্ধ্যায় মুদ্রিতদলে পদ্মের কোরকে
আবদ্ধ ভ্রমরী—স্বর্ণরেণুরাশিমাঝে
মৃত জড়প্রায়। তবু কানে এসে বাজে
মুক্তির সংগীত, তুমি কৃপা কর যবে।

কাশ্যপ বললেন :

······জ্ঞানসূর্য-উদয়-উৎসবে
জাগ্রত এ জগতের জয়জয়রবে
শুভলগ্নে সুপ্রভাতে হবে উদ্‌ঘাটন
পুষ্পকারাগার তব। সেই মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে।

এই বলে কাশ্যপ তীর্থপর্যটনে প্রস্থান করলেন। কাশ্যপের কথায় মালিনীর অন্তর চঞ্চল হ'ল। তার স্বগত উক্তির কয়েক লাইন এই :

মহাক্ষণ আসিয়াছে! অন্তর চঞ্চল
যেন বারিবিন্দুসম করে টলমল
পদ্মতলে। নেত্র মুদি শুনিতেছি কানে
আকাশের কোলাহল, কাহারা কে জানে
কী করিছে আয়োজন আমারে ঘিরিয়া,
আসিতেছে যাইতেছে ফিরিয়া ফিরিয়া
অদৃশ্য মুরতি। কভু বিদ্যুতের মতো
চমকিছে আলো, বায়ুর তরঙ্গ যত
শব্দ করি করিছে আঘাত। ব্যথাসম
কী যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম

বারংবার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।

এর পর রাজমহিষী এসে মালিনীর দীনবেশ দেখে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন, বললেন, বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা জাদুবিদ্যা জানে, তাদের কথায় না ভুলে, মেয়েদের জন্য যা চিরদিনের ধর্মপথ, অর্থাৎ পরম্পরাগত ধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবন, তাই অবলম্বন করতে :

…বাছা রে আমার। ধর্ম কি খুঁজিতে হয়?
সূর্যের মতন ধর্ম চিরজ্যোতির্ময়
চিরকাল আছে। ধরো তুমি সেই ধর্ম,
সরল সে-পথ। লহ ব্রতক্রিয়াকর্ম
ভক্তিভরে। শিবপূজা করো দিনযামী
বর মাগি লহ বাছা তাঁরি মতো স্বামী।

* * *

……পুরুষের
দেশেভেদে কালভেদে প্রতিদিবসের
স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম; সদা হাহা করে
ফিরে তারা শান্তি লাগি সন্দেহ-সাগরে,
শাস্ত্র লয়ে করে কাটাকাটি। রমণীর
ধর্ম থাকে বক্ষে কোলে চিরদিন স্থির
পতিপুত্ররূপে।

মহিষীকে একজন সাধারণ মাতা ও গৃহিণীরূপে দাঁড় করানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা আন্তরিকতায় পূর্ণ, তার ফলে তাঁর সরল উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। এমন সরল, ঔজ্জ্বল্যবর্জিত অথচ শ্রদ্ধার যোগ্য চরিত্র অঙ্কিত করতে পারা উঁচু দরের শিল্পশক্তির পরিচায়ক। অথবা, এই ধরনের চরিত্র ঠিক আঁকা হয় না, শিল্পীর গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়। মালিনী চরিত্রেও কবির সেই শক্তির পরিচয়।

এই সময়ে রাজার আগমন হ'ল। প্রজারা যে মালিনীর নির্বাসন চাচ্ছে সে কথা তিনি বললেন। মহিষী একে কথায় কথাই জ্ঞান করলেন না। মালিনী বললে—দাও মোরে নির্বাসন পিতা

আমি স্বপ্ন দেখি জেগে,
শুনি নিদ্রাঘোরে, যেন বায়ু বহে বেগে,
নদীতে উঠেছে ঢেউ, রাত্রি অন্ধকার,
নৌকাখানি তীরে বাঁধা—কে করিবে পার,
কর্ণধার নাই—গৃহহীন যাত্রী সবে
বসে আছে নিরাশায়—মনে হয় তবে
আমি যেন যেতে পারি, আমি যেন জানি
তীরের সন্ধান—······
—কোথা হতে বিশ্বাস আমার
মনে এল ? রাজকন্যা আমি, দেখি নাই
বাহির-সংসার—বসে আছি এক ঠাঁই
জন্মাবধি, চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর,
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ,
ওগো ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আজ,
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরযামী
অগ্নিময়ী মহাবাণী,* সেই শুধু আমি।

মহিষী কন্যার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলেন না, তিনি রাজাকে বললেন কন্যার বিবাহের আয়োজন করতে।—সেনাপতি এসে বললে ব্রাহ্মণদের কথায় প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। রাজা সেনাপতিকে বললেন তাড়াতাড়ি সামন্ত-রাজাদের নিয়ে আসতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

ব্রাহ্মণেরা সমবেত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয়—তারা ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের বন্ধু, আর ব্রাহ্মণদের মধ্যে তারা 'বুদ্ধিজীবী'। ক্ষেমংকর চিরাচরিত ধারার সমর্থক, কিন্তু কোনো অন্ধ মতবাদের প্রতি সুপ্রিয়র আকর্ষণ নেই। ব্রাহ্মণরা মালিনীর নির্বাসন দাবি করছে, কিন্তু সুপ্রিয় এই প্রশ্ন তুলেছে—ধর্ম নির্দোষের নির্বাসন ? এতে ব্রাহ্মণরা তার উপরে খুব চটে গেছে, কিন্তু সুপ্রিয়র যে কথা—

* তুলনীয় : "যেন সচেতন বহ্নিসমান নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে।"

যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস
এই শুধু ধর্ম ব'লে করিবে বিশ্বাস
নিঃসংশয়ে? বালিকারে দিয়ে নির্বাসনে
সেই ধর্ম রক্ষা হবে? ভেবে দেখো মনে
মিথ্যারে সে সত্য বলি করে নি প্রচার,—
সেও বলে সত্য ধর্ম, দয়া ধর্ম তার;
সর্বজীবে প্রেম—সর্বধর্মে সেই সার,
তার বেশি যাহা আছে, প্রমাণ কী তার।

তার উত্তরে ক্ষেমংকর তাকে বোঝাচ্ছে:

মূল ধর্ম এক বটে,
বিভিন্ন আধার। জল এক, ভিন্ন তটে
ভিন্ন জলাশয়। আমরা যে সরোবরে
মিটাই পিপাসা পিতৃপিতামহ ধরে
সেথা যদি অকস্মাৎ নবজলোচ্ছ্বাস
বন্যার মতন আসে, ভেঙে করে নাশ
তটভূমি তার;—সে উচ্ছ্বাস হলে গত
বাঁধ-ভাঙা সরোবরে জলরাশি যত
বাহির হইয়া যাবে। তোমার অন্তরে
উৎস আছে, প্রয়োজন নাহি সরোবরে,—
তাই বলে ভাগ্যহীন সর্বজন তরে
সাধারণ জলাশয় রাখিবে না তুমি,—
পৈতৃক কালের বাঁধা দৃঢ় তটভূমি,
বহুদিবসের প্রেমে সতত লালিত
সৌন্দর্যের শ্যামলতা, সযত্নপালিত
পুরাতন ছায়াতরুগুলি; পিতৃধর্ম,
প্রাণপ্রিয় প্রথা, চির-আচরিত কর্ম,
চিরপরিচিত নীতি? হারায়ে চেতন
সত্য-জননীর কোলে নিদ্রায় মগন
কত মূঢ় শিশু, নাহি জানে জননীরে,—

তাদের চেতনা দিতে মাতার শরীরে
ক'রো না আঘাত।

এই সংস্কার-বিরোধী মনোভাবের প্রতি কবিরও যে এক সময়ে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল তাঁর নবযৌবনের রচনায় তা আমরা দেখেছি। এই মত ও এর দুর্বলতা দুই-ই পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে 'গোরা'য়।

ক্ষেমংকরের তর্কের উত্তর সুপ্রিয়র ঠিক জোগালো না। সে বন্ধুবৎসলও,—বললে :

তব পথগামী
চিরদিন এ অধীন। রেখে দিব আমি
তব বাক্য শিরে করি। যুক্তি-সূচি 'পরে
সংসার-কর্তব্যভার কভু নাহি ধরে।

এমন সময় সংবাদ এলো ব্রাহ্মণদের বাক্যে রাজসৈন্যদল চঞ্চল হয়েছে। বিদ্রোহের মতো ব্যাপার ঘটতে পারে ভেবে ব্রাহ্মণরা ভয় পেলে, একজন বললে :

ধর্মবলে ব্রাহ্মণের জয়,
বাহুবলে নহে। যজ্ঞযাগে সিদ্ধি হবে;
দ্বিগুণ উৎসাহভরে এস বন্ধু সবে
করি মন্ত্রপাঠ।

তারা যখন সমস্বরে পাষণ্ডদলনের জন্য প্রার্থনা করছিল তখন মালিনী সেখানে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় ব্যতীত সমস্ত ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে।

ক্রমে তারা জানল দেবী নয় রাজকন্যা মালিনী রাজ-অন্তঃপুর ত্যাগ করে তাদের ডাকে তাদের মধ্যে এসেছে। জগৎ-সংসারের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই; তবে সে শুনেছে যে বসুন্ধরা দুঃখময়, তাদের সঙ্গে সেই দুঃখের পরিচয় সে নিতে চায়—

আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা

যত দুঃখ যেথা আছে সকলের 'পরে
অনন্ত প্রবাহে। দেখো দেখো নীলাম্বরে
মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ পেয়েছে প্রকাশ।
কী বৃহৎ লোকালয়, কী শান্ত আকাশ—
এক জ্যোৎস্না বিস্তারিয়া সমস্ত জগৎ
কে নিল জুড়ায়ে বক্ষে—ওই রাজপথ,
ওই গৃহশ্রেণী, ওই উদার মন্দির—
স্তব্ধচ্ছায়া তরুরাজি—দূরে নদীতীর,
বাজিছে পূজার ঘণ্টা—আশ্চর্য পুলকে
পুরিছে আমার অঙ্গ, জল আসে চোখে,
কোথা হতে এনু আমি আজি জ্যোৎস্নালোকে
তোমাদের এ বিস্তীর্ণ সর্বজনলোকে।

কবির যে মহৎ ও বৃহৎ জীবনের উপলব্ধি আমরা দেখেছি 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় ও তাঁর আরও কিছু কিছু লেখায় তাই দেখা যাচ্ছে 'মালিনী'তেও। মালিনীর কথায় ব্রাহ্মণেরা অভিভূত হ'ল আর সমস্বরে তার জয় উচ্চারণ করে তাকে রাজগৃহে রেখে আসতে চলল।

এমন একটা ব্যাপার দেখে সুপ্রিয়, এবং ক্ষেমংকরও, অভিভূত হয়েছিল। ক্ষেমংকর অবশ্য শীগগিরই সে ভাব কাটিয়ে উঠল আর সুপ্রিয় চলে যাচ্ছে দেখে তাকে বললে :

স্থির হও। তুমিও কি, বন্ধু, অন্ধভাবে
জনস্রোতে সর্বসাথে ভেসে চলে যাবে ?

সুপ্রিয় বললে :

এ কি স্বপ্ন ক্ষেমংকর ?

ক্ষেমংকর বললে :

স্বপ্নে মগ্ন ছিলে
এতক্ষণ—এখন সবলে চক্ষু মেলে
জেগে চেয়ে দেখো।

সুপ্রিয় তখন তার মনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে তা ব্যক্ত করলে :

মিথ্যা তব স্বর্গধাম,

মিথ্যা দেবদেবী ক্ষেমংকর—ভ্রমিলাম
বৃথা এ-সংসারে এতকাল। পাই নাই
কোনো তৃপ্তি কোনো শাস্ত্রে, অন্তর সদাই
কেঁদেছে সংশয়ে। আজ আমি লভিয়াছি
ধর্ম মোর, হৃদয়ের বড়ো কাছাকাছি।
সবার দেবতা তব, শাস্ত্রের দেবতা
আমার দেবতা নহে। প্রাণ তার কোথা;
আমার অন্তরমাঝে কই কহে কথা;
কী প্রশ্নের দেয় সে উত্তর—কী ব্যথার
দেয় সে সান্ত্বনা। আজি তুমি কে আমার
জীবনতরণী 'পরে রাখিলে চরণ
সমস্ত জড়তা তার করিয়া হরণ
এ কী গতি দিলে তারে! এতদিন পরে
এ মর্ত্যধরণী মাঝে মানবের ঘরে
পেয়েছি দেবতা মোর।

মালিনীর নতুন ভাব সুপ্রিয়রও উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে লক্ষ্য করে ক্ষেমংকর বললে:

হায় হায় সখে,
আপন হৃদয় যবে ভুলায় কুহকে
আপনারে, বড়ো ভয়ংকর সে সময়—
শাস্ত্র হয় ইচ্ছা আপনার, ধর্ম হয়
আপন কল্পনা। এই জ্যোৎস্নাময়ী নিশি
যে-সৌন্দর্যে দিকে দিকে রহিয়াছে মিশি
ইহাই কি চিরস্থায়ী? কাল প্রাতঃকালে
শতলক্ষ ক্ষুধাগুলা শতকর্মজালে
ঘিরিবে না ভবসিন্ধু—মহাকোলাহলে
হবে না কঠিন রণ বিশ্বরণস্থলে?
তখন এ জ্যোৎস্নাসুপ্তি স্বপ্নমায়া বলে
মনে হবে—অতি ক্ষীণ, অতি ছায়াময়।

যে সৌন্দর্যমোহ তব ঘিরেছে হৃদয়,
সেও সেই জ্যোৎস্নাসম—ধর্ম বল তারে ?
একবার চক্ষু মেলি চাও চারিধারে
কত দুঃখ কত দৈন্য, বিকট নিরাশা !
ওই ধর্মে মিটাইবে মধ্যাহ্ন-পিপাসা
তৃষ্ণাতুর জগতের ? সংসারের মাঝে
ওই তব ক্ষীণ মোহ লাগিবে কী কাজে ?

সে সুপ্রিয়াকে আরও বোঝালে :

বন্ধু, আর রক্ষা নাই।
এবার লাগিল অগ্নি। পুড়ে হবে ছাই
পুরাতন অট্টালিকা, উন্নত উদার,
সমস্ত ভারতখণ্ড কক্ষে কক্ষে যার
হয়েছে মানুষ।......

* * *

দেখো মনে স্মরি ;
আর্যধর্ম মহাদুর্গ এ তীর্থনগরী
পুণ্যকাশী। দ্বারে হেথা কে আছে প্রহরী ?
সে কি আজ স্বপ্নে রবে কর্তব্য পাসরি
শত্রু যবে সমাগত, রাত্রি অন্ধকার,
মিত্র যবে গৃহদ্রোহী, পৌর পরিবার
নিশ্চেতন ? হে সুপ্রিয়, তুলে চাও আঁখি।
কথা কও। বলো তুমি, আমারে একাকী
ফেলিয়া কি চলে যাবে মায়ার পশ্চাতে
বিশ্বব্যাপী এ দুর্যোগে, প্রলয়ের রাতে ?

ক্ষেমংকরের আহ্বানে সুপ্রিয় সাড়া দিলে, বললে, নিদ্রাহীন চোখে সে তার পাশে দাঁড়াবে।

ক্ষেমংকর বললে, এখানকার সৈন্যদের দ্বারা আর কাজ হবে না, সে তাই যাচ্ছে বিদেশ থেকে সৈন্য আনতে :

আবার ফিরিয়া পাবে
বন্ধুরে তোমার। শুধু মনে ভয় হয়
আজি বিপ্লবের দিন বড়ো দুঃসময়—
ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ধ্রুব বন্ধচয়,
ভ্রাতারে আঘাত করে ভ্রাতা, বন্ধু হয়
বন্ধুর বিরোধী। বাহিরিনু অন্ধকারে,
অন্ধকারে ফিরিয়া আসিব গৃহদ্বারে,
দেখিব কি দীপ জ্বালি বসি আছ ঘরে
বন্ধু মোর? এই আশা রহিল অন্তরে।

তৃতীয় দৃশ্য—অন্তঃপুর।

মহিষী রাজা সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছেন মালিনীকে না দেখতে পেয়ে। রাজা যুবরাজকে বললেন সৈন্যদলকে ডাকতে। এমন সময় সৈন্যরা ও প্রজারা মশাল জ্বালিয়ে সমারোহ করে মালিনীকে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে এলো। জনগণের উপরে মালিনীর এই প্রভাব দেখে রাজা খুব আনন্দিত হলেন। কিন্তু নবধর্মের নামে এই নতুন উন্মত্ততার প্রতি রানীর কিছুমাত্র বিশ্বাস নেই; তিনি রাজাকে বললেন গ্রহবিপ্রদের ডেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-আদি করাতে আর মালিনীর বিবাহের জন্যে স্বয়ংবর-সভা ডাকতে।

চতুর্থ দৃশ্য—রাজ-উপবন।

সুপ্রিয় মালিনীর কাছে এসেছে জীবনের পরমার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে। মালিনী বললে:

তুমিও কি মোর দ্বারে
আসিয়াছ দ্বিজোত্তম? কি দিব তোমারে?
কী তর্ক করিব? কী শাস্ত্র দেখাব আনি?
তুমি যাহা নাহি জান, আমি কি তা জানি?

সুপ্রিয় বললে:

জানিবার কিছু নাই, নাহি চাহি জ্ঞান।
সব শাস্ত্র পড়িয়াছি, করিয়াছি ধ্যান
শত তর্ক শত মত। ভুলাও, ভুলাও,
যত জানি সব জানা দূর করে দাও।

পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই
ওগো দেবী জ্যোতির্ময়ী—তাই আমি চাই
একটি আলোর রেখা উজ্জ্বল সুন্দর
তোমার অন্তর হতে।

মালিনী বললে, যে দেবতা একদিন বজ্রালোক হেনে তার মর্মে বিদ্যুন্ময়ী বাণী বলেছিল তার সন্ধান সে আজ আর পাচ্ছে না :

মনে হয়
বড়ো একাকিনী আমি, সহস্র সংশয়,
বৃহৎ সংসার, অসংখ্য জটিল পথ,
নানা প্রাণী, দিব্যজ্ঞান ক্ষণপ্রভাবৎ
ক্ষণিকের তরে আসে। তুমি মহাজ্ঞানী
হবে কি সহায় মোর ?

সুপ্রিয় বললে :

…প্রস্তুত রাখিব নিত্য
এ ক্ষুদ্র জীবন। আমার সকল চিত্ত
সবল নির্মল করি বুদ্ধি করি শান্ত
সমর্পণ করি দিব নিয়ত একান্ত
তব কাজে।

মালিনী সুপ্রিয়র আপনার জনদের কথা, বিশেষ করে তার বন্ধু ক্ষেমংকরের কথা জানতে চাইলে। ক্ষেমংকর সম্বন্ধে সুপ্রিয় বললে :

সূর্য সে আমার, আমি তার রাহু,
আমি তার মহামোহ ; বলিষ্ঠ সে বাহু,
আমি তাহে লৌহপাশ। বাল্যকাল হতে
দৃঢ় সে অটলচিত্ত, সংশয়ের স্রোতে
আমি ভাসমান। তবু সে নিয়ত মোরে
বন্ধুমোহে বক্ষমাঝে রাখিয়াছে ধরে
প্রবল অটল প্রেমপাশে, নিঃসন্দেহে
বিনা পরিতাপে ; চন্দ্রমা যেমন স্নেহে

সহাস্যে বহন করে কলঙ্ক অক্ষয়
অনন্ত ভ্রমণপথে।

কিন্তু

ব্যর্থ নাহি হয়
বিধির নিয়ম কভু, লৌহময়ী তরী
হ'ক না যতই দৃঢ়, যদি রাখে ধরি
বক্ষতলে ক্ষুদ্র ছিদ্রটিরে, একদিন
সংকটসমুদ্রমাঝে উপায়বিহীন
ডুবিতে হইবে তারে। বন্ধু চিরন্তন,
তোমারে ডুবাব আমি, ছিল এ লিখন।

মালিনী কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলে সে ক্ষেমংকরকে কেমন করে ডুবিয়েছে। তখন সুপ্রিয় প্রকাশ করে বললে, কেমন করে তার বন্ধু বিদেশে গেছে বিদেশ থেকে সৈন্য এনে কাশী থেকে নবধর্ম উন্মূলিত করবার অভিপ্রায়ে। এর মধ্যে মালিনীর প্রভাবে তার জীবনে নতুন চেতনা জেগেছে, 'সর্বজীবে দয়া' এই পুরাতন সত্য নতুন তেজে তার হৃদয় অধিকার করেছে; সে বুঝেছে, যাগযজ্ঞে তপস্যায় মুক্তি নেই, মুক্তি শুধু বিশ্বকাজে। তার অন্তরের এই নতুন উপলব্ধির কথা বন্ধু ক্ষেমংকরের কাছে ব্যক্ত করবার জন্য অধীর আগ্রহে সে দিন যাপন করছে, এমন সময়ে ক্ষেমংকরের পত্র এলো—

লিখেছে সে—
রত্নবতী নগরীর রাজগৃহ হতে
সৈন্য লয়ে আসিছে সে শোণিতের স্রোতে
ভাসাইতে নবধর্ম—ভিড়াইতে তীরে
পিতৃধর্ম মগ্নপ্রায়, রাজকুমারীরে
প্রাণদণ্ড দিতে।

এই পত্র সুপ্রিয়র নব-চেতনার উপরে এসে পড়ল একটা প্রচণ্ড আঘাতের মতো যার ফলে তার ও ক্ষেমংকরের প্রাচীন বন্ধুত্বের ভিত্তি নড়ে গেল। সে বললে, সেই পত্র সে রাজাকে দেখিয়েছে, রাজা গোপনে সৈন্যদল নিয়ে গেছেন ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করতে, আর—

আমি হেথা লুটাতেছি
পৃথ্বীতলে—আপনার মর্মে ফুটাতেছি
দন্ত আপনার।

মালিনী বললে :

হায়, কেন তুমি তারে
আসিতে দিলে না হেথা মোর গৃহদ্বারে
সৈন্যসাথে ? এ-ঘরে সে প্রবেশিত আসি
পূজ্য অতিথির মতো—সুচিরপ্রবাসী
ফিরিত স্বদেশে তার।

এমন সময় রাজা প্রবেশ করলেন ও ক্ষেমংকরকে বিনা ক্লেশে বন্দী করার আনন্দ-বার্তা জ্ঞাপন করলেন। রাজা সুপ্রিয়র প্রতি তাঁর অন্তরের প্রীতি ব্যক্ত করে বললেন সুপ্রিয় যা চায় তাই তিনি তাকে দেবেন। সুপ্রিয় বললে :

কিছু নহে, কিছু নহে, খাব ভিক্ষা করে
দ্বারে দ্বারে।

রাজা বললেন :

সত্য কহ, রাজ্যখণ্ড লবে ?

সুপ্রিয় বললে :

রাজ্যে ধিক্ থাক।

তখন রাজা বললেন :

অহো, বুঝিলাম এবে
কোন্ পণ চাহ জিনিবারে, কোন্ চাঁদ
পেতে চাও হাতে। ভালো, পুরাইব সাধ,
দিলাম অভয়। কোন্ অসম্ভব আশা
আছে মনে, খুলে বলো। কোথা গেল ভাষা!
বেশি দিন নহে, বিপ্র, সে কি মনে পড়ে
এই কন্যা মালিনীর নির্বাসন তরে
অগ্রবর্তী ছিলে তুমি। আজি আরবার
করিবে কি সে প্রার্থনা ? রাজদুহিতার

নির্বাসন পিতৃগৃহ হতে ? সাধনার
অসাধ্য কিছুই নাই—বাঞ্ছা সিদ্ধ হবে,
ভরসা বাঁধহ বক্ষমাঝে।

আর মালিনীর দিকে চেয়ে বললেন :

জীবন-প্রতিমে বৎসে—যে তোমার প্রাণ
রক্ষা করিয়াছে সেই বিপ্র গুণবান্
সুপ্রিয় সবার প্রিয়, প্রিয়দরশন,
তারে—

সুপ্রিয় বাধা দিয়ে বললে :

ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও হে রাজন্।
অয়ি দেবী, আজন্মের ভক্তি-উপহারে
পেয়েছে আপন ঘরে ইষ্টদেবতারে
কত অকিঞ্চন—তেমনি পেতেম যদি
আমার দেবীরে—রহিতাম নিরবধি
ধন্য হয়ে। রাজহস্ত হতে পুরস্কার!
কী করেছি ? আশৈশব বন্ধুত্ব আমার
করেছি বিক্রয়—আজি তারি বিনিময়ে,
লয়ে যাব শিরে করি আপন আলয়ে
পরিপূর্ণ সার্থকতা ? তপস্যা করিয়া
মাগিব পরমসিদ্ধি জন্মান্ত ধরিয়া—
জন্মান্তরে পাই যদি তবে তাই হ'ক—
বন্ধুর বিশ্বাস ভাঙি সপ্ত স্বর্গলোক
চাহি না লভিতে। পূর্ণকাম তুমি দেবী,
আপনার অন্তরের মহত্ত্বেরে সেবি
পেয়েছ অনন্ত শান্তি—আমি দীনহীন
পথে পথে ফিরে মরি অদৃষ্ট-অধীন
শ্রান্ত নিজভারে। আর কিছু চাহিব না—
দিতেছ নিখিলময় যে শুভকামনা

মনে করে অভাগারে তারি এক কণা
দিয়ো মনে মনে।

মালিনী পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্দীর কি বিচার তিনি করেছেন। রাজা বললেন, তার প্রাণদণ্ড হবে।

মালিনী বললে:

ক্ষমা করো—একান্ত এ প্রার্থনা আমার
তব পদে।

রাজা বললেন :

রাজদ্রোহী, ক্ষমিব তাহারে
বৎসে?

তখন সুপ্রিয় বললে :

কে কার বিচার করে এ সংসারে!
সে কি চেয়েছিল তব সসাগরা মহী
মহারাজ? সে জানিত তুমি ধর্মদ্রোহী,
তাই সে আসিতেছিল তোমার বিচার
করিতে আপন বলে। বেশি বল যার
সেই বিচারক। সে যদি জিনিত আজি
দৈবক্রমে—সে বসিত বিচারক সাজি,
তুমি হতে অপরাধী।

মালিনী বললে

রাখো প্রাণ তার,
মহারাজ। তার পরে স্মরি উপকার
হিতৈষী বন্ধুরে তব যাহা ইচ্ছা দিয়ো,
লবে সে আদর করি।

রাজা বললেন

কী বল সুপ্রিয়?
বন্ধুরে করিব বন্ধুদান?

সুপ্রিয় বললে

চিরদিন
স্মরণে রহিবে তব অনুগ্রহ-ঋণ,
নরপতি।

তখন রাজা বললেন, ক্ষেমংকরকে মুক্তি দেবার পূর্বে একবার তিনি তার বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখবেন—দেখবেন মরণ-ভয়ে সে কর্তব্যের পথ থেকে টলে কিনা। সুপ্রিয় বন্ধুকে তো পাবেই যদি তাতে তার তৃপ্তি না হয় তবে তাকে আরো দেবেন—দেবেন তাঁর হৃদয়ের সর্বোত্তম রত্ন। মালিনীর মুখে লজ্জার ঈষৎ আভা লক্ষ্য করে রাজা আনন্দিত হয়ে বললেন :

কন্যা, কোথা ছিল এ শরম
এতদিন! বালিকার লজ্জাভয়শোক
দূর করি দীপ্তি পেত অম্লান আলোক
দুঃসহ উজ্জ্বল। কোথা হ'তে এল আজ
অশ্রুবাষ্পে ছলছল কম্পমান লাজ—

সুপ্রিয় রাজপদতলে পড়েছিল, ক্ষেমংকরের মুক্তি আর মালিনীকে লাভ এই দুয়েরই জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে, রাজা বললেন :

উঠ, ছাড়ো পদতল।
বৎস, বক্ষে এস। সুখ করিছে বিহ্বল
দুর্ভর দুঃখেরি মতো। দাও অবসর,
হেরি প্রাণপ্রতিমার মুখশশধর,
বিরলে আনন্দভরে শুধু ক্ষণকাল।

সুপ্রিয় বাইরে গেল, আর মালিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা এই আনন্দিত স্বগত উক্তি করলেন :

বহুদিন পরে মোর মালিনীর ভাল
লজ্জার আভায় রাঙা। কপোল উষার
যখনি রাঙিয়া উঠে, বুঝা যায়, তার
তপন উদয় হতে দেরি নাই আর।
এ রাঙা আভাস দেখে আনন্দে আমার
হৃদয় উঠিছে ভরি—বুঝিলাম মনে
আমাদের কন্যাটুকু বুঝি এতক্ষণে

বিকাশি উঠিল—দেবী না রে, দয়া না রে,
ঘরের সে মেয়ে।

এর পর শৃঙ্খলবদ্ধ ক্ষেমংকরকে রাজার সামনে আনা হ'ল—

নেত্র স্থির, উর্ধ্বশির ভ্রূকুটির 'পরে
ঘনায়ে রয়েছে ঝড়, হিমাদ্রিশিখরে
স্তম্ভিত শ্রাবণ সম।

তাকে দেখে মালিনী বললে :

লোহার শৃঙ্খল
ধিক্কার মানিছে যেন লজ্জায় বিকল
ওই অঙ্গ 'পরে। মহত্ত্বের অপমান
মরে অপমানে। ধন্য মানি এ পরান
ইন্দ্রতুল্য হেন মূর্তি হেরি।

রাজা বন্দীকে বললেন :

কী বিধান
হয়েছে শুনেছ ?

ক্ষেমংকর বললে :

মৃত্যুদণ্ড।

রাজা বললেন :

যদি প্রাণ
ফিরে দিই, যদি ক্ষমা করি !

ক্ষেমংকর বললে :

পুনর্বার
তুলিয়া লইতে হবে কর্তব্যের ভার,—
যে-পথে চলিতেছিনু আবার সে-পথে
যেতে হবে।

রাজা বললেন : তাহলে বাঁচতে চাও না। বেশ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। প্রার্থনা যদি কিছু থাকে তবে তা বল। ক্ষেমংকর বললে :

আর কিছু নাহি
বন্ধু সুপ্রিয়েরে শুধু দেখিবারে চাহি।

রাজা প্রতিহারীকে আদেশ করলেন সুপ্রিয়কে ডেকে আনতে। মালিনী বললে :

হৃদয় কাঁপিছে বুকে।
কী যেন পরমাশক্তি আছে ওই মুখে
বজ্রসম ভয়ংকর। রক্ষা করো পিতঃ,
আনিয়ো না সুপ্রিয়েরে।

রাজা বললেন, শঙ্কার কোনো কারণ নাই।

সুপ্রিয় এসে ক্ষেমংকরকে আলিঙ্গন করতে চাইলে। ক্ষেমংকর আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান করে বললে :

থাক্ থাক্,
যাহা বলিবার আছে আগে হয়ে যাক্—
পরে হবে প্রণয়সম্মান। এস হেথা।
…আমার বিচার হল শেষ—আমি চাই
তোমার বিচার এবে। বল মোর কাছে
এ কাজ করেছ কেন?

সুপ্রিয় বললে :

বন্ধু এক আছে
শ্রেষ্ঠতম, সে আমার আত্মার নিশ্বাস,
সব ছেড়ে রাখিয়াছি তাহার বিশ্বাস,
প্রাণসখে, ধর্ম সে আমার।

ক্ষেমংকর বললে :

জানি জানি
ধর্ম কে তোমার। ওই স্তব্ধ মুখখানি
অন্তর্জ্যোতির্ময়, মূর্তিমতী দৈববাণী
রাজকন্যারূপে, চতুর্বেদ হ'তে সখে
কেড়ে লয়ে পিতৃধর্ম ওই নেত্রলোকে
দিয়েছ আহুতি তুমি। ধর্ম ওই তব।
ওই প্রিয়মুখে তুমি রচিয়াছ নব
ধর্মশাস্ত্র আজি।

ক্ষেমংকরের শ্লেষপূর্ণ বাক্যের উত্তরে স্বপ্রিয় পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বললে :

সত্য বুঝিয়াছ সখে।
মোর ধর্ম অবতীর্ণ দীন মর্ত্যলোকে
ওই নারীমূর্তি ধরি। শাস্ত্র এতদিন
মোর কাছে ছিল অন্ধ জীবনবিহীন ;
ওই দুটি নেত্রে জ্বলে যে উজ্জ্বল শিখা
সে-আলোকে পড়িয়াছি বিশ্বশাস্ত্রে লিখা—
যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা প্রেমস্নেহ,
যেথায় মানব, যেথা মানবের গেহ।
......ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে, সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে
চাহি ওই উষারুণ করুণ বদনে।
ওই ধর্ম মোর।

তখন ক্ষেমংকর বললে :

আমি কি দেখি নি ওরে ?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের ঘোরে
এসেছে অনাদি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষ-মন কেড়ে নিয়ে যেতে
স্বর্গপানে ? ক্ষণতরে মুগ্ধ হৃদয়েতে
জন্মে নি কি স্বপ্নাবেশ।............
............তবু কি সবলে
ছিঁড়ি নি মায়ার বন্ধ, যাই নি কি চলে
দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুকের মতো
লই নি কি শিরে ধরি অপমান শত
হীনহস্ত হতে—সহি নি কি অহরহ
আজন্মের বন্ধু তুমি তোমার বিরহ।

শেষে তীব্র শ্লেষে বললে :

সিদ্ধি যবে লব্ধপ্রায়—তুমি হেথা বসে
কী করেছ—রাজগৃহমাঝে সুখালসে
কী ধর্ম মনের মতো করেছ সৃজন
দীর্ঘ অবসরে ?

বাদপ্রতিবাদের ধারা এড়িয়ে সুপ্রিয় বললে :

ওগো বন্ধু, এ ভুবন
নহে কি বৃহৎ ? নাই কি অসংখ্য জন
বিচিত্র স্বভাব ? কাহার কী প্রয়োজন
তুমি কি তা জান ? গগনে অগণ্য তারা
নিশিনিশি বিবাদ কি করিছে তাহারা
ক্ষেমংকর ? তেমনি জ্বালায়ে নিজ জ্যোতি
কত ধর্ম জাগিতেছে তাহে কোন্ ক্ষতি।

কিন্তু ক্ষেমংকর এসব তর্ককে "বাক্য লয়ে মিথ্যা খেলা" মনে করলে, তার মতে—

সত্যমিথ্যা পাশাপাশি নির্বিরোধে রবে
এত স্থান নাহি নাহি অনন্ত এ ভবে।
অন্নরূপে ধান্য যেথা উঠে চিরদিন
রোপিবে তাহারি মাঝে কণ্টক নবীন
হে সুপ্রিয়, প্রেম এত সর্বপ্রেমী নয়।
ছিল চিরদিবসের বিশ্রব্ধ প্রণয়
আনিবে বিশ্বাসঘাত বক্ষমাঝে তার
বন্ধু মোর, উদারতা এত কি উদার!
কেহ বা ধর্মের লাগি সহি নির্যাতন
অকালে অস্থানে মরে চোরের মতন,
কেহ বা ধর্মের ব্রত করিয়া নিষ্ফল
বাঁচিবে সম্মানে সুখে, এ ধরণীতল
হেন বিপরীত ধর্ম এক বক্ষে বহে—
এত বড়ো এত দৃঢ় কভু নহে নহে।

ক্ষেমংকরের এই কঠিন অভিযোগে সুপ্রিয় মালিনীর দিকে ফিরে বললে :

হে দেবী, তোমারি জয়! নিজ পদ্মকরে
যে পবিত্র শিখা তুমি আমার অন্তরে
জ্বালায়েছ—আজি হল পরীক্ষা তাহার—
তুমি হলে জয়ী। সর্ব অপমানভার
সকল নিষ্ঠুরঘাত করিনু গ্রহণ।
রক্ত উচ্ছ্বসিয়া উঠে উৎসের মতন
বিদীর্ণ হৃদয় হতে,—তবু সমুজ্জ্বল
অম্লান অচল দীপ্তি করিছে বিরাজ
সর্বোপরি। ভক্তের পরীক্ষা হল আজ,
জয় দেবী।

ক্ষেমংকরকে সে বললে :

ক্ষেমংকর, তুমি দিবে প্রাণ,—
আমার ধর্মের লাগি করিয়াছি দান
প্রাণের অধিক প্রিয় তোমার প্রণয়,
তোমার বিশ্বাস। তার কাছে প্রাণভয়
তুচ্ছ শতবার।

কিন্তু ক্ষেমংকর বললে, এসব প্রলাপবাণী ছাড়তে হবে—

মৃত্যু যিনি তাঁহারেই ধর্মরাজ জানি,—
ধর্মের পরীক্ষা তাঁরি কাছে…
সব চেয়ে বড়ো আজি মনে কর যারে
তাহারে রাখিয়া দেখো মৃত্যুর সম্মুখে।

সুপ্রিয় বললে :

বন্ধু, তাই হ'ক।

তখন ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে কাছে ডেকে 'লহ তবে বন্ধুহস্তে করুণ বিচার—এই লহ' বলে শৃঙ্খলদ্বারা সুপ্রিয়র মস্তকে আঘাত করলে। সুপ্রিয় মাটিতে পড়ে গেল। মৃত্যুর পূর্বে সে বললে—'দেবী তব জয়।' এর পর ক্ষেমংকর সুপ্রিয়র মৃতদেহের উপরে পড়ে বললে :

এইবার
ডাকো, ডাকো ঘাতকেরে।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে হুংকার দিলেন :

কে আছিস ওরে !

আন্ খড়্গ ।

মালিনী বললে :

মহারাজ ক্ষম ক্ষেমংকরে ।

বলে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ল ।

কবি বলেছেন, গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ ইংরেজ সাহিত্যিক ট্রেভেলিয়ান এই নাটকে গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছিলেন, কেননা গ্রীক নাট্যের মতো এর নাট্যরূপ সংযত সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন। কবির আরো কয়েকখানি নাটকে এমন সংযত সংহত রূপ আমরা দেখব। যেখানে দ্রষ্টা হয়েই কবি বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন, স্রষ্টা হয়ে উঠবার প্রয়োজন তেমন বোধ করেন নি, সেখানে এই ব্যাপারটি ঘটেছে।

এর সবগুলো চরিত্রই স্পষ্ট, এমনকি ব্রাহ্মণরাও। রানীর চরিত্রের পরিচয় আমরা দিয়েছি। এর রাজা প্রধানত একজন স্নেহপ্রীতিময় সজ্জন। মালিনীর নব অনুরাগ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি অতি হৃদ্য।

এর প্রধান চরিত্র তিনটি—মালিনী, ক্ষেমংকর আর সুপ্রিয়। মালিনীর বয়স অল্প। কিন্তু এই অল্পবয়সে বৌদ্ধধর্মের "সর্বজীবে দয়া" মন্ত্র তার হৃদয় অধিকার করেছে। সে জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কিন্তু অন্তরে সে এক বিদ্যুন্ময়ী বাণী লাভ করেছে—সে যেন পারে জগৎ-তরণীর কর্ণধার হতে, তার হৃদয় যেন অমৃতের পাত্র, সে যেন বিশ্বের ক্ষুধা মিটাতে পারে। তাই সে রাজ-অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেছে জনগণের মাঝে। জনগণও তাকে পেয়ে তার কথা শুনে উল্লসিত। হৃদয়বত্তার শক্তি এর পূর্বে আমরা দেখেছি 'বিসর্জনে'র অপর্ণাতে। তবে অপর্ণা দুঃখীর কন্যা, তাই সংসার সম্বন্ধে মালিনীর চেয়ে অভিজ্ঞা। কিন্তু মালিনীর অনভিজ্ঞতা ও হৃদয়ধর্ম এই দুয়ের যোগ অপূর্ব হয়েছে। মালিনী সত্যই আমাদের হৃদয় জয় করে।—বলা যেতে পারে মালিনী-চরিত্রে বাস্তবতা নেই, সে idea মাত্র। কিন্তু idea এতখানি আন্তরিকতা-সম্পন্ন যে সেই idea-ই বাস্তব হয়ে উঠেছে। যে-কোনো বাস্তব মানুষের মতো—অথবা তার চাইতেও বেশি—মালিনী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কবির অকৃত্রিম অনুভূতির সত্য এখানে জয়ী হয়েছে।

ক্ষেমংকরের মতো প্রাচীন প্রথার প্রবল সমর্থক কবি তাঁর বহু লেখায় দাঁড় করিয়েছেন, তারা পরিপূর্ণতা—অবশ্য সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা—লাভ করেছে 'গোরা'য়। ক্ষেমংকরের প্রতি কবি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, সে যে স্বদেশের চিরাচরিত ধারায় গভীরভাবে শ্রদ্ধাবান আর সেই পথে অকুতোভয় প্রধানত সেই জন্য। কিন্তু প্রবল সংকল্প আর বুদ্ধির কিছু তীক্ষ্ণতা এই দুই গুণের সঙ্গে তাতে যোগ ঘটেছে প্রবল অন্ধতার—সেই অন্ধতার বশে সুপ্রিয়র অন্তরের দিকে সে ভালো করে চাইতে পারল না, শুধু তার মনে হ'ল সে দেশের প্রাচীন ধর্মের রক্ষার জন্য এত দুঃখ-লাঞ্ছনা স্বীকার করেছে আর সুপ্রিয় আপন সুখের সন্ধানই করেছে; তাই সে সুপ্রিয়কে আহ্বান করল ধর্মবিশ্বাসের জন্য তারই মতো মৃত্যুর সম্মুখীন হতে। সুপ্রিয় যখন তাতে সম্মত হ'ল তখনও সে তার আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হ'ল না। তার হাতে মৃত্যু লাভ করেও সুপ্রিয় যখন কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করলে না তখন সুপ্রিয়র মহত্ত্ব সম্বন্ধে তার চৈতন্য হ'ল।

সুপ্রিয়কে প্রভাতবাবু বলেছেন, দুর্বল—এমনকি ভীরু। কিন্তু এমনি ভাবে তার দিকে তাকালে তাকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হয়। সে ক্ষেমংকরের মতো অচল অটল নয়। কিন্তু তার আসল কারণ তার চিত্তের সচেতনতা, সেই সচেতনতার জন্য অন্ধভাবে কোনো মত পোষণ তার দ্বারা সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু যা সে সংগত মনে করে তার সমর্থনে কখনো সে পশ্চাৎপদও হয় নি—ব্রাহ্মণরা যখন সমস্বরে মালিনীর নির্বাসন চেয়েছিল তখন সে প্রশ্ন তুলেছিল—ধর্ম নির্দোষের নির্বাসন? ক্ষেমংকরের গোপন চিঠি সে রাজাকে দেখিয়েছিল যা সে ধর্ম বলে জানে তার নিরাপত্তার জন্য; কিন্তু এতে যে বন্ধুর বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে এই অপরাধবোধও তাতে প্রবল হয়ে দেখা দিল, আর সেজন্য রাজদত্ত পুরস্কার এমনকি মালিনীকে লাভ করতেও সে স্বীকৃত হয় নি। রাজার মুখে যখন সে শুনল যে তিনি ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন তখনই সে রাজার প্রসন্নতা প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। কর্তব্যের অনুরোধে হলেও ক্ষেমংকরের প্রতি সে যে অন্যায় করেছে এই বোধের জন্যে ক্ষেমংকরের কঠোর অভিযোগেরও তেমন কোনো উত্তর সে দেয় নি, আর তার নির্মম শৃঙ্খলাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েও সে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করে নি, বরং

যা সে ধর্ম বলে জেনেছে তারই প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এমন চরিত্রকে দুর্বল ও ভীরু বললে সাহিত্যে সবলতা দুর্বলতা অর্থ হারায়।

মালিনী কবির একটি বিশিষ্ট রচনা। কবির যে আনুষ্ঠানিক ও পৌরাণিক ধর্মজটিলতা-বিহীন প্রেম-ও-বিশ্বসেবা-পন্থী ধর্মসাধনা তা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে এতে।

সমাজ

'সমাজ' বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। এর বেশির ভাগ লেখা 'সাধনা'র বিভিন্ন সংখ্যায় বেরিয়েছিল। এর দুইটি লেখা—'হিন্দুবিবাহ' ও 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে'—ভারতী ও বালক-এ যথাক্রমে ১২৯৪ ও ১২৯৬ সালে বেরিয়েছিল। এর 'কোট বা চাপকান' ভারতীতে বেরিয়েছিল ১৩০৫ সালে; ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শনে' বেরিয়েছিল 'নকলের নাকাল', 'ব্যাধি ও প্রতিকার', আর ('নকলের নাকাল' সম্বন্ধে) আলোচনা। এর 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটি য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি-র প্রথম খণ্ডে বেরিয়েছিল, আর 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবাসীতে বেরিয়েছিল ১৩১৫ সালে।

বিভিন্ন সময়ে লেখা হলেও এসবে কবির যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা মোটের উপর একই, তবে প্রকাশ-ভঙ্গিতে পার্থক্য রয়েছে। কবির প্রথম যুগের লেখাগুলোয় প্রতিপক্ষের প্রতি শ্লেষ মাঝে মাঝে বেশ তীব্র হয়েছে—উপভোগ্যও হয়েছে।

রচনার অনুক্রম অনুসারে আমরা লেখাগুলোর আলোচনা করব। 'হিন্দুবিবাহ' লেখাটি সম্পর্কে প্রভাতবাবু বলেছেন:

> ...পার্ক স্ট্রীটের বাসায় আছেন, বাংলার উদীয়মান লেখক ও বাগ্মী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম যুবক কর্মী ও নেতা বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন, প্রতিক্রিয়াপন্থী নব্যহিন্দুদের সামাজিক মতামত যে ভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করিতেছে, তাহার যথোপযুক্ত প্রতিরোধ করা হইতেছে না। ...এই সময়ে চন্দ্রনাথ বসু হিন্দুপত্নীর আদর্শ, হিন্দু-বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এইসব

প্রবন্ধের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথকে লেখনী ধারণ করিবার জন্য বিপিনচন্দ্র অনুরোধ আনিয়াছিলেন।*

এই লেখাটির সূচনায় কবি অধ্যাপক সীলির Natural Religion গ্রন্থ থেকে একটি গভীর-অন্তর্দৃষ্টি-পূর্ণ মন্তব্য উদ্ধৃত করেন, তার বাংলা অনুবাদ তিনি এই দেন :

যাঁহারা কোনো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণদশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু-অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রণালী, এমনকি ধর্মনীতি সেই সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কখন এক সময়ে সেই সমাজে জরা প্রবেশ করিয়াছে; সে-সমাজ মানবের বুদ্ধি ও জীবনস্রোতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। যে অকপট বিশ্বাস পূর্বে সকলকে উদ্যমশীল কার্যে ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এখন সে-বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। তাহার জীবন্ত উদ্যম কচিৎ ক্ষণস্থায়ী চকিত চেষ্টায় পর্যবসিত হয়, তাহার বক্তৃতাবেগ শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহার নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন আত্ম-বলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমে বাহ্য প্রথায় পরিণত হয়। ক্রমে অবসাদ অশান্তি ও সংশয় বাড়িতে থাকে। এই মতবিরোধের সময় কতকগুলি লোক উঠেন, তাঁহারা বিবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মতের জীর্ণতম অংশগুলিই সম্মুখে সাজাইয়া আস্ফালন করিতে থাকেন; যেগুলি মনে মনে সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ করেন সেইগুলিই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন, কারণ বিরোধী পক্ষ সেইগুলিকেই অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ক্রমে এতদূর পর্যন্তও হইতে পারে যে, যাহা নৈতিক দুর্দশার কারণ তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়া প্রচার করেন, অথচ ইহার অসংগতি নিজেই মনে না বুঝিয়া থাকিতে পারেন না। প্রথমে অল্পে অল্পে চক্ষু ফুটিতে থাকে এবং জোর করিয়া নিজমত সমর্থন

* রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেন, পরে ক্রমে আপন মত অন্যায় জানিয়াও স্পষ্ট কাপট্য অবলম্বন করেন।

কবি অল্প-বয়সেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়েছিলেন—আর পড়েছিলেন যথেষ্ট যত্ন নিয়ে। তার ফলে প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অল্প-বয়সেই তিনি আহরণ করেছিলেন। সীলির যে মন্তব্যটি তিনি উদ্ধৃত করেছেন সেটি আর মানুষের কর্তব্যনীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক হক্সলির মতও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার পরিণতি দানে যথেষ্ট সহায় হয়েছিল মনে হয়। অবশ্য এর সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিগত প্রেম, শুভাকাঙ্ক্ষা আর আশাবাদিতার কথাও ভুলবার নয়।

এমন উৎকৃষ্ট সম্বলের গুণে কবির বক্তব্য সহজেই অনেক বেশি সারগর্ভ হয়েছিল তাঁর প্রতিপক্ষের মুখ্যত ভাববিলাসী বক্তব্যের তুলনায়।

এই প্রবন্ধটি দীর্ঘ। প্রতিপক্ষের বক্তব্য যে তথ্য ও যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে কত দুর্বল নিপুণ ভাবে তা তিনি প্রদর্শন করেন। প্রবন্ধের শেষে তাঁর বক্তব্যের একটি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি তিনি দেন। তার কিছু কিছু অংশ এই :

> হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচনা না করাতে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ে পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে।
>
> যাঁহারা বলেন, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ দম্পতির একীকরণতার প্রতি, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ-দেশে কোনোক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।
>
> আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কি। উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।··· তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার জন্য।
>
> সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ

সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্তমান সমাজে বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

…কেহ কেহ বলেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ দিলেই আর কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষের বিবাহবয়স বাড়িলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদের বয়সও বাড়াইতে হইবে নয় পুরুষের বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুর সময় হইতে কমিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান-উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ নহে, অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ থাকিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য। এইজন্য স্ত্রীর অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি, মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীরই থাকিতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণসকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

কিন্তু পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে। আমি দেখাইয়াছি, কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্তীপ্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব একমাত্র বাল্যবিবাহদ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা করা উচিত কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

উপসংহারে কবি বলেন:

যাঁহারা বাল্যবিবাহ দূষণীয় জ্ঞান করেন অথবা সুবিধার অনুরোধে

ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্বক বাল্যবিবাহ উঠানো যায় না। কারণ, ভালোরূপ শিক্ষা-ব্যতিরেকে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবে। যেখানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে, যেখানে হয় নাই সেখানে এখনও বাল্যবিবাহ উপযোগী। আমাদের অন্তঃপুরে, আমাদের সমাজে, অনেক অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে এবং আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের ভিতরকার শিক্ষায় বাল্যবিবাহ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে ; অতএব অগ্রে শিক্ষার প্রভাবে সে-সকলের পরিবর্তন না হইলে কেবল আইনের জোরে ও বক্তৃতার তোড়ে সর্বত্রই বাল্যবিবাহ দূর করা যাইতে পারে না।

এই সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তিতে কবির তীক্ষ্ণ শ্লেষের প্রায় সবটাই বাদ পড়ে গেছে।

এই প্রবন্ধে কবির বাস্তবমুখী দৃষ্টি খুবই লক্ষণীয়—ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং সমসাময়িক বাস্তবতা দুই দিকেই কবির দৃষ্টি প্রখর। লেখাটি সুবিখ্যাত সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন হলে পঠিত হয়েছিল। সভায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপস্থিত ছিলেন। রচনাটি শুনে তিনি নাকি বলেছিলেন, "আমি মহেশ, আমি চারি হস্তে লেখককে আশীর্বাদ করিতেছি।"

বলা যেতে পারে কবি এতে রক্ষণশীলতার পরিচয়ও কম দেন নি, কেননা তিনি বাল্যবিবাহ অনেকটা সমর্থন করেছেন। এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না। রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে কবির সময় লেগেছিল —হয়তো অনেকটা তাঁর আপনার জনদের প্রভাবের ফলে—তবে তাঁর দৃষ্টি যে বিশেষ ভাবে সংগত ও শোভনের দিকেই তার পরিচয় স্পষ্ট।

"রমাবাইয়ে বক্তৃতা উপলক্ষে" লেখাটিতে কবির প্রধান বক্তব্য এই যে প্রকৃতি পুরুষ ও মেয়েকে বিভিন্ন রকমের করে গড়েছেন, সেজন্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরিণতি লাভের ধারা বিভিন্ন ; প্রকৃতির নির্দেশিত সেই বিভিন্নতা লঙ্ঘন করা কারো সাধ্য নয়। কবির বক্তব্যের একটি অংশ এই :

কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয়-অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে-সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম, তা স্বাধীন-

ভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম। ছোটো বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার পক্ষে পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম, সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনও পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপর রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্য সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মতো আশ্রিত থাকতে পারলেই ভালো থাকত, কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্তব্যনিয়ম উলটে দেওয়া যায় না। যাই হ'ক, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

আমরা পরে দেখব নারী-জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে এই-ই কবির একমাত্র বক্তব্য নয়। তবে সে সম্পর্কে এটি তাঁর একটি প্রধান বক্তব্য বটে।

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধে কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে প্রাচ্যের আর প্রতীচ্যের প্রকৃতির বড়ো রকমের পার্থক্যের দিকে। তিনি লিখছেন :

আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখলুম, জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লামেণ্ট চলছে, —সকলেই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

অন্যত্র

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথ-রোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে এক-

একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতিবর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ করে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘন শৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। এর মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

কবির ধারণা হয়েছে প্রতীচ্যে যে পরিবার অনেকটা ভেঙে যাচ্ছে তার ফলে সেখানকার নারীদের জীবন ভারতবর্ষীয় নারীদের তুলনায় কিছু বেশি অসুখী হয়ে পড়েছে।

য়ুরোপীয় ও ভারতীয় জীবন-ধারায় বড়ো রকমের পার্থক্য সত্ত্বেও য়ুরোপের প্রভাবের ফলে ভারতের যে ভালোর দিকে কি ধরনের পরিবর্তন হবে সে সম্বন্ধে কবির বক্তব্য এই :

ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কি হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহ-প্রিয়, শান্তিপ্রিয় জাতই থাকব, তবে এখন যেমন 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ' তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে-বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা করে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিংবা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় বলে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলোর দ্বার খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিংবা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক-জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদার-স্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থ-

সামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

একালে আমরা দেখছি ভারতীয় জীবনেও এমন সব পরিবর্তন ঘটছে, যার সম্ভাবনার কথা সেই দিনে কবি তেমন ভাবেন নি। পরে অবশ্য তিনি সে বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। তবে সেই দিনে য়ুরোপে যে ধরনের পরিবর্তন হচ্ছিল তার সবটাই যে ভালো নয় কবির এই আশঙ্কা পরবর্তীকালে সমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। কবির এই সত্য ও কল্যাণের সহজবোধ খুব লক্ষণীয়। এই গুণে তাঁর রচনার মর্যাদা উত্তরোত্তর আরও বাড়বে মনে হয়, যেমন গ্যেটে ও টলস্টয়ের রচনার মর্যাদা বেড়েছে।

'মুসলমান মহিলা' লেখাটি হচ্ছে 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি'তে প্রকাশিত একটি লেখার সারসংগ্রহ—'সাধনা'য় বেরিয়েছিল ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। একজন ইংরেজ মহিলা তুরস্কে একটি লোমহর্ষণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সেই বিবরণটি লিখেছিলেন। 'সাধনা'য় সেটি উদ্ধৃত হয়েছিল এইভাবে :

> …জেনাবের (জয়নাবের) যখন দশ বৎসর বয়স এখন তাহার বাপ তাহাকে হীরাজহরতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপমায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষায় ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল, তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, আমাকে মারিয়া ফেলো, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।" ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সাও চাহি না, বরঞ্চ যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।" সে কহিল এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে।"

> তাহার রকম সকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, "যে-রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলে বিষম বিপদ ঘটিবে।" বাপ বহু যত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।
>
> বলিতে হৃৎকম্প হয়, পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুইটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠাইয়া দিল।
>
> মা কেবল একবার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই-চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এই বিবরণের উপরে কবি এই মন্তব্য করেন :

> এইরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনি যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে, পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলো আগড়মবাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

সাধনার পরের সংখ্যায় 'প্রাচ্য সমাজ' লেখাটি কবি প্রকাশ করেন। 'নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি'তে প্রকাশিত লেখাটির একটি জবাব উক্ত পত্রেই দেন খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাশীল জস্টিস্ আমির আলি। তাঁর জবাবের মর্ম কবি এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। খুব সংক্ষেপে তা এই :

> খৃস্টীয় সমাজে স্ত্রীলোকের দশা বহুকাল পর্যন্ত অত্যন্ত হীন ছিল। বহু খ্যাতনামা য়ুরোপীয় লেখকের লেখায় তার বিবরণ রহিয়াছে। ইহার পর মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রীপরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্যপদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে

নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ-প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইজন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

উপসংহারে জষ্টিস্ আমির আলি বলেন :

…কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে-সকল সংস্কারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই। মধ্যস্থ হইয়া তখনকার প্রবল সমাজের সহিত উপস্থিতমতো রফা করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে-দোষ মুসলমানধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞানবিদ্যা সভ্যতার অভাব।

এর উপরে কবি এই মন্তব্য করেন :

আমির আলি মহাশয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের উদয় হয়। এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল, ক্রমশ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে; এবং এককালে কোনো মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে-সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই—এ-কথা বর্তমানে মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি, বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এসিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।…

আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষ নিজের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করে; এইজন্য কোনো মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেবতা পদে স্থাপিত করে। তাহার পর হইতে তিনি যে-কয়টি কথা বলিয়া গিয়াছেন বসিয়া বসিয়া তাহার অক্ষর গণনা করিয়া জীবন যাপন করি, তিনি সাময়িক অবস্থার উপযোগী যে বিধান করিয়া গিয়াছেন

তাহার রেখামাত্র লঙ্ঘন করা মহাপাতক জ্ঞান করিয়া থাকি। পুনর্বার যুগান্তরে দ্বিতীয় মহৎলোক দেবতাভাবে আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত দ্বিতীয় পরিবর্তন প্রচলিত না করিলে আমাদের আর গতি নাই। আমরা যেন ডিম্ব হইতে ডিম্বান্তরে জন্ম গ্রহণ করি। একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙিয়া যে নূতন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠে না।

কবির শেষ মন্তব্যটি এই :

আসল কথা, বিশুদ্ধ জিনিসও অবরোধের মধ্যে দূষিত হইয়া যায় এবং বিকৃত বস্তুও মুক্তক্ষেত্রে ক্রমে বিশুদ্ধি লাভ করে। যে-সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীনবুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক। কারণ, তাহাতে বাতাস লাগে না, প্রকৃতির স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি তাহার উপর সম্পূর্ণ তেজে কাজ করিতে পায় না।

শুধু হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে নয় দেশের মুসলমানসমাজ সম্বন্ধেও কবির চিন্তা কত সত্যাশ্রয়ী ছিল এই ছোটো লেখা দুটি তার এক বড় প্রমাণ। Spirit of Islam-এর লেখক পণ্ডিতপ্রবর আমির আলির চিন্তার এই দুর্বলতা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল মুসলমানদের মধ্যে কোনো চেতনা জাগে নি। বর্তমানেও যে তেমন জেগেছে তা বলা যায় না।

'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' লেখাটিতে কবি দেখিয়েছেন চন্দ্রনাথবাবুর মতের অযৌক্তিকতা। তাঁর লেখায় স্বভাবতই প্রচুর শ্লেষ ব্যবহৃত হয়েছে। কবির দুই-একটি উক্তি এই :

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ-পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎসম্বন্ধে কোনো রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরুপুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথবাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।

এ-কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেছিলেন: নিরামিষ আহারে দেহমন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষ আহারে সেরূপ হয় না। তার উত্তরে কবি বলেন:

আমরা এক শতাব্দীর উর্ধ্বকাল একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি, মতপ্রচারের উৎসাহে চন্দ্রনাথবাবু সহসা তাহাদিগকে কী করিয়া ভুলিয়া গেলেন বুঝিতে পারি না। তাহারাই কি আমাদিগকে ভোলে না আমরাই তাহাদিগকে ভুলিতে পারি? তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে, এবং তাহাদের মনের পুষ্টি যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে আমাদেরই বোধশক্তির অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

এই ধরনের বাদ-প্রতিবাদ আমাদের দেশে এতদিনে অতীতের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি।

যত বড়ো কবি বা মনীষীই হোন সমসাময়িক জীবনের দায় ও দাবি তাঁকে মেটাতে হয়। দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেসব এড়িয়ে যেতে চান নি। জীবনের সঙ্গে যা যুক্ত তা তুচ্ছ দেখালেও আসলে তুচ্ছ নয়।

'কর্মের উমেদার' রচনাটি মুখ্যত শ্লেষাত্মক। চিন্তায় ও আচরণে আমরা বহুকাল ধরে যান্ত্রিকভাবে চলে আসছি—তাকেই কবি আঘাত করেছেন। এই লেখাটির একটি অংশ এই:

মাঝে ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চা[illegible] আনয়ন করিয়াছিল। বহুদিবসের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আ[illegible]বং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না। তাঁহারা উপদেশ দেন অদৃষ্টবাদ অতি পবিত্র, কারণ, তাহাতে স্বাধীন চেষ্টাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দেয়। সর্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখে। আমাদের যাহা আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র, কারণ, একথা স্মরণ রাখিলে স্বাধীন বুদ্ধি

এবং স্বাধীন চেষ্টাকে একেবারেই জবাব দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় এইসকল জ্ঞানগর্ভ কথা সাধারণের খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে, বহুকাল হইতে হৃদয় এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া আছে।

'আদিম আর্য-নিবাস' লেখাটি ঐতিহাসিক তথ্য-মূলক। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিভিন্ন ধরনের মতামতের উল্লেখ কবি করেছেন। সেমেটিক জাতি আর্যজাতির দলভুক্ত নয় এই ছিল এতদিনের মত। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচার করে কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেছেন সেমেটিকগণ হয়তো এককালে আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর উপরে কবি এই মন্তব্য করেছেন :

> আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক, কুটুম্বিতা যতই বাড়ে ততই ভালো।···
> ···ইংরেজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা তো আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদী মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয়গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্য-মাতার প্রথমজাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

এর পরের 'আদিম সম্বল' প্রবন্ধটি 'সাধনা'য় বেরিয়েছিল ১২৯৯ সালে, আষাঢ় সংখ্যায়। প্রবন্ধটি ছোটো, সহজ সরলভাবে লেখা ; কিন্তু আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছু কিছু অংশ এই :

> যে-জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে, তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি ; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোনো কাজে না খাটাইয়া মাটির নিচে [illegible]ক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।
>
> যেমন একটা [illegible] স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস, অর্থাৎ আর-একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোনো স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ-কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর-একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ-কথা স্বভাবতই অসংগত এবং অসহ্য মনে হয় ; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনই উন্নতিপথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার

সেখানে আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনি সত্যপ্রিয়তা আর-একটি। ছলনার প্রতি যে একটা ঘৃণা সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনই স্বভাবসুস্থ যুবক জাতি সহজেই সত্যাচরণ করে।

যদি বা কোনো বয়স্ক বিজ্ঞ লোক এমন মনে করেন কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে, অতএব সেইরূপ স্থলে অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসংগত; কথাটা যেমনই প্রামাণিক হউক তবু এ-কথা বলিতেই হইবে, যে-জাতির মাথায় এমন যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে।...

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনই। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাঁহারা খুব পাকা কথা বলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত পাকা কথা কোনো মানুষের মুখে শোভা পায় না।...

...এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙালিরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি কী হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না, জীবনলীলা আর-একবার পালটাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে আমরা কখনও একজাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি, ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সংকল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই-সমস্ত সমবেত হৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে

হইবে ; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে ; এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসংকোচে অসীম জনতার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদান-প্রদান করিতে থাকিবে ; তাহার জ্ঞানের খনি তাহার কর্মের ক্ষেত্র তাহার প্রেমের পথ সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে—তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে, তবে জাতির প্রথম সম্বল যে-স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীরত্ব বলে, বুড়োমানুষের মতো তর্ক করিয়া অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাহাকে নির্বাসিত করিলে চলিবে না।

আমরা দেখেছি কবি তাঁর নবযৌবনের 'একটি পুরাতন কথা'য় বঙ্কিমচন্দ্রের মতের বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। কবির ঐতিহ্য-চেতনার সঙ্গে সংগত ও শোভন সম্বন্ধে তাঁর এই প্রবল চেতনা যেন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে যুক্ত, অন্তত পরবর্তীকালে এই যোগ খুব স্পষ্ট হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশের অনেকে এ বিষয়ে তেমন সচেতন হন নি।

এর পরের প্রবন্ধ 'আচারের অত্যাচার'—১২৯৯ সালে 'সাধনা'র পৌষ সংখ্যায়, 'কড়ায়-কড়া কাহনে-কানা' নামে বেরিয়েছিল—চন্দ্রনাথ বসুর 'কড়াক্রান্তি' নামের প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে।

সেই 'কড়াক্রান্তি'র এই অংশটি কবি উদ্ধৃত করেন :

"ইংরেজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।…ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয় ; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না।… হিন্দু বলেন যে ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন।"

আর এর উপরে এই মন্তব্য তিনি করেন :

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার জো নাই—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, জোড়হস্তে বিনীত স্বরে আমরা

বলি, "প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ, ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ; এবং এই-সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে তো হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে তো তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কষিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে-পৃথিবী তো পর্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান, সে তো অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানব-প্রবাহ ও জগৎ-সংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া, কাহনকে কড়া-কড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিঁদু' হইব, মানুষ হইব না।"

এতে কবির শ্লেষ আগাগোড়া খুব উপভোগ্য হয়েছে।

এর পরের প্রবন্ধটি 'সমুদ্রযাত্রা'। এটি আজ অবশ্য আমাদের দেশের জন্যেও অতীতের বিষয়। কিন্তু কবির যুক্তি-তর্ক খুব লক্ষণীয়। এর কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।···

···আমরা কি নিজের কর্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিতে পারি না—পূর্বে কী ছিল এবং এখন কী আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজে যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব। আমাদের শুভাশুভ জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণসংহিতা আগমনিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইবে—সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি।

এর পরের লেখাটি 'কর্তব্যনীতি'—'সাধনা'য় বেরিয়েছিল, ১৩০০ সালের পৌষ সংখ্যায়। এটি হক্সলির Evolution and Ethics গ্রন্থের সারসংগ্রহ। এই লেখাটি যে গুরুত্বপূর্ণ সেকথা আমরা বলেছি। এর উপসংহার এই :

···জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরের কঠিন সাধনায় সিদ্ধ; কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে, এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে বোধ করি ততদিনই এই কঠিনপ্রাণ প্রবল শক্তির সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপরপক্ষে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্রে সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচার-প্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে, তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে-মানুষ নেকড়ে-বাঘের জাতভাইকে মেষরক্ষক কুকুরে পরিণত করিয়াছে, সে-মানুষ সভ্য

মানবের অন্তর্নিহিত বর্বর প্রবৃত্তিগুলিকেও যে বহুল পরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

জগতের অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে-আশা সফল করিতে হইলে দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভালো এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়া-সহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে-দিন গিয়াছে। তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইল সে-দিনও গেল; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব, কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না। ভালো যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব; হয়তো সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয়তো বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্বগৌরব আছে।

'বিদেশীয় অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য' প্রবন্ধে কবি সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেনের কথা বলেছেন। রামমোহন রায়ের প্রচারিত একেশ্বরবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করে, তার ফলে আত্মীয়স্বজনের মায়া ত্যাগ করে সুইডেন থেকে সুদূর বাংলাদেশে তিনি আগমন করেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও আদর্শনিষ্ঠা সম্বন্ধে কবি বলেছেন:

পরজাতির গূঢ় হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিবার জন্য যে নম্রতাগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার বিশেষরূপে ছিল।—ছাত্রশিক্ষার যে-কার্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অসামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে অনাহারে অনিয়মে কলিকাতার পথে পথে সমস্তদিন পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রৌদ্রতাপ এবং উপবাস

তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিলেন। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব-উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন। বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্তদিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্নে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন—তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে স্টেশনে গমনপূর্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

অকালে তাঁর মৃত্যু হলে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক তাঁর প্রতি কিরূপ হৃদয়হীনের মতো ব্যবহার করেছিলেন সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না, আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা? তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের আসন, কুলীনের ঘরের কন্যা, যজমানের ঘরের দক্ষিণা চাহেন নাই; তিনি সুইডেনের উত্তরপ্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে-শ্মশানে 'হাড়িডোম' প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে, সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।

হায় বিদেশী, বঙ্গভূমির প্রতি তোমার কী অন্ধবিশ্বাস, কী দুঃসহ স্পর্ধা। মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোনো অধিকার নাই।

'অযোগ্য ভক্তি' প্রবন্ধটি 'স্বাধীন ভক্তি' নামে 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল ১৩০৫ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। আমাদের দেশের যে বিচারহীন, অনেকটা জড়ধর্মী, ভক্তিপ্রবণতা তাকে কবি সবলে আঘাত করেছেন এতে। কবির কিছু কিছু মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি :

সাধারণত গুরুপুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের মতো পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরু ব্রহ্ম। এইরূপ ভক্তি দ্বারা আমরা যে

নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ-কথা আমরা মনেই করি না।...

...সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে; যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের পর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাহা এইরূপে ক্রমশই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

এই অশ্রান্ত সভ্যতাশক্তির উত্তেজনাতেই য়ুরোপখণ্ডে ভক্তিবৃত্তির জড়ত্বকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরেজ একজন লর্ডকে শুদ্ধমাত্র লর্ড বলিয়াই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং সেই সঙ্গে এইরূপ অযোগ্য ভক্তিকে "স্নবিসনেস" বলিয়া লাঞ্ছিত করে। ক্রমশ ইহার ফল দুইদিকেই ফলে,—অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অসংগত ভক্তি শিথিল হয় এবং অভিজাতগণও এই বরাদ্দ ভক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোনো নিন্দনীয় কাজ করিতে সাহস করেন না।

...ভক্তির দ্বারা যে-বিনতি আনয়ন করে সে-বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার, শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্য-প্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি, অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

...আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেব-চরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে-মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে-পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে-লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্ত জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের জন্যও

কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে-সকল দেবতার পুরাণবর্ণিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেকস্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

···মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ। কিন্তু যদি সে ভুল করে, অতএব তাহাকে বাঁধো ; আমি বুদ্ধিমান যে-ঘানিগাছ রোপণ করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনোদিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না—আমি ঠিক করিয়া দিলাম কোন্ তিথিতে মূলা খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার মূলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইলে তাহার কী উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ নাই, কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতিহাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কবির এই সব কথা আজো নিত্যপাঠ্য হওয়া উচিত দেশের বিকাশোন্মুখ তরুণসমাজের।

'সমাজে'র অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলোর মধ্যে 'পূর্ব ও পশ্চিম' খুব বিশিষ্ট। অন্যগুলোর আবেদন বেশির ভাগ সাময়িক। এটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালের ভাদ্রে, অর্থাৎ প্রথম বোমা-নিক্ষেপের পরে। আমাদের জাতীয় জীবনে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সম্বন্ধের সেই সংকট-মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও কল্যাণ-বুদ্ধি এক আশ্চর্য সমুন্নতি লাভ করেছিল—সত্যকার ভবিষ্যৎদ্রষ্টার পরিচ্ছন্ন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন ভারতবাসী ও ইংরেজ দুয়েরই স্খলন পতন ত্রুটি আর নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন কোন্‌টি তাদের জন্য ভবিষ্যতের সার্থক পথ। আজও তাঁর সেই নির্দেশ অসাধারণভাবে অর্থপূর্ণ।—এর কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি :

ভারতবর্ষে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এদেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে ;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র

অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

...পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ-কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না।

...ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ— আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান। একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

...অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী,

তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এই-রূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর, আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন।

…দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন।

…অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে।

…একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে-দিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলন-যজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধি-লাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ সাহিত্য সেইসকল কৃত্রিম বন্ধন

ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধা-গ্রস্ত হয়।

…ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আফিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই।

…ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এইজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

…আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না, ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে, ধর্মে, সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে, নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না, এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি।

দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে বহু রচনা কবি রেখে গেছেন। সেসবের সঙ্গে পরিচয়ের পরে আমরা যোগ্যভাবে উপলব্ধি করতে পারব তাঁর সামাজিক চিন্তার ক্রমোৎকর্ষ, ব্যাপকতা, আর গভীরতা।

"এবার ফিরাও মোরে"

কল্পনা

জীবন যেন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেই প্রবাহ তো আমরা দেখেই থাকি—জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পরেও ইচ্ছা করলে সেই প্রবাহের অস্তিত্বের কথা ভাবা যায়। অবশ্য সেই প্রবাহ সরলরেখায় চলে না, নানা বাঁক বন্দর ঘুরে ফিরে তা চলে। তার স্রোতও সর্বত্র সমান বেগে প্রবাহিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে তেমন প্রবাহই আমরা দেখেছি—দেখেছি একই সঙ্গে এর অশ্রান্ত ধারা আর এর বিচিত্র বাঁক বন্দর। কল্পনার সময় থেকে তাঁর কাব্য-জীবনে যে-ধারার শুরু হ'ল তার নামকরণ আমরা করেছি, 'এবার ফিরাও মোরে'। 'এবার ফিরাও মোরে' বাণী কবি অবশ্য উচ্চারণ করেন ১৩০০ সালের শেষের দিকে। তারও পূর্বসূচনা তাঁর রচনায় রয়েছে। তবে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রচনা থেকে তাঁর প্রতিভার একটি বিশিষ্ট গতি সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। ১৩০৪ সালের 'কল্পনা' 'কথা' 'কাহিনী' প্রভৃতির কবিতাগুলো থেকে তাঁর জীবনের সেই নতুন দিক্-পরিবর্তন আরও লক্ষণীয় হয়েছে। এই নামকরণের দ্বারা সেই কথাই আমরা বলতে চেষ্টা করেছি।—বহুদিন পূর্বে অজিত চক্রবর্তী মহাশয় এটি লক্ষ্য করেছিলেন। প্রভাতবাবু কবির জীবনের এই বাঁক ফেরার ব্যাপার তেমন আমল দেন নি। বোধ হয় তার কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথকে মুখ্যত শিল্পীরূপে দেখেছেন। বলা বাহুল্য প্রভাতবাবুর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করতে পারি নি।

'কল্পনা' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের বৈশাখে। কিন্তু এর অনেকগুলো কবিতাই ১৩০৪ সালে লেখা। এর প্রথম কবিতাটি 'দুঃসময়'—রচনার তারিখ ১৫ই বৈশাখ ১৩০৪। 'চৈতালি'র শেষ কবিতা লেখার পরে কয়েক মাস কবির কাব্য-রচনা এক রকম বন্ধ ছিল। কিন্তু সেইজন্য কবি এই কালকে 'দুঃসময়' বলেন নি। আমরা দেখে আসছি বেশ কিছুকাল ধরে কবির ধারণা হয়েছে তাঁর বীণাপাণি তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন। এইকালেও তিনি

অবশ্য মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি, আরও পাবো; কিন্তু এই ধারণা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না যে তাঁর কাব্যরচনার কাল শেষ হয়ে গেছে—নতুন এক কাল তাঁর জীবনে উপস্থিত। 'ছিন্নপত্রাবলী'র শেষেও এই মনোভাবের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁর এই নতুন চেতনা তাঁকে যে সবকিছু গভীর গম্ভীর ভাবে দেখতে বলছে আনন্দচঞ্চল কবির জন্য সত্যই সেটি দুঃসময়জ্ঞাপক। তবে এই দুঃসময় কবি এড়াতে চাচ্ছেন না। মরমী সাধকদের অনেকেরই জীবনে এমন 'দুঃসময়', অর্থাৎ দোটানার অনেকটা তীব্র বেদনা-ভোগ, এসেছিল। এ সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি কার্ডিন্যাল নিউম্যানের একটি কবিতার এই ক'টি চরণ সুপরিচিত :

Lead, Kindly Light, amid encircling gloom
　　Lead Thou me on!
The night is dark, and I am far from home—
　　Lead Thou me on!

কবি হাফিজও বলেছেন :

শবে তারীক ও বীমে মওজ ও গিরদ্ আবে চুনিন হায়েল।
কুজা দানন্দ্ হালে মা সুবুক্ সারানে সাহিল হা॥

অন্ধকার রাত উর্মিসংঘাত ঘূর্ণাবর্তও তুমুল গর্জে—
বেলায় বাস যার বুঝবে ছাই তার পথের ক্লেশ মোর সমুন্দর যে।

(কবি নজরুলের অনুবাদ)

'দুঃসময়' কবিতাটিতে কবি একটি পাখির ছবি এঁকেছেন—যে সমস্ত দিন উড়ে উড়ে ফিরেছে, কিন্তু সন্ধ্যার সময়ে দেখছে অন্ধকার এগিয়ে আসছে, চারদিক ঢাকা পড়ছে, সঙ্গী তার কেউ নেই। বলা বাহুল্য, এই পাখি কবির নিজেরই মন। কবি তাকে সমঝাচ্ছেন—এই অন্ধকার দেখে ভীত হয়ো না—

উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি তোমাপানে আছে চাহিয়া।

অবশ্য উর্ধ্ব আকাশের তারার এই অভয়ের সঙ্গে 'নিম্নে গভীর অধীর মরণ'ও শত তরঙ্গে ধেয়ে আসছে। কিন্তু এমন দিনেও কবি মনকে বলছেন—আর

কিছু না থাকুক তোমার ওড়বার পাখা তো আছে, আর নিবিড় অন্ধকারের পরে উষা দেখা দেবে এও সত্য, কাজেই—

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ ক'রো না পাখা !

অর্থাৎ এই দুঃসময় কবির জন্য পূর্ণ দুঃসময় নয়। এই দুঃসময় আপেক্ষিক। কবি সামনের পথ পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছেন না ; আশঙ্কাও তাঁর মনে কিছু আছে ; কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উষার আশ্বাসও অনুভব করছেন।

সেই দূরের উষার এই বর্ণনা কবি দিয়েছেন—

উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।

অন্ধকারের ভিতর থেকে উষার প্রথম প্রকাশের অপূর্ব বর্ণনা এটি। দিশাহারা কথাটিতে উষার সূচনায় পুব-আকাশের অনেকটা জায়গায় যে আলোর আভাস ফোটে শুধু তাই নয়, সংশয়ের পরে কবির নতুন আশার উচ্ছ্বসিত রূপও ফুটেছে।

এর পরের কবিতাটি 'বর্ষামঙ্গল'—১৭ই বৈশাখে রচিত। মেঘগর্জন, ঘনবর্ষণ এসবে কবির সুগভীর আনন্দ রূপ পেয়েছে এতে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, কালিদাস প্রমুখ কবিদের অনেক পদের ছায়া পড়েছে এর বহু চরণের উপরে। চারুবাবুর বইতে সেসব সম্পর্কে অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যাবে।

কবির মনটি কিছু চিন্তাভারাক্রান্ত বলেই যেন ঘনবর্ষণের আনন্দ তাঁর জন্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে :

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সনসন বন-বীথিকা।
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

এর পরের কবিতাটি 'চৌর-পঞ্চাশিকা'। সংস্কৃত চৌর-পঞ্চাশিকা কাব্যের স্মরণে এটি লেখা। কাশ্মীরের কবি বিল্‌হণ গুজরাটের রাজকন্যার প্রণয়ভাজন

হন। তাঁদের গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পেরে রাজা কবিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই সময় তিনি তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশে পঞ্চাশটি আদিরসাত্মক কবিতা রচনা করেন—সেই কবিতাগুলোর নাম চৌর-পঞ্চাশিকা। কবিতা শুনে রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যার সঙ্গে কবির বিবাহ দেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলো স্মরণ করে বলছেন, সেই সুন্দর চোর ও তার প্রেয়সী আজ অনন্ত ঘুমঘোরে নিমগ্ন; কিন্তু কবির যে প্রেমাবেগ তার কাব্যে রূপ পেয়েছিল তা আজও পাঠকদের মনে তীব্র ব্যথা হেনে ফিরছে :

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজবালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত
ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুকসারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ জোড়।

'রাজবালিকার সোহাগে লালিত' কথাটি লক্ষণীয়। সেই 'সোহাগ' কবির বাণীকে প্রাণময় করেছে।

কবি কীট্‌স্‌-এর Ode on a Grecian Urn কবিতাটি এই সম্পর্কে স্মরণীয়। সেখানে কবি বলেছেন জীবনের কোনো এককালের কোনো একটি রূপ শিল্পে যদি মূর্ত হয় তবে তা সংসারের পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে অমরতা লাভ করে। কবি গ্যেটেও শিল্পের এই ক্ষমতার কথা বলেছেন।

এই কবিতাটির অন্য একটি পাঠও আছে। তবে এই প্রচলিত পাঠটিই বেশি ভাল।

এর পরের কবিতাটি 'স্বপ্ন'। কবি কল্পনার সাহায্যে কালিদাসের কাব্য-জগতে উপনীত হয়ে সেকালের জীবনধারা, বিশেষ করে সেকালে যিনি কবির প্রিয়া ছিলেন তাঁকে, প্রত্যক্ষ করছেন। কবি তাঁর প্রিয়াকে চিনলেন, কবির পূর্বজন্মের সেই প্রথমা প্রিয়াও কবিকে চিনলেন, কিন্তু কথা বলতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন :

সে-ভাষা ভুলিয়া গেছি—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর।
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

সেই পূর্বজন্মে তাঁদের পরস্পরের প্রেমপ্রীতি আদান-প্রদানের কথা স্মরণ করতে তাঁরা বহু চেষ্টা করলেন :

দুজনে ভাবিনু কত দ্বার-তরুতলে।
নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—

কিন্তু সব বৃথা—

"কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি"।

মনে হয় কবি বলতে চেয়েছেন : অতীতের বর্ণনা পড়ে কল্পনার সাহায্যে তাকে আমরা মনের সামনে উপস্থিত করতে পারি; তখন মনে হয় তাকে যেন পুরোপুরি দেখছি, তাকে যেন জানি; কিন্তু আসলে তার মর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে না—সেক্ষেত্রে আমরা দুই স্বতন্ত্র জগতের লোক।

কালিদাসের 'মেঘদূত' 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি কাব্যের অনেক বর্ণনার ছায়া এই কবিতাটির বিভিন্ন চরণের উপরে পড়েছে।

এর পরের দুইটি কবিতা 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পর'। প্রাচীনকালের কাব্যে মদনকে দেহী কল্পনা করা হয়েছে, তার সায়কের আঘাতে তরুণ তরুণী, হরিণ হরিণী, বাঘ বাঘিনী, সবাই চঞ্চল হ'ত। কবি বলছেন মদনের সেই সায়কের আঘাত জগতে আজও পরম-আকাঙ্ক্ষিত :

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্যমালা জড়ায়ে অলকে,
এস গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিতশিখা প্রদীপ-আলোকে।
এস চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত করো বধূরে হরষে,

নবীন করো মানব-ঘর ধরণী করো বিবশা
দেবতাপদ সরস-পরশে।

কিন্তু হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হয়ে যায়। তারপর সে হয়েছে অনঙ্গ। কবি বলেছেন অনঙ্গ রূপে মদন জগতে আরও প্রতাপশালী হয়েছে। সে শুধু মানুষের উপরেই যে তার প্রভাব বিস্তার করেছে, তাই নয় প্রকৃতির উপরেও তার প্রভাব অতিশয় ব্যাপক হয়েছে :

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরানমন উল্লাসি
হৃদয় উঠে লতার মতো জড়ায়ে;
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

ফ্রয়েড প্রমুখ মনস্তত্ত্ববিদেরা অনঙ্গের অতি গূঢ় প্রভাব সর্বত্র দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু কবি সেই কথাটি বলেছেন যথেষ্ট আব্রু রেখে—কবিত্বময় ভাষায়।

কল্পনার জগতে, অর্থাৎ প্রাচীন কাব্যকলার জগতে, কিছু ঘোরাফেরা করে কবি ফিরেছেন তাঁর 'কল্পনা' কাব্যের যে মুখ্য জগৎ, অর্থাৎ গম্ভীর ভাব-ভাবনার জগৎ, তাতে। অজানা মনোহরের উদ্দেশে কবির অন্তরে যে একটি গভীর অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে তা প্রকাশ পেয়েছে এর পরের কয়েকটি কবিতায়। যে-রূপকল্পনা কবি ব্যবহার করেছেন তাতে সহজেই বৈষ্ণব জগতের রাধা ও কৃষ্ণের অথবা কৃষ্ণের ও গোপিকার ছবি উঁকি মেরেছে।

'মার্জনা' কবিতাটিতে কবি বলছেন তাঁর হৃদয় যে নব অনুরাগে ধৈর্যহীন হয়ে পড়তে চাচ্ছে প্রিয়তম যেন তাঁর সেই অধৈর্য মার্জনা করেন। নব-অনুরাগ-জনিত অধৈর্যের রূপটি এতে মনোহর হয়েছে :

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা ক'রো মার্জনা, ক'রো মার্জনা।

তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়াপানে চেয়ো না বন্ধু চেয়ো না।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু-হাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
ওগো প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে করো মার্জনা, করো মার্জনা,

'চৈত্ররজনী' কবিতায় কবি বলছেন, চৈত্ররজনী উন্মাদ মধুনিশি, সেই রজনীতে কত জায়গায় কত কানাকানি কত মন-জানাজানি কত সাধাসাধি চলেছে; কিন্তু এই মধুনিশিতে কবি নিঃসঙ্গ। চৈত্র-নিশীথ-শশীকে তিনি বলছেন :

মোরে দেখো চাহি, কেহ কোথা নাহি,
শূন্য ভবন-ছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি
চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্র-নিশীথ-শশী।

এর পরের 'স্পর্ধা' কবিতাটি অপূর্ব। প্রিয়া তার অন্তরের অনুরাগ প্রিয়তমের কাছে ব্যক্ত করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রিয়তম তার সেই সংকোচ ভেঙে দিয়ে তার দ্বিধাহীন প্রেম জানাচ্ছে। তাতে প্রিয়া মুখে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করছে, কিন্তু প্রিয়তমের সেই স্পর্ধায় অন্তরে অন্তরে গভীর সন্তোষ লাভ করছে :

সে আসি কহিল, "প্রিয়ে মুখ তুলে চাও।"
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, "যাও।"
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।

*   *   *

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
কেন সে এল না ফিরে।

সাধারণ প্রেমচিত্র হিসাবেও এটি উপভোগ করা যায়। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে ও সুফী সাহিত্যের পাঠকরা জানেন জীবাত্মার প্রেমলাভের জন্য পরমাত্মার কতখানি আগ্রহের কথা সেই সব কাব্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। মানবীয় প্রেমে আগ্রহের সেই ধরনের প্রকাশ অনেকটা বাড়াবাড়ি মনে হয়।

'স্পর্ধা' কবিতাটিতে আমরা দেখেছি প্রেমিকাকে আপন করে নেবার জন্যে প্রেমিকের আগ্রহ। তার পরের 'পিয়াসী' কবিতাটিতে আঁকা হয়েছে সেই আগ্রহের শান্ত রূপ। প্রেমিকা কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সেই দিকেই তার দৃষ্টি। শুধু বাইরের জগতের নানা আভাস ইঙ্গিত তার মনকে মাঝে মাঝে একটু উতলা করে। কিন্তু প্রেমিক শান্তভাবে তার জন্য অপেক্ষাই করে আছে।

এর পরের কবিতাটি 'পসারিনী'।

চারুবাবু বলেছেন, বৈষ্ণব কবি বংশীবদনের একটি কবিতা কবিকে হয়তো তাঁর 'পসারিনী' কবিতাটি লিখবার প্রেরণা দিয়েছিল। কবি বংশীবদনের কবিতাটি এই :

> হেদে লো বিনোদিনী, এ পথে কেমনে যাবে তুমি!
> শীতল কদম্ব-তলে বৈসহ আমার বোলে,
> সকলি কিনিয়া নিব আমি।
> এ ভর দুপুরবেলা তাতিল পথের ধূলা,
> কমল জিনিয়া পদ তোরি।
> রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি' লাগে বড় দুখ,
> শ্রম-ভরে আউল্যাল কবরী।
> অমূল্য রতন সাথে, গোঙারের ভয় পথে,
> লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
> তোমার লাগিয়া আমি, এই পথে মহাদানী
> তিল আধ না যাও ছাড়িয়া।

বংশীবদনের কবিতাটির রূপকও স্পষ্ট। গোপিকা বা মানুষ তার পসরা নিয়ে যাচ্ছে সংসারের হাটে বেচাকেনা করতে; মহাদানী, অর্থাৎ মহাশুল্ক আদায়কারী বা মহা আড়তদার শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপিকা বা মানুষকে বলছেন তার পসরাভার তাঁকেই সমর্পণ করতে, অন্যথায় সেই পসরা পথের গোঙারদের হাতে, অর্থাৎ রিপু-আদির হাতে, লুট হয়ে যাবার ভয় আছে। কিন্তু

'পসারিনী' কবিতায় পথে যিনি পসারিনীরূপী কবিকে তার পসরাভার নামিয়ে দুপুরে জিরুতে বলছেন তিনি পসারিনীকে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করে তার শ্রান্তি দূর করতে বলছেন—সেই বিশ্রামের পরে আবার সে হাটের পথে রওনা হতে পারবে। কবির মনে যে ক্লান্তি এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে পরম-মোহনের জন্য অনুরাগও জন্মেছে, উদ্বেগশূন্য হয়ে সেই অবস্থায় কিছুকাল কবির কাটুক, মনে হয় এই কবির বক্তব্য। ভগবানের সঙ্গে কবির যে যোগ ঘটেছে তার নিবিড় আনন্দ তিনি উপভোগ করছেন; কিন্তু তাঁতে সর্বস্ব সমর্পণ বলতে যা বোঝায় সে ভাব এখনও কবির মনে প্রবল নয়। তাছাড়া জীবাত্মার ও পরমাত্মার একীভবন বলতে যা বোঝায় তা যে কবির অভিপ্রেত নয় তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। (তাঁর 'সোনার তরী'র 'লজ্জা' কবিতাটি স্মরণীয়।)

এর পরের 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটি সুবিখ্যাত। প্রেমিকা প্রেমিককে আত্মদান করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু প্রেমিক যখন তার খোঁজে এসে উপস্থিত তখন আত্মপ্রকৃতির সংকোচে সেই আকাঙ্ক্ষিত আত্মদান তার দ্বারা আর হয়ে উঠছে না। প্রেমিক সকালে এসে জিজ্ঞাসা করছে—সে কোথায়, সে কোথায়। সন্ধ্যায় এসে সেই প্রশ্নই করছে; কিন্তু প্রেমিকা সংকোচ কাটিয়ে বলতে পারছে না—সে যে আমি, সে যে আমি। তাই নির্জন রাত্রে প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য যত্নে সাজসজ্জা করে প্রতীক্ষাই করছে আর একা একা এই গান গাচ্ছে—হতাশ পথিক সে যে আমি, সেই আমি।

প্রাত্যহিক জীবনেও আমরা মহৎ-কিছুর জন্য নানাভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে চেষ্টা যে না করি তা নয়; কিন্তু সার্থকতা লাভের ক্ষণ যখন এসে উপস্থিত তখন কেমন করে যেন সেই সুযোগকে আমরা দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করতে পারি নে, আর তার পর অনুশোচনা করি।

কিন্তু এই সাধারণ ব্যাখ্যার চাইতে কবির মনের বিশেষ অবস্থার ছবি হিসাবে দেখলেই এই কবিতাটিকে বেশি উপভোগ করা যায়। কবির প্রতীক্ষার রূপটি এতে চমৎকার আঁকা হয়েছে। নানা ভাবরূপ রতনেভূষণে কবি-চিত্ত এখন সজ্জিত, সেই রতনভূষণের সাজ এই বিফল প্রতীক্ষার দিনে বড় করুণ হয়ে উঠেছে।

এর পরের কয়েকটি কবিতা অন্য ভাবের—প্রধানত স্বদেশপ্রেমাত্মক।

'প্রণয়প্রশ্ন' কবিতাটিতে কবি অনুরক্ত ভক্তের একটি ছবি এঁকেছেন। সেই ভক্তের চোখে তার ভক্তির পাত্রের রূপগুণের আর অন্ত নেই। ভক্তের সেই অনেকখানি প্রেমান্ধতায় বিস্মিত হয়ে কবি প্রশ্ন করছেন :

আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চিরজনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য।
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।

ভক্তের এই ভক্তিকে কবি অশ্রদ্ধা করছেন না ; কিন্তু ভক্তির এমন অসাধারণত্ব দেখে তিনি বিস্মিত হচ্ছেন। 'চৈতালি'তেও এই ধরনের ভাব ব্যক্ত হয়েছে।

এর পরের কবিতাটির নাম 'আশা'। তাতে কবি বঙ্গজননীকে বলছেন, "এ জীবন-সূর্য যবে অস্তে গেল চলি," অর্থাৎ তাঁর কবি-প্রতিভা যখন অস্ত-গমনোন্মুখ হ'ল, তখন স্বদেশজননী তাঁকে বরণ করলেন। কবির কণ্ঠে ছিল তাঁর এতদিনের সংগীতের পুরস্কারস্বরূপ একখানি কণ্টকিত কুসুমের ডোর। বঙ্গমাতা সেই মালা থেকে নিজ হাতে সব কাঁটা বেছে তার ধুলি ধুয়ে ফেলে তাকে শুভ্র করে কবির গলায় পরিয়ে কবিকে তাঁর চিরসন্তানরূপে বরণ করে নিলেন—এই কবির ধারণা হ'ল। আনন্দে তাঁর চোখে অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু যখন জেগে উঠলেন তখন দেখলেন, তিনি শুধু স্বপ্ন দেখছিলেন।

এই কবিতায় একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে পরিণত বয়সে কবির স্বদেশ-প্রেমের গাঢ়তা আর সেই সঙ্গে দেশের সত্যকার হিত সম্বন্ধে দেশের লোকদের অনুরাগের শোচনীয় অভাব।

এর পরের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় কবি বঙ্গমাতার মৌন অবিচল মধুর মঙ্গল-ছবি চোখ ভরে চেয়ে দেখছেন আর তার সঙ্গে স্মরণ করছেন বঙ্গমাতার সন্তানদের অকর্মণ্যতা ও দায়িত্বহীনতা।

এর 'শরৎ' কবিতাটি সুপরিচিত। বর্ষার পরে শরতের বাংলার প্রসন্ন রূপটি এতে বেশ আঁকা পড়েছে। তবে কবি যে বলেছেন :

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়
আয় তোরা সবে ছুটিয়া
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও-পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে
ও-পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

এটি বরং হেমন্তের বাংলার রূপ। মনে হয় কবি শরৎ আর হেমন্তকে একসঙ্গে করে দেখেছেন।

এর পরের দুইটি কবিতা যথাক্রমে, 'মাতার আহ্বান' ও 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ'। দুটিতেই ইংরেজের প্রসাদপ্রার্থী শিক্ষিত বাঙালীদের কবি গভীর ধিক্কার দিয়েছেন।

'হতভাগ্যের গান' কবিতাটিতে ভাগ্যের অনিশ্চয়তা ও ক্রূরতার প্রতি কবির উপেক্ষা পরম হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। 'ক্ষণিকা'র বাচনভঙ্গির পূর্বাভাস এতে লক্ষ্য করা যায়।

পরের তিনটি কবিতা যথাক্রমে, 'জুতা-আবিষ্কার', 'সে আমার জননী রে' ও 'জগদীশচন্দ্র বসু'। আচার্য জগদীশচন্দ্র এসময়ে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইংলণ্ডের গুণীদের গোচরে আনছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সাফল্যের জন্য কবির চেষ্টা তুলনাহীন।

এর পরে স্থান পেয়েছে অনেকগুলি গান—তার অনেকগুলি কবির এই-কালের বেদনাময় প্রেমের রঙে রঞ্জিত। এর 'বিদায়' গানটির উপরে সেদিনের রাজনৈতিক অত্যাচারের ছায়া পড়েছে এই প্রভাতবাবুর মত।

'সংকোচ' নামের গানটির :

যদি বারণ কর তবে
গাহিব না।

যদি শরম লাগে, মুখে
চাহিব না।

প্রভৃতি লীলাচপল পদ ঝড়ের দিনে চলন বিলে টলমল বোটের মধ্যে বসে লেখা। কবির আশ্চর্য মানসিক স্থৈর্যের পরিচায়ক বটে।

এর সুপরিচিত 'ভারতলক্ষ্মী' গানটির 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' প্রভৃতি পদ সুবিখ্যাত।

এর 'প্রকাশ' কবিতাটিতে কবি বলেছেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নিয়মের দ্বারা চালিত নয়, তার মধ্যে মোহন মধুর অনেক কিছু আছে; আর প্রকৃতির সেই মোহন মধুর রূপ ধরা পড়ে কবির চোখে—আর কারো কাছে নয়।

এর 'উন্নতিলক্ষণ' কবিতাটি ইংরেজদের স্তাবক সেকালের শিক্ষিত বাঙালীদের প্রতি ও হিন্দুত্বের তথাকথিত পুনরুজ্জীবন-বাদীদের প্রতি এক তীব্র শ্লেষ। এর কিছু অংশ আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুরশালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ?
সিংহ-দুয়ারে পথের দু-ধারে
রথের না দেখি অন্ত,—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সংকোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ।
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচাল হীনতাপঙ্ক?
ভারতের শুচি যশশশিরুচি
কে করিল অকলঙ্ক?

রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য ?

কবি জেনেছেন—

গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব
করিয়া উদর পূর্তি ;—
এঁরা বড় লোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্তি ।

বাঙালী-জীবনের এই সব নিন্দনীয় ব্যাপার কিছুদিনের মধ্যেই অনেকটা অতীতের বিষয় হয়ে পড়েছিল।

এর পরের কবিতাটি সুপ্রসিদ্ধ 'অশেষ'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। পরের 'বর্ষশেষ' কবিতাটির সঙ্গে এটি বিশেষভাবে যুক্ত।

কবি মনে করেছিলেন কবিরূপে তাঁর জীবনের কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্তরে নতুন আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে, সে-আহ্বান তাঁকে আর শান্তি উপভোগ করতে দেবে না। জীবন-দেবতার এ বড় নিষ্ঠুর আহ্বান :

রে মোহিনী রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসার-সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

কিন্তু কবি সেই নিষ্ঠুর আহ্বানও শিরোধার্য করছেন :

সেবক আমার মতো রয়েছে সহস্র শত
তোমার দুয়ারে,
তাহারা পেয়েছে ছুটি, ঘুমায় সকলে জুটি
পথের দু-ধারে।
শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে,
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারারাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

এর পরের কবিতার নাম 'বিদায়'। 'বিদায়' নামের একটি গানের সঙ্গে এর পূর্বে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সেটি ছিল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বা কঠোর রাজনৈতিক দণ্ডে দণ্ডিত দেশ-সেবকদের স্বদেশের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ। এই 'বিদায়' কবিতাটি মোটের উপর কর্মবিরতি বা বানপ্রস্থ অবলম্বন সম্পর্কিত বলা যেতে পারে। তবে কবির জীবনের এই যুগের কথা ভেবে মনে হয় কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যে নতুন সুগম্ভীর জীবনের অভিমুখী হয়েছেন তারই কথা বলা হয়েছে এতে। এর গাম্ভীর্য সেই ভাবের সঙ্গে বেশি সুসংগত :

দিনান্তের নম্র কর
পড়ুক মাথার 'পর,
আঁখি 'পরে ঘুম,
হৃদয়ের পত্রপুটে
গোপনে উঠুক ফুটে
নিশার কুসুম।
আরতির শঙ্খরবে
নামিয়া আসুক তবে
পূর্ণ পরিণাম,

হাসি নয় অশ্রু নয়
উদার বৈরাগ্যময়
বিশাল বিশ্রাম।

এর পরের কবিতা সুবিখ্যাত 'বর্ষশেষ'—১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে লেখা। কবি তাঁর 'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে এই লেখাটির উল্লেখ করেছেন।

চারুবাবু তাঁর বইতে ১৩৩২ সালের বৈশাখের 'শান্তিনিকেতন-পত্রিকা' থেকে এই কবিতা সম্পর্কে কবির এই গুরুত্বপূর্ণ উক্তিটিও উদ্ধৃত করেছেন :

> ১৩০৫ সালে বর্ষশেষ ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ঝড় দেখেছি।...এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যা-কিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে—ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনি ভাবে, চির-নবীন যিনি তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্যে। তিনি জীর্ণতার আড়াল সরিয়ে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করলেন। ঝড় থামল। বললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে কতদিন কাটালুম, এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হল না। যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে যায়, তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মমতায় বাধা দেয়। ঝড় এসে আমার মনের ভিতরে নাড়া দিয়ে গেল, আমি বুঝলুম বেরিয়ে আসতে হবে।

এ সম্বন্ধে প্রভাতবাবু লিখেছেন :

> কবি স্পষ্ট করিয়া বেরিয়ে আসার ব্যাখ্যা করেন নাই। কেবল 'ভারতী'র সম্পাদকত্ব ত্যাগ নিশ্চয়ই এতবড় কবিতার উৎস হইতে পারে না। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পুরাতন জোড়াসাঁকোর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নূতন জীবন যাপন করিতে গ্রামে আসিতেছেন, এই কবিতা তাহাই সূচিত করিতেছে। যখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন, যখন তাঁহার সমশ্রেণীর জমিদারগণ সকলেই নগরবাসের সুখসম্ভোগ ও উত্তেজনার জন্য গ্রামত্যাগী, ঠিক সেই সময়েই তিনি সপরিবারে কলিকাতা মহানগরীর মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে নূতন নীড় রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বলা বাহুল্য তাঁর ব্যাখ্যা কৃপণ ধাতের—তাই গ্রহণ করা যায় না। কবির ইঙ্গিত যথেষ্ট স্পষ্ট।

ঝড়ের দিনে লেখা এই কবিতাটি একটি ঝড়ের কবিতাও বটে। ঝড়ের আয়োজন, তার ভ্রূকুটি, তার উদ্দাম আবর্তন, আর শেষে তার বিরতি বিভিন্ন স্তবকে অদ্ভুত ছন্দোবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাইরের ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনের এক বড় ঝড়েরও অপূর্ব বর্ণনা এটি :

আনন্দে আতঙ্কে মিশি, ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হ'ক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে
উড়ে হ'ক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।
মুক্ত করি দিনু দ্বার,—আকাশের যত বৃষ্টিঝড়
আয় মোর বুকে,
শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়-গর্জন-স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।

যে মহাজীবন (কবির ভাষায় রুদ্র) আজ ঝড়ের রূপ নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল তার সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে তাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করছেন এইভাবে :

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে

তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ
প্রণমি তোমারে।

শেলীর Ode to the West Wind কবিতাটির সঙ্গে এর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। তবে শেলী ঝড়কে বলছেন জগতে নবমন্ত্র উদ্‌ঘোষণে তাঁর বিষাণ হতে—

Be through my lips to unawakened earth
The trumpet of a prophecy !

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চাচ্ছেন তাঁর অন্তরপ্রকৃতির ও তাঁর দেশের ধিকৃত জীবনের প্রলয়-উত্তীর্ণ এক অভিনব সত্তা :

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

কবির অন্তরের একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়। এর ভাষায় ও ছন্দে সেই বিপ্লবের বিস্ফুলিঙ্গ। কবির প্রথম জীবনের প্রবল ঐতিহ্যবোধ থেকে তাঁর এই কালের প্রবল নিত্যধর্ম-বোধের অভ্যুদয় তাঁর অন্তর্জীবনের এক বৈপ্লবিক ঘটনা নয় কি ?

তাঁর ভগবৎ-চেতনাও (তার অন্য নাম গভীরতম ও ব্যাপকতম জীবন-বোধ) অভাবিত ভাবে শক্তিলাভ করে চলেছিল—তারও দাহ প্রচণ্ড বটে।

কবির শিলাইদহে বাসাবাঁধা তাঁর এই অন্তর্বিপ্লবের একটি বাহ্য লক্ষণ। টলস্টয়, মহাত্মা গান্ধী, এঁদের জীবনে যে এমন বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তা সুপরিচিত ব্যাপার।

তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাঁর অন্তর্বিপ্লব বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে তাঁর সাহিত্যেই।

এর ষোড়শ স্তবকের "সেথা মোরে ফেলে দিও অনন্ত-তমিস্র সেই" চরণে দুই মাত্রা কম আছে। কিন্তু পড়ার সময়ে 'সেই' কথাটিতে যে সুর লাগে তাতে সেই কম্‌তি পুষিয়ে যায়।

এর পরের 'ঝড়ের দিনে' কবিতাটির 'সাহসিকা' কে? কবির নব অনুরাগ বলা যেতে পারে—সেই অনুরাগ দুর্গম পথে বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু 'আমি' কে? 'আমি' হয়তো সংকল্প। অনুরাগের সঙ্গে সংকল্পের যোগ ঘটলে তাদের যাত্রা 'মত্ত ভয়ংকর' হতে পারে। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে নব অনুরাগের তেমন যোগ ঘটে না। নব অনুরাগ অনেক সময়ে ভীরু, আর আপন ভাবেই বিভোর—

কেন আজি যাও একাকিনী?
কেন পায়ে বেঁধেছ কিঙ্কিণী?
এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে
বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?
কোথা আজি যাও একাকিনী?

এর পরের 'অসময়' কবিতাটি 'দুঃসময়' কবিতাটির অনুরূপ। এর শেষ স্তবকে ব্যক্ত হয়েছে কবির নব আশা—

দীর্ঘ ভ্রমণ এক দিন হবে অস্ত রে,
শান্তি-সমীর শ্রান্ত শরীর জুড়াবে।
দুয়ার-প্রান্তে দাঁড়ায়ে বাহির প্রান্তরে
ভেরী বাজাইব মোর প্রাণপণ প্রয়াসে।

'বসন্তে' কবিতাটিতে কবি স্মরণ করছেন অতীতের বহু বসন্ত-দিনের সুখ-স্মৃতি—সেই বসন্তদিনগুলিই তাঁর ব্যর্থ জীবনের কয়েকখানি পরম অধ্যায়—

ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস,
তোমার কুসুম-গন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলেস্থলে
হইবে প্রকাশ।

* * *

অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মর নিশ্বাসে,
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

পূর্বের '১৪০০ সাল' কবিতার সঙ্গে এটি পঠনীয়।

এর পরের 'ভগ্ন মন্দির' কবিতায় কবি তাঁর দেশকে দেখেছেন ভগ্ন মন্দিরের দশায়—

পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারাদিন ফিরে উদাসীন
কার প্রসাদের ভিখারি।
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায়
চির উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে
পূজাহীন তব পূজারি।

এর পরের কবিতাটি বিখ্যাত 'বৈশাখ'। এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কবি চারুবাবুকে লিখেছিলেন :

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা ; বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ ; কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত-কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। তুমি আমার বৈশাখ কবিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ। বলা বাহুল্য এটা শেষ-জাতীয় কবিতা। এর সঙ্গে জড়িত আছে রচনাকালের সমস্ত-কিছু। যেমন 'সোনার তরী' কবিতাটি।...ভরা পদ্মার উপরকার ঐ বাদলা-দিনের ছবি 'সোনার তরী'

কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত। 'বৈশাখ' কবিতার মধ্যে মিশিয়ে আছে শান্তিনিকেতনের রুদ্রমধ্যাহ্নের দীপ্তি। যেদিন লিখেছিলুম, সেদিন চারিদিক থেকে বৈশাখের যে তপ্তরূপ আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল সেইটেই ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই দিনটিকে যদি ভূমিকারূপে ঐ কবিতার সঙ্গে তোমাদের চোখের সামনে ধরতে পারতুম তা হলে কোনো প্রশ্ন তোমাদের মনে উঠত না।

তোমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নিম্নের দুটি লাইন নিয়ে—

ছায়ামূর্তি যত অনুচর
দগ্ধতাম্র দিগন্তের কোন্ রন্ধ্র হতে ছুটে আসে।

খোলা জানলায় বসে ঐ ছায়ামূর্তি অনুচরদের স্বচক্ষে দেখেছি শুষ্ক রিক্ত দিগন্তপ্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে প্রেতের মতো হুহু করে ছুটে আসছে ঘূর্ণানৃত্যে, ধুলা বালি শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়ে। পরবর্তী শ্লোকেই ভৈরবের অনুচর এই প্রেতগুলোর বর্ণনা আরো স্পষ্ট করেছি, প'ড়ে দেখো। তার পর এক জায়গায় আছে—

সকরুণ তব মন্ত্র সাথে
মর্মভেদী যত দুঃখ বিস্তারিয়া যাক বিশ্ব 'পরে—

এই দুটো লাইনেরও ব্যাখ্যা চেয়েছ।

সেদিনকার বৈশাখমধ্যাহ্নের সকরুণতা আমার মনে বেজেছিল বলেই ওটা লিখতে পেরেছি। ধু ধু করছে মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, কাছে আমলকী গাছগুলোর পাতা ঝিলমিল করছে, ঝাউ উড়ছে নিঃশ্বসিত হয়ে, ঘুঘু ডাকছে স্নিগ্ধ স্বরে,—গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশের চিলের ডাক, রাঙা মাটির ছায়াশূন্য রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্তস্বর, সমস্তটা জড়িয়ে মিলিয়ে যে একটি বিশ্বব্যাপী করুণার সুর উঠতে থাকে, নিঃসঙ্গ বাতায়নে বসে সেটি শুনেছি, অনুভব করেছি, আর তাই লিখেছি।

বৈশাখের অনুচরীর যে ছায়ানৃত্য দেখি সেটা অদৃশ্য নয় তো কি? নৃত্যের ভঙ্গি দেখি, ভাব দেখি, কিন্তু নটী কোথায়? কেবল একটা আভাস মাঠের উপর দিয়ে ঘুরে যায়। তুমি বলছ, তুমি তার ধ্বনি শুনেছ, কিন্তু যে দিগন্তে আমি তার ঘূর্ণিগতিটাকে দেখেছি সেখান থেকে কোনো শব্দই

পাই নি। বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে তরুরিক্ত বিশাল প্রান্তরে যে চঞ্চল আবির্ভাব ধূসর আবর্তনে দেখা যায়, তার রূপ নয়, তার গতিই অনুভব করি; তার শব্দ তো শুনিই নে। এ-স্থলে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে যাবার জো নেই।

কবি বলেছেন, শান্তিনিকেতনের মাঠে এক বৈশাখ-দিনে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা হয়েছিল তাই তিনি 'বৈশাখ' কবিতাটিতে ব্যক্ত করেছেন। কবির এই উক্তির সঙ্গে আর-একটি কথা যোগ করবার আছে—সেটি হচ্ছে তাঁর এই কালের মানস। তার ফলে সহজেই তাঁর মনে সর্বত্যাগী মহাদেবের চিত্র উদিত হয়েছে। তাঁর এই কালের অনেক কবিতায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুর কিছু তীব্রভাবে লেগেছে। বিশাল বৈরাগ্যে আবৃত জগতের একটি বিশেষ শোভা তাঁর চোখে পড়েছে। প্রাচীন ভক্তদের ভাষায় এটি বিরহদশা।

এর পরের কবিতা 'রাত্রি'। রাত্রির সুগম্ভীর সুপ্তি অপূর্ব রূপ পেয়েছে এতে :

নক্ষত্র-রতন-দীপ্ত নীলকান্ত সুপ্তি-সিংহাসনে
তোমার মহান্ জাগরণ।

'সেই নিস্তব্ধ জাগরণতলে' কবিও থাকতে চাচ্ছেন 'নির্নিমেষ পূর্ণ সচেতন'। কবির মনে পড়ছে এমন নিস্তব্ধ রাত্রে কেমন করে যুগে যুগে নতুন ব্রহ্মমন্ত্র ঋষিকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে :

স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ
অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি
সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে
আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।
পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণা-কাতর,
চকিতে বিদ্যুৎ-রেখাবৎ
তোমার নিখিল-লুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী
দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।

'অশেষ', 'বর্ষশেষ', 'বৈশাখ' এই তিনটি কবিতার সঙ্গে এই কবিতাটি পঠনীয়।

এর পরের কবিতা 'অনবচ্ছিন্ন আমি'। এটি একটি সনেট। কবি দেখছেন,

জলস্থল দূর করে অর্থাৎ তার স্থূলত্ব ভেদ করে অন্তর্যামী ব্রহ্ম বিরাজ করছেন, সেই ব্রহ্মের মাঝে দেখলেন স্পন্দমান 'আমি'-কে।—কবির এমন ভাবের সঙ্গে 'নৈবেদ্যে' আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটবে।

এর পরের তিনটি কবিতা হচ্ছে, 'জন্মদিনের গান', 'পূর্ণকাম' ও 'পরিণাম'। এই তিনটিই ভগবৎ-স্মরণ-মূলক গান। কবির অন্তরে এই গভীর আনন্দময় বিস্ময় জেগেছে—

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।

কবির যে নতুন অনুভূতি এর জন্য তিনি তেমন প্রস্তুত ছিলেন না।

কথা ও কাহিনী

'কথা ও কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের অতি প্রসিদ্ধ কাব্য।

'কথা' ১৩০৬ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'কথা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয় :

> এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধকথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহীত। রাজপুত কাহিনীগুলি টডের রাজস্থান ও শিখ বিবরণগুলি দুই-একটি ইংরাজি শিখ ইতিহাস হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ভক্তমাল হইতে বৈষ্ণব গল্পগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি। মূলের সহিত এই কবিতাগুলির কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হইবে—আশা করি সেই পরিবর্তনের জন্য সাহিত্য-নীতি-বিধানমতে দণ্ডনীয় গণ্য হইব না।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে বলা হয়েছে :

> মোহিতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত, বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) কথার কবিতাগুলি দুই অংশে প্রকাশিত হয়, 'কাহিনী' ও 'কথা'। কথার প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'দেবতার গ্রাস' ও 'বিসর্জন' এবং সোনার তরীর 'গানভঙ্গ', চিত্রার 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি', মানসীর 'নিষ্ফল উপহার' ও কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত 'দীন দান'

(ভারতী, ১৩০৭) কাহিনী অংশের অন্তর্গত হয়। কথার অবশিষ্ট কবিতাগুলি, ও চিত্রার 'ব্রাহ্মণ' এবং মানসীর 'গুরুগোবিন্দ' কবিতা কথা অংশে মুদ্রিত হয়। পরে এই দুই অংশের কবিতা লইয়া ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে স্বতন্ত্রভাবে কথা ও কাহিনী নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। তদবধি এই গ্রন্থ এই নামেই পরিচিত ও প্রচলিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ কবি লেখেন :

...ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে কথার কবিতাগুলিকে ন্যারেটিভ শ্রেণীতে গণ্য করলেও তারা চিত্রশালা। তাদের মধ্যে গল্পের শিকল গাঁথা নেই, তারা এক-একটি খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

এই কবিতাগুলো যে চিত্রধর্মী তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই কবিতাগুলোয় কবির যে বিশেষ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটিও লক্ষণীয়। ১৩১০ সালে কাব্যগ্রন্থাবলী প্রকাশের কালে এর যে কাব্যভূমিকা তিনি লেখেন সেটি বর্তমানেও এই কাব্যের সূচনায় স্থান পেয়েছে, তার শেষ স্তবকটি এই :

কথা কও, কথা কও।
কোনো কথা কভু হারাও নি তুমি,
সব তুমি তুলে লও,—
কথা কও, কথা কও।
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও।

ভারতের বিস্মৃত অতীত ইতিহাসের ভিতরে কবি প্রবেশ করেছেন; শুধু ছবি দেখবার জন্যই নয়, একটি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তিনি সেই সব ছবি দেখছেন।

তিনি তাঁর সংগঠনী কল্পনার আলোক নিক্ষেপ করেছেন সেই সব অতীত কাহিনী ও ঘটনার উপরে যে-সবে রয়েছে মহাপ্রাণতা, অভয়, এসবের পরিচয় —প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র লাভক্ষতি যেখানে গণনার বিষয় হয় নি। এই-কালে তাঁর প্রকাশ-সামর্থ্য অসাধারণ সমুন্নতি লাভ করেছিল। এগুলো "ব্যাল্যাড" জাতীয় কবিতা সে কথা কবি নিজেই বলেছেন। ব্যাল্যাডের বিশেষত্ব সবল সরলতায়। সেই সবল সরলতার সঙ্গে গভীরতারও একটা অপূর্ব যোগ ঘটেছে। তাতে কবির কথাগুলো সহজেই হয়ে উঠেছে গভীর ব্যঞ্জনাময়। কাব্যে 'কথা ও কাহিনী' আর গদ্যে 'ছোটগল্প' রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে জনপ্রিয় রচনা।

'কথা'র প্রথম কবিতাটি 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য অনাথপিণ্ডদ তাঁর প্রভুর জন্য শ্রাবস্তীপুরীর লোকদের কাছে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দান প্রার্থনা করছেন। নরনারীরা তাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন অলংকার অনাথপিণ্ডদকে দিলে ; কিন্তু সেসব তিনি তাঁর প্রভুর জন্য যোগ্য দান বলে বিবেচনা করলেন না। ভিক্ষা চাইতে চাইতে শেষে অনাথপিণ্ডদ এসে পৌছলেন পুরপ্রান্তের এক বনে। সেখানে ভূতলশায়িনী এক দীন নারী এসে বুদ্ধশিষ্যের চরণে প্রণাম করল এবং—

> অরণ্য-আড়ালে রহি কোনোমতে
> একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
> বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
> ভূতলে।

ভিক্ষু সেই দান মহা আনন্দে গ্রহণ করলেন :

> ভিক্ষু ঊর্ধ্বভুজে করে জয়নাদ
> কহে, "ধন্য মাত, করি আশীর্বাদ,
> মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ
> পলকে।

সর্বশ্রেষ্ঠের জন্য আমাদের শ্রেষ্ঠ দান তাই যা আমাদের বৈভবের অংশ মাত্র নয়। সর্বশ্রেষ্ঠকে দান করতে হবে আমাদের যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই— আমাদের সর্বস্ব। দীন নারী তার একমাত্র গাত্রবাস বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করলে। এর মর্যাদা ধনীর মণিমাণিক্যের চাইতে অনেক বেশি।

এই কবিতাটি উপলক্ষ করে তথ্য ও সত্য সম্পর্কে কবি এই মন্তব্য করেছেন :

একজন প্রবীণ বিজ্ঞ ধার্মিক খ্যাতিমান লোক এই কবিতা পড়ে বড়ো লজ্জা পেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "এ তো ছেলেমেয়েদের পড়ার যোগ্য কবিতা নয়।" এমনি আমার ভাগ্য, আমার খোঁড়া কলম খানার মধ্যে পড়তেই আছে। যদি বা বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ থেকে আমার গল্প আহরণ করে আনলুম, সেটাতেও সাহিত্যের আব্রু নষ্ট হল। নীতিনিপুণের চক্ষে তথ্যটাই বড়ো হয়ে উঠল, সত্যটা ঢাকা পড়ে গেল। হায় রে কবি, একে তো ভিখারিনীর কাছ থেকে দান নেওয়াটাই তথ্য হিসাবে অধর্ম, তার পরে নিতান্ত নিতেই যদি হয় তাহলে তার পাতার কুঁড়ের ভাঙা ঝাঁপটা কিম্বা একমাত্র মাটির হাঁড়িটা নিলে তো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা হতে পারত। তথ্যের দিক থেকে এ কথা নতশিরে মানতেই হবে। এমনকি আমার মতো কবি যদি তথ্যের জগতে ভিক্ষা করতে বেরত তবে কখনোই এমন গর্হিত কাজ করত না এবং তথ্যের জগতে পাগলা গারদের বাইরে এমন ভিক্ষুক মেয়ে কোথাও মিলত না রাস্তার ধারে নিজের গায়ের একখানি মাত্র কাপড় যে ভিক্ষা দিত; কিন্তু, সত্যের জগতে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য এমন ভিক্ষা নিয়েছেন এবং ভিখারিনী এমন অদ্ভুত ভিক্ষা দিয়েছে; এবং তার পরে সে মেয়ে যে কেমন করে রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে যাবে সে তর্ক সেই সত্যের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তথ্যের এতবড়ো অপলাপ ঘটে, ও সত্যের কিছুমাত্র খর্বতা হয় না—সাহিত্যের ক্ষেত্রটা এমনি। রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়। তথ্যজগতের যে আলোকরশ্মি দেয়ালে এসে ঠেকে যায়, রসজগতে সে রশ্মি স্থূলকে ভেদ ক'রে অনায়াসে পার হয়ে যায়; তাকে মিস্ত্রি ডাকতে বা সিঁধ কাটতে হয় না। রসজগতে ভিখারির জীর্ণ চীরখানা থেকেও নেই, তার মূল্যও তেমনি লক্ষপতির সমস্ত ঐশ্বর্যের চেয়ে বড়ো। এমনি উলটো-পালটা কাণ্ড।

এর পরের কবিতা 'প্রতিনিধি'। মহাবীর শিবাজি তাঁর গুরু রামদাসকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁর নিজের রাজ্য-রাজধানী সব তাঁকে লিখে দিলেন।

গুরু সেই দান গ্রহণ করে শিবাজিরও কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলে দিলেন। রাজাকে ভিক্ষা করতে দেখে রাজ্যের সবাই বিস্মিত হ'ল। কিন্তু সমস্ত দিন ভিক্ষা করার পরে গুরু শিবাজিকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন—

গুরু কহে, "তবে শোন, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার,
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহ পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজেশ্বর দীন উদাসীন,
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।"

আদর্শ রাজা তিনি যিনি নিজেকে জ্ঞান করেন ভিক্ষুকের অর্থাৎ দরিদ্রের প্রতিনিধি—রাজ্যলাভ করেও তিনি রাজ্যহীন থাকেন।

এর পরের কবিতা 'ব্রাহ্মণ'—প্রথমে 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত ছিল। এটিরও ছবির দিকটা খুব স্পষ্ট।

বালক সত্যকাম যে অকপটে গুরুকে বলতে পারলে :

……ভগবন,
নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে, কহিলেন তিনি, "সত্যকাম,
বহু পরিচর্যা করি' পেয়েছিনু তোরে ;
জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।"

এতে গুরু গভীর সন্তোষ লাভ করলেন ও বালককে সাদরে গ্রহণ করে বললেন :

……অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত।
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সত্যকামের অসাধারণ সত্যাশ্রয়িতা দেখে ঋষি তাকে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বলে গ্রহণ করলেন।

এর পরের কবিতা 'মস্তক বিক্রয়'। এর কাহিনী যেমন সরল তেমনি হৃদ্য। কোশলের রাজা ছিলেন দীনের পিতামাতা; এজন্য লোকের মুখে

তাঁর প্রশংসা আর ধরত না। কাশীর প্রতাপশালী রাজা এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে যুদ্ধ করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিলেন; কোশলের রাজা দূর বনে পালিয়ে গেলেন। লোকেরা এমন রাজার দুরদৃষ্ট দেখে শোক করতে লাগল। এতে কাশীর রাজা রেগে ঘোষণা করলেন, যে কোশলের রাজাকে ধরে এনে দিতে পারবে তাকে শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এমন ঘোষণা—

যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি
শিহরি কানে দেয় হাত।

বনে কোশলরাজের সঙ্গে এক দীনবেশ বণিকের দেখা হ'ল। কোশলরাজ জানতে পারলেন বণিকের বাণিজ্যতরী ডুবে গেছে, তাই সে যাচ্ছে কোশল-রাজের কাছে সাহায্যের জন্য। কোশলরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীরাজের সভায় উপস্থিত হলেন :

"কোশলরাজ আমি, বন-ভবন"
কহিলা বনবাসী ধীরে,
"আমায় ধরা পেলে যা দিবে পণ
দেহ তা মোর সাথীটিরে।"

শুনে—

উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,
নীরব হল গৃহতল,
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে
অশ্রু করে ছল ছল।

কাশীরাজের তখন চৈতন্য হ'ল—

মৌন রহি রাজা ক্ষণেক তরে
হাসিয়া কহে "ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে
এমনি করিয়াছ ফন্দি।
তোমার সে-আশায় হানিব বাজ
জিনিব আজিকার রণে,
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ
হৃদয় দিব তারি সনে।"

কাশীরাজ দর্পের দ্বারা জিততে পারেন নি। জিতলেন মহানুভবের প্রতি যোগ্য সমাদর দেখিয়ে।

এর পরের কবিতা 'পূজারিনী'। এটি পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত 'নটীর পূজা' নাটিকায় রূপান্তরিত হয়। এই কবিতাটি ও এর নাট্যরূপ দুই-ই অতিশয় জনপ্রিয়।

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের পদনখকণা ভক্তিভরে গ্রহণ করে তার উপরে এক অপরূপ শিলাময় স্তূপ নির্মাণ করেন। সেই স্তূপে যথাবিধি পূজা নিবেদিত হতে থাকে। কিন্তু তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হয়ে—

পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি।

আর তিনি ঘোষণা করলেন—

বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই কটি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।

তাঁর শাসনে রাজপরিবারের কেউ-ই স্তূপে পূজা দিতে সাহসী হ'ল না। রাজবাড়ির দাসী শ্রীমতী সন্ধ্যাকালে স্তূপে পূজা নিবেদনের জন্য পুষ্পপ্রদীপ থালায় বহন করে রাজমহিষী রাজবধূ রাজকন্যা, সবারই কাছে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু সবাই তাকে সাবধান করে শুভার্থীর মতো বললেন—

এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে।

পুরবাসীদেরও শ্রীমতী পূজার জন্য আহ্বান করলে; কিন্তু সবাই ভয় পেলে, কেউ কেউ তাকে গালি দিলে।

শেষে শ্রীমতী নিজেই স্তূপপাদমূলে পূজার প্রদীপ জ্বালালে। স্তূপে প্রদীপ জ্বলতে দেখে পুর-রক্ষক মুক্ত কৃপাণ হস্তে ছুটে এসে বললে:

কে তুই ওরে দুর্মতি
মরিবার তরে করিস আরতি।

শ্রীমতী শান্ত মধুর কণ্ঠে বললে—'আমি বুদ্ধের দাসী শ্রীমতী।'

কবিতাটির শেষ স্তবক এই :

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা।

নিষ্ঠুর মৃত্যুর সামনে এমন প্রশান্তি ও অভয়ের চিত্র জগতের সাহিত্যে কমই আঁকা হয়েছে।

এর পরের কবিতাটি 'অভিসার'। এটিও অতিশয় জনপ্রিয়। এর ছন্দটি চটুল—নটীর নূপুরশিঞ্জিত নৃত্যের ভঙ্গিতেই চলেছে। কিন্তু সেই ছন্দই শেষের কয়েকটি স্তবকে অপূর্ব গাম্ভীর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু উপগুপ্ত একদিন মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে শায়িত ছিলেন। এক অভিসারিকার পা তাঁর গায়ে লাগে, তাতে অভিসারিকা লজ্জিত হয়ে বলে :

ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা।

উপগুপ্ত করুণ বচনে তাকে বললেন :

অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ, যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।

এর কিছুকাল পরে এক চৈত্র-সন্ধ্যায় বসন্তের বাতাস দিয়েছে; সব পুরবাসী পুরী শূন্য করে মধুবনে ফুল-উৎসবে বেরিয়েছে; কিন্তু সেই অভিসারিকা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে শহরের লোকদের দ্বারা

পুর-পরিখার বাইরে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই রাত্রে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত এসে তার শিয়রে বসে তার মুখে জল দিলেন, ও তার গায়ে শীতল চন্দন-পঙ্ক লেপন করলেন। নারী তখন বললে—

কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়,

সন্ন্যাসী বললেন :

আজি রজনীতে হয়েছে সময়,—
এসেছি বাসবদত্তা।

উপগুপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ; বাসনা-কামনার ঊর্ধ্বে তিনি মনকে তুলতে পেরেছেন ; তাই তাঁর অভিসার বাসবদত্তার রূপ-যৌবনের মোহে নয়, তাঁর 'অভিসার' সর্বজন-পরিত্যক্ত বাসবদত্তাকে সেবা করবার জন্যে।

বাসবদত্তা ভালো কি মন্দ সন্ন্যাসী উপগুপ্ত আদৌ তার বিচার করছেন না। তিনি তার পরম দুঃখের দিনে একান্ত যত্নে তার সেবা করছেন। এই অহেতুক করুণার চিত্র অপূর্ব।

'অভিসারে'র পরের কবিতাটি হচ্ছে 'পরিশোধ'। এক হিসাবে এই দুইটিই প্রেমের কবিতা, কিন্তু সেই প্রেম বড় গম্ভীর। 'মহাবস্তুবদানে কাহিনীটি যেভাবে আছে 'পরিশোধ' কবিতায় তার অনেক বদল হয়েছে। কিন্তু বদল হয়ে কবির হাতে যে রূপ পেয়েছে তা অপূর্ব। আমাদের ধারণা 'কথা' কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা এটি। প্রেমের গতি যে কত জটিল অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে কবি এতে তা ফুটিয়ে তুলেছেন। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই :

কাশীর

সুন্দরী-প্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি ;

এমন সময়ে সে দেখলে মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন এক ব্যক্তিকে নগরপাল চোরের মতো কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে দেখেই শ্যামা মুগ্ধ হ'ল। সে তার সহচরীকে দিয়ে নগরপালকে অনুরোধ জানালো বন্দীকে নিয়ে একবার তার গৃহে আসতে :

শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে

রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহমাঝে
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্ত কপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,—
"অতিশয় অসময়ে অভাজন 'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ,—চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে,—সুদর্শনে, দেহ অনুমতি।"
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা—
"এ কী লীলা, হে সুন্দরী, এ কী তব লীলা।
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমান-দুখে
করিতেছ অবমান।" শুনি শ্যামা কহে,
"হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে,
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে ; তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।"

শ্যামা রক্ষীকে বললে, "আমার যা আছে সব নিয়ে নির্দোষ বন্দীকে মুক্ত করে দিয়ে যাও।" প্রহরী বললে :

তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।

শ্যামা তখন অনুনয় করে বললে, "শুধু দুটি রাত বন্দীকে বাঁচিয়ে রেখো।" প্রহরী স্বীকৃত হ'ল।

বজ্রসেনকে বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে শ্যামা তাকে নিয়ে এক নৌকোয় উঠে সেই নৌকো ছেড়ে দিলে। বিদেশীকে সে বললে :

হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো—
তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি

সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবন-মরণ-প্রভু।"

বজ্রসেন বিদেশিনীর এমন আনুকূল্যে যেমন আনন্দিত হ'ল তেমনি বিস্মিত হ'ল। সে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলে :

কহ মোরে, প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীন দরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।

কিন্তু—

আলিঙ্গন ঘনতর করি,
"সে কথা এখন নহে," কহিল সুন্দরী।

বজ্রসেনের আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত শ্যামা অস্ফুট কণ্ঠে বললে :

প্রিয়তম,
তোমা লাগি' যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন—তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে-কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব—
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো।
বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।

শুনে বজ্রসেন স্তম্ভিত হ'ল—

অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয় বাহুডোর

শিথিল পড়িল খসে ; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহা মাঝে ; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি ; মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা ; মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে
সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্তনারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, "ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে-অভিসম্পাত
হ'ক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।"

সবলে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বজ্রসেন বলে উঠল :

আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপ-মূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী।
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে।

এই বলে সে নৌকো ছেড়ে তীরে নেমে অন্ধকারে বনে প্রবেশ করল।

কিন্তু—

সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে।

দুই মুষ্টি বদ্ধ করে বজ্রসেন গর্জে উঠল :

"তবু ছাড়িবি না মোরে ?"
রমণী বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পড়িয়া

বন্যার তরঙ্গসম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্ত বেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘন নিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার ; আর্দ্রগদ্‌গদবচনা
কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়, "ছাড়িব না, ছাড়িব না"
কহে বারংবার, "তোমা লাগি পাপ, নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত,
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।"
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি' শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতি স্বর,—তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি 'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন থেকে ফিরে জনহীন নদীর ধারে ধারে দীর্ঘদিন ক্ষ্যাপার মতো কাটাল, কেননা সে ক্ষ্যাপার মতোই শ্যামার টুঁটি চেপে ধরেছিল ; পিপাসায় ছাতি ফাটলেও নদী থেকে এককণা জল মুখে তুলে দিল না। দিনশেষে সে নৌকোয় প্রবেশ করল। শ্যামার পরিত্যক্ত নূপুর তার নীলাম্বর অতৃপ্ত আবেশে সে বুকে টেনে নিলে।

দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন, "এস এস প্রিয়া"
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম।
"এস এস প্রিয়া।" "আসিয়াছি প্রিয়তম।"
চরণে পড়িল শ্যামা, "ক্ষম মোরে ক্ষম।"
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে।"

ক্ষণেকের জন্য বজ্রসেন তার মুখপানে তাকাল। ক্ষণেকের জন্য তার দিকে বাহু প্রসারিত করল। তার পরেই তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে গর্জে উঠল :

"কেন এলি, কেন ফিরে এলি।"
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জলন্ত অঙ্গার সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি ;
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, "যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও।"

শ্যামা কিছুক্ষণ নতশিরে নীরব হয়ে রইল—

পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমির মাঝে মিলায় যেমন।

নারী-চরিত্রের দুর্বলতা ও অবিশ্বস্ততা এই হয়তো মূল কাহিনীটির লেখকের প্রতিপাদ্য ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে মানব-চিত্তের দুর্জ্ঞেয়তার উপরেই আলোকপাত করেছেন। তাঁর আঁকা শ্যামা ও বজ্রসেন কাউকেই আমরা ঘৃণা করতে পারি না ; আমরা দেখছি অন্ধ প্রেম শ্যামার বিচার-বিবেচনার মধ্যে কী প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে, আর বজ্রসেনও ভেবে কূল পাচ্ছে না এমন প্রেমের ক্ষেত্রে তার আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রবল হৃদয়াবেগ কি বিপর্যয়ই না মানুষের জীবনে ঘটায়।—সাহিত্য ভালো-মন্দ শোভন-অশোভন এসবের বিচারক্ষেত্র যত তার চাইতে অনেক বেশি সমবেদনার ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র। কবির বড় পরিচয় এই যে তিনি শ্রেষ্ঠ দরদী। (দান্তের ডিভাইন কমেডি-র ফ্রান্‌সেস্‌কা ও পাওলো-র কাহিনী স্মরণীয়।)

এমন প্রবল হৃদয়াবেগের চিত্র রবীন্দ্রনাথ কমই এঁকেছেন।

এই কবিতাটি পরে শ্যামা নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত হয়।

এর পরের কবিতা 'সামান্য ক্ষতি'। মাঘের শীতের বাতাসের মধ্যে নদীতে প্রাতঃস্নান করে রানী ফিরছিলেন। খুব শীত লাগাতে গরিব প্রজাদের কুঁড়ে ঘরে সখীদের দিয়ে আগুন লাগিয়ে তিনি শীত নিবারণ করলেন। প্রজাদের অভিযোগে রাজা যখন তাঁর এমন আচরণের অর্থ জানতে চাইলেন তখন রানী রেগে বললেন :

গৃহ কহ তারে কী বোধে।
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর।
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে।

রাজা মনে মনে বললেন :

"যতদিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"

রাজার আদেশে কিঙ্করী এসে রানীর বস্ত্র-আভরণ খুলে নিয়ে তাঁকে ভিখারী নারীর চীরবাস পরিয়ে দিল এবং রাজা তাঁকে আদেশ করলেন :

মাগিবে দুয়ারে, দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে-কটি কুটির হল ছারখার
যতদিনে পার সে-কটি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

প্রাচীন ভারতে প্রজাদের সুখদুঃখ সম্বন্ধে রাজার চেতনা কত প্রখর ছিল তারই একটি ছবি কবি এই কবিতায় এঁকেছেন।

এর পরের কবিতা 'মূল্যপ্রাপ্তি'। সুদাস মালীর বাগানে অসময়ে একটি পদ্মফুল ফুটেছিল। তার জন্য ক্রেতাদের খুব দাম হাঁকাহাঁকি হ'ল, কেননা তাঁরা এটি বুদ্ধদেবকে উপহার দিতে চাচ্ছিলেন। এই ফুলটির জন্য ক্রেতারা এত দাম দিতে চাচ্ছেন দেখে মালী ভাবলে যাঁর জন্য এত গরজ করে এঁরা

ফুলটি কিনতে চাচ্ছেন তাঁকে দিলে আরও অনেক বেশি সে পাবে। এই ভেবে ফুলটি বিক্রি না করে সেটি নিয়ে সে উপস্থিত হ'ল যেখানে বুদ্ধদেব অবস্থান করছিলেন সেখানে। সে দেখলে :

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

দেখে সুদাস চেয়েই রইল, তার চোখের পলক পড়ল না, মুখেও কথা সরল না। তার পর—

সহসা ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম 'পরে।

বুদ্ধদেব সহাস্যমুখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা।

কিন্তু

ব্যাকুল সুদাস কহে প্রভু, আর কিছু নহে
চরণের ধূলি এক কণা।

বুদ্ধের অপূর্ব সৌম্য মূর্তি দেখে মালী বিস্ময়ে ও আনন্দে এমনি অভিভূত হ'ল যে তার ফুলটির জন্য তাঁর কাছ থেকে যে টাকা-পয়সা নেবে একথা সে ভাবতে পারলে না। সে চাইলে তাঁর চরণের এক কণা ধূলি মাত্র। সাধারণত মানুষ লাভক্ষতির গণনাই বেশি ক'রে করে, কিন্তু যা মহিমময় তার সামনে পার্থিব লাভালাভের কথা তারা ভুলেও যায়।

এর পরের কবিতা 'নগরলক্ষ্মী'। দুর্ভিক্ষের দিনে বুদ্ধদেব তাঁর ভক্তদের কাছে জানতে চাইলেন—

ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা
তোমরা লইবে বলো কেবা।

কিন্তু এতবড় দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সামন্ত ও শ্রেষ্ঠী যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ-ই সাহস করলেন না।

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।

নির্বাক সে-সভাঘরে ব্যথিত নগরী 'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

তখন অনাথপিণ্ডদের কন্যা সুপ্রিয়া বেদনায় অশ্রুপ্লুত হয়ে বললে :

ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া।
কাঁদে যারা খাদ্যহারা আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার
আমি আজি লইলাম ভার।

তার এই কথায় সবাই বিস্মিত হয়ে বললে :

ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী,—
কোন্ অহংকারে মাতি লইলে মস্তক পাতি
এ হেন কঠিন গুরু কাজ।
কী আছে তোমার কহ আজ।

ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া সবাইকে নমস্কার করে বললে :

শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে।
আমি দীনহীন মেয়ে অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া—
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।...
আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।

বুদ্ধের করুণা, তাঁর ভক্তের তাঁর অভিপ্রায় সর্বান্তঃকরণে বরণ, এসবেরই মনোহর চিত্র এই কবিতায় তো আছেই, তার সঙ্গে একটি সুপরিচিত গভীর সত্যও এতে রূপ পেয়েছে। সেই সত্যটি এই: মানুষ একা নগণ্য অসহায়, কিন্তু সম্মিলিত হলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।

এর পরের কবিতা 'অপমান-বর'। দেশে ভক্ত কবীরের এই খ্যাতি রটল যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ হয়েছেন, অর্থাৎ বাক্যমনের অতীত যে ভগবান তাঁকে তিনি অন্তরে লাভ করেছেন ও তার ফলে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন। এতে দলে দলে লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল :

কেহ কহে, "মোর রোগ দূর করি' মন্ত্র পড়িয়া দেহ"
সন্তান লাগি করে কাঁদাকাটি বন্ধ্যা রমণী কেহ।

কবীর ছিলেন জোলা, অর্থাৎ মুসলমান তন্তুবায়। তাঁর এমন খ্যাতিপ্রতিপত্তি দেখে শহরের ব্রাহ্মণরা খুব চটে গেল :

ব্রাহ্মণদল যুক্তি করিল নষ্ট নারীর সাথে,
গোপনে তাহারে মন্ত্রণা দিল, কাঞ্চন দিল হাতে।

কবীর হাটে কাপড় বেচতে এসেছেন এমন সময়ে সেই মেয়েটি কেঁদে তাঁকে পাক্‌ড়াও করলে—

কহিল, "রে শঠ নিঠুর কপট, কহি নে কাহারো কাছে
এমনি করে কি সরলা নারীরে ছলনা করিতে আছে।
বিনা অপরাধে আমারে ত্যজিয়া সাধু সাজিয়াছ ভালো,
অন্নবসন বিহনে আমার বরন হয়েছে কালো।"

কবীর সমাদরে সেই মেয়েটিকে তাঁর নিজের ঘরে এনে বললেন, "যে হরির আমি ভজনা করি তিনি তোমাকে আমার ঘরে পাঠিয়েছেন।" কবীরের কথায় ও আচরণে রমণী লজ্জিত ও পরিতপ্ত হয়ে বললে :

লোভে পড়ে আমি করিয়াছি পাপ, মরিব সাধুর শাপে।

কবীর বললেন, "মা, তোমার কোনো অপরাধ হয় নি, তুমি যে অপমান ও অপবাদ এনেছ তা আমার মাথার ভূষণ কেননা তা আমার হরিরই দান।"

দেশে কবীরের খুব বদনাম রটল। কিন্তু কবীর ভক্ত—ভগবানে আত্মসমর্পণ করেই তাঁর আনন্দ, কিসে সম্মান কিসে অসম্মান এসব চিন্তা তাঁর জন্য নয়।

দেশের রাজা তাঁর ভজন শুনবার জন্য তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়েই কবীর রাজসভায় গেলেন। কবীরের এমন নির্লজ্জ ব্যবহারে সবাই তাঁকে ধিক্ ধিক্ করতে লাগল। রাজসভা থেকেও তিনি বিতাড়িত হলেন।

কবীরের এমন অপমান ব্রাহ্মণেরা খুব উপভোগ করলে—তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে অনেক কঠিন বিদ্রূপ তারা উচ্চারণ করলে। মেয়েটি তখন কবীরের পায়ে ধরে

কহিল, "পাপের পঙ্ক হইতে কেন নিলে মোরে তুলে।
কেন অধমারে রাখিয়া দুয়ারে সহিতেছ অপমান।"

কবীর বললেন :

…"জননী, তুমি যে আমার প্রভুর দান।"—ঈশ্বরের ভক্ত যিনি অর্থাৎ তাঁতে যিনি আত্মসমর্পণ করেছেন তিনি সুখ দুঃখ মান অপমান সবই ঈশ্বরের দান বলেই মাথা পেতে নেন—কোনো অভিযোগ জানান না। অকথ্য অপমান সহ্য করেও ভক্তের মন কেমন ভগবৎ-পাদপদ্মে অবিচলিত রয়েছে সেই চমৎকার ছবিটি এই কবিতায় ফুটেছে।

এর পরের কবিতা 'স্বামীলাভ'। একটি নারী সহমৃতা হতে যাচ্ছিল, তাতে চারিদিক থেকে তার জয়নাদ উঠেছিল। সাধু তুলসীদাস সেই শ্মশানের কাছেই ভগবৎ-নাম-গান করছিলেন। তাঁকে দেখে নারী তাঁকে প্রণাম করে সহমরণে তাঁর অনুমতি চাইলে। তুলসীদাস জিজ্ঞাসা করলেন, "মাতঃ, এত আয়োজন করে কোথায় যাচ্ছ?" নারী বললে, "পতির সঙ্গে স্বর্গপানে যাব এই মন করেছি।"—

"ধরা ছাড়ি কেন নারী, স্বর্গ চাহ তুমি"
সাধু হাসি' কহে,
"হে জননী, স্বর্গ যাঁর, এ ধরণীভূমি
তাঁহারি কি নহে।"

সাধুর কথার অর্থ বুঝতে না পেরে নারী বিস্ময়ে অবাক হ'ল ও করজোড়ে বললে :

স্বামী যদি পাই, স্বর্গ দূরে থাক।

তুলসীদাস বললেন :

ফিরে চলো ঘরে
কহিতেছি আমি,
ফিরে পাবে আজ হতে মাসেকের পরে
আপনার স্বামী।

নারী আশার বশে শ্মশান ছেড়ে গৃহে ফিরে এলো ও তুলসীদাসের দেওয়া মন্ত্র একমনে জপ করতে লাগল।

একমাস পূর্ণ হলে প্রতিবেশীর দল নারীকে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "স্বামীকে কি পেয়েছ?" নারী হেসে বললে, "তাঁকে পেয়েছি।" প্রতিবেশীরা ব্যগ্র হয়ে বললে, "সে কোন্ ঘরে আছে?" নারী বললে :

রয়েছেন প্রভু অহরহ
আমারি অন্তরে।

এই নারী স্বামীকেই একান্তভাবে জানত; মৃত্যুর পরেও তারই সঙ্গ সে কামনা করেছিল। কিন্তু সাধুর দেওয়া ভগবানের নাম জপ করে সে অন্তরে অতি গভীর আনন্দ লাভ করল আর বুঝল জগৎ-স্বামীকে অন্তরে পাওয়াই সকল পাওয়ার বড়ো পাওয়া—স্বামীর শোক তাতে ভোলা যায়।

এর পরের কবিতা 'স্পর্শমণি'। খুব জনপ্রিয় কবিতা এটি। বর্ধমান জেলার মানকরের এক অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পায় যে বৃন্দাবনে সনাতন সাধুর শরণাপন্ন হলে তার ধনের উপায় হবে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বৃন্দাবনে গিয়ে সে সনাতন সাধুকে তার প্রার্থনা জানালে। সনাতন এক সময়ে ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী, কিন্তু ভগবানের নাম সার করে তিনি সেই সব পরিত্যাগ করে এসেছেন; এখন ভিক্ষার সাহায্যে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন চলে; কাজেই ব্রাহ্মণকে দেবার মতো কিছুই তাঁর ছিল না। কিন্তু সহসা তাঁর মনে পড়ল এক সময়ে নদীতীরে 'স্পর্শমণি' কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেটি তিনি বালুতে পুঁতে রেখেছিলেন। কোথায় পুঁতে রেখেছিলেন তা দেখিয়ে দিয়ে তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন:

নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।

ব্রাহ্মণ বালু খুঁড়ে সেই স্পর্শমণি পেল—তার সঙ্গের দুটি লোহার মাদুলিতে তা ছোঁয়াতেই সেসব সোনা হয়ে উঠল। দেখে ব্রাহ্মণের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। সে বালুর উপরে বসে সমস্ত দিন ভাবলে:

যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল। তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে প্রণাম করে সজল চোখে বললে:

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নত শিরে।" এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

স্বপ্নে নির্দেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ আশা করেছিল সাধু সনাতনের কাছে সে এমন কিছু পাবে যাতে তার অভাব দূর হয়ে যাবে। সে পেলও অপূর্ব কিছু—একটি স্পর্শমণি। কিন্তু যখন সে ভেবে দেখলে এই স্পর্শমণিও ভক্ত সনাতনের কাছে অনাদর পেয়েছে তখন সে বুঝল স্পর্শমণির চাইতেও যার বেশি দাম এমন ধনের মালিক এই সনাতন সাধু। কাজেই স্পর্শমণি অবহেলা করে সেও সেই ধনেরই একটুখানির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাল।

যারা ভগবানের ভক্ত অর্থাৎ ভগবানকেই জানে বিশ্বজগতের সব-কিছুর নিয়ন্তা বলে, আর ভগবানের উপরে একান্ত নির্ভরশীল, সেই নির্ভরতা তাদের কাছে এমন এক মহাধন যে তার সঙ্গে স্পর্শমণিরও তুলনা হয় না।

এর পরের কবিতা 'বন্দীবীর'। এটিও খুব প্রসিদ্ধ।

মোগল ও শিখের মধ্যে দীর্ঘদিন প্রবল ও নির্মম সংঘর্ষ চলেছিল। সেই নির্মম সংঘর্ষের একটি চিত্র এই কবিতায় আমরা পাচ্ছি। মোগলরা ছিল রাজশক্তির অধিকারী আর শিখরা ছিল একটি নতুন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত জন-সমাজ। সেদিন মোগলেরা শস্ত্র-বলে বলীয়ান্ ছিল। কিন্তু নতুন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিখদের কাছ থেকে তারা বাধা যা পেয়েছিল তাও কম প্রবল ছিল না।

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।
দংশন-ক্ষত শ্যেন-বিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সেদিন কঠিন রণে
'জয় গুরুজীর' হাঁকে শিখ বীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্তপাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে।

শেষে শিখদের নেতা বন্দা মোগলদের হাতে বন্দী হ'ল—সাত শত শিখও বন্দী হ'ল। তখন যুদ্ধে যারা বন্দী হ'ত বিশেষ করে যাদের বিদ্রোহী

জ্ঞান করা হ'ত তাদের সাধারণত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত। এই বিরাট শিখদলও সেই দণ্ড লাভ করেছিল। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড লাভ করেও তারা এতটুকু দমে নি। বরং বীরের যা ধর্ম—মৃত্যুভয়ে আদৌ ;ভীত না হওয়া—সেই অভয়ের পরিচয় তারা দিলে। সেই অভয় এই কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

বিদ্রোহীদের এই অনমনীয়তা কাজির অর্থাৎ মোগল পক্ষের বিচারকের সহ্য হ'ল না—

বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি'
বন্দার এক ছেলে
কহিল, "ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"

কিন্তু বন্দা তাতেও দুর্বলতা দেখাল না—

বালকের মুখ চাহি
"গুরুজীর জয়" কানে কানে কয়—
"রে পুত্র ভয় নাহি।"

বিজেতার নির্মম দর্পের সামনে আদর্শনিষ্ঠ অভীত বন্দীর মৃত্যুর প্রতি চরম উপেক্ষা আশ্চর্য শক্তির সঙ্গে আঁকা হয়েছে।

নৃশংসতার চিত্র আঁকায় কবি তেমন আগ্রহী নন ; তবে মহৎ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হিসাবে মাঝে মাঝে তেমন চিত্র তিনি এঁকেছেন। কেননা তাঁর চিন্তায় তেমন আত্মত্যাগেই সত্যকার আত্মোপলব্ধি।

এর পরের কবিতা 'মানী'।

সাধারণ ইতিহাসে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রের নিন্দার দিকটাই বেশি চোখে পড়ে, কিন্তু এই কবিতাটিতে তাঁর একটি ভালো চিত্রও ফুটেছে। সিরোহির রাজপুত-রাজা আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। কিন্তু এক সময়ে তিনি আওরঙ্গজেবের পক্ষের মাড়োয়া-রাজের হাতে ধরা পড়েন। ধরা পড়েও দীন ভাবে বাদশার আনুগত্য স্বীকার করতে তিনি রাজী হন না। বাদশা তাঁকে দরবারে আনিয়ে তাঁর নিজের পাশে স্থান দিলেন আর তাঁর রাজ্য অচলগড়েই তাঁকে সসম্মানে অধিষ্ঠিত করলেন।

এর পরের দুইটি কবিতা যথাক্রমে 'প্রার্থনাতীত দান' ও 'রাজবিচার'।

দুটিই ছোট, কিন্তু দুটিতেই চিত্র খুব স্পষ্ট ও চিত্তগ্রাহী। প্রথমটিতে ফুটেছে বন্দী তরুসিং-এর আত্মমর্যাদার চিত্র আর দ্বিতীয়টিতে ফুটেছে রতনরাও রাজার ন্যায়-বিচারের চিত্র। তরুসিংকে নবাব ক্ষমা করতে চাইলেন যদি সে তার বেণীটি কেটে দিয়ে যেতে রাজী হয়। বলা বাহুল্য এটি তরুসিংকে উপহাস করা, কেননা বেণী কাটা শিখের পক্ষে ধর্মপরিত্যাগের মতো দূষণীয়। নবাবের কথায় তরুসিং বললে :

…করুণা তোমার
হৃদয়ে রহিল গাঁথা—
যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব
বেণীর সঙ্গে মাথা।

'রাজবিচারে' দেখা যাচ্ছে রাজা রতনরাও-এর পুত্র এক ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকেছিল তার নারীর ধর্মনাশের জন্য। ব্রাহ্মণ তাকে ধরে ফেলে ও রাজার কাছে বিধান চায় এমন চোরের যোগ্য শাস্তির। রাজা বলেন—এর শাস্তি মৃত্যু। যুবরাজকে ব্রাহ্মণ সেই দণ্ড দেয়। তখন দূত এসে রাজাকে খবর দিল যুবরাজ ধরা পড়েছিলেন, আর ব্রাহ্মণ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, এখন ব্রাহ্মণের জন্য কি বিধান। রাজা বললেন—তাকে মুক্তি দাও।

এর পরের কবিতাটি 'গুরুগোবিন্দ'। 'মানসী'র যুগে এটি লেখা।

শিখগুরু গোবিন্দ নির্জনবাস করছিলেন; তাঁকে শিখজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কয়েকজন অনুচর এসে অনুরোধ জানালে। শিখগুরু বললেন, জাতির ও দেশের হয়ে কাজ করবার জন্য, সব বাধা ডিঙোবার জন্য, মাঝে মাঝে তাঁর প্রাণে আকুলতা জাগে; কিন্তু তাঁকে ধৈর্য ধারণ করে দীর্ঘ দিন-রজনী ধরে সাধনা করতে হবে—

এখনো বিহার কল্প-জগতে
অরণ্য রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা,
কর্মবিহীন বিজন সাধনা,
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে
　　　　দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী-কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
　　　　যোগ্য হতেছি কাজে।

এমনি ভাবে তাঁর বারো বৎসর কেটেছে, আরও দীর্ঘদিন কাটবে। সাধনায় যখন তাঁর সিদ্ধিলাভ হবে, যেদিন তিনি বলতে পারবেন—

　　　　পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
　　　　জাগো রে সকল দেশ।
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
　　　　নাহি আর আগু পিছু।
পেয়েছি সত্য লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন মরণ,
　　　　নাই নাই আর কিছু—

সেদিন তিনি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন।

বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য কবির ভিতরে দীর্ঘকাল ধরে কেমন একটি প্রস্তুতি চলেছিল, সেই তত্ত্বটিও ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায়।

এর ছন্দের চঞ্চল গতি লক্ষণীয়। দেশের দুর্দশার জন্য গুরু গোবিন্দের অর্থাৎ কবির মনের অস্বস্তি যেন রূপ পেয়েছে তাতে।

এর পরের কবিতা 'শেষশিক্ষা'। এটিও একটি অপূর্ব কবিতা। এর কাহিনীটি এই :

শিখগুরু গোবিন্দ একদিন দেশের দুর্দশার কথা আর সেই দুর্দশা দূর করার কাজে নিজের অকৃতার্থতার কথা ভাবছিলেন, এমন সময় এক পাঠান এসে গুরুজির কাছে ঘোড়া বিক্রি বাবদ তার পাওনা দাম চাইলে। গুরুজি

বললেন, কাল এসো; পাঠানের দেশে যাওয়ার সময় হয়েছিল, তাই সে জানালে দেরি করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কথায় কথায় পাঠান গুরুকে চোর বলে গালি দিলে। তখন গুরু গোবিন্দ ধৈর্য হারিয়ে আপন তরবারি খুলে পাঠানের মুণ্ডপাত করলেন। পরক্ষণেই গুরু নিজের অন্যায় বুঝে মাথা নেড়ে বললেন :

বুঝিলাম আজ
আমার সময় গেছে। পাপ তরবার
লঙ্ঘন করিল আজি লক্ষ্য আপনার
নিরর্থক রক্তপাতে। এ বাহুর 'পরে
বিশ্বাস ঘুচিয়া গেল চিরকাল তরে।
ধুয়ে মুছে যেতে হবে এ পাপ এ লাজ—
আজ হতে জীবনের এই শেষ কাজ।

গুরুজি সেই পাঠানের অল্পবয়স্ক পুত্র মামুদকে নিয়ে একান্ত যত্নে মানুষ করতে লাগলেন। নিজের হাতে তাকে অস্ত্রবিদ্যাও শেখালেন। এতে তাঁর ভক্তরা শঙ্কা প্রকাশ করতে লাগল। গুরু বললেন :

বাঘের বাচ্চারে
বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে।

পাঠানপুত্র বড় হলে গুরু একদিন তাকে বনের এক নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে তাকে দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে একখানি রক্তমাখা পাথর বার করে বললেন, এই তার বাপের রক্ত, তিনি অন্যায় করে তাকে এইখানে হত্যা করেছিলেন, সে বড়ো হয়েছে, সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তার নেওয়া চাই।

মুহূর্তে পাঠানপুত্র মামুদ গুরুর উপরে লাফিয়ে পড়ল। গুরু স্থির হয়ে রইলেন। কিন্তু মামুদ অস্ত্র ফেলে দিয়ে গুরুর পা ধরে বললে :

হে গুরুদেব, লয়ে শয়তানে
কোরো না এমনতরো খেলা। ধর্ম জানে
ভুলেছিনু পিতৃরক্তপাত; একাধারে
পিতা গুরু বন্ধু বলে জেনেছি তোমারে
এতদিন। ছেয়ে থাক মনে সেই স্নেহ,
ঢাকা পড়ে হিংসা যাক মরে। প্রভু দেহ পদধূলি।

এই বলে সে বন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এর পর মামুদ গুরুকে এড়িয়ে চলতে লাগল।

কিছুদিন পরে একদিন গুরু তাকে ডেকে তার সঙ্গে শতরঞ্চ খেলা আরম্ভ করলেন। গুরুর কাছে বারে বারে হেরে সে খেলায় খুব মেতে উঠল। সন্ধ্যা হয়ে রাত্রি হ'ল, কিন্তু মামুদ খেলার কথাই ভাবছে। এমন সময় গুরু চতুরঙ্গ-বল ছুঁড়ে মামুদের মাথায় মেরে অট্টহাসি হেসে বললেন :

পিতৃঘাতকের সাথে খেলা করে আসি
এমন যে কাপুরুষ, জয় হবে তার ?

তখনই খাপ থেকে খরধার ছুরি খুলে মামুদ গুরুর বুকে বসিয়ে দিলে। গুরু হাসিমুখে বললেন :

এতদিনে হল তোর বোধ
কী করিয়া অন্যায়ের লয় প্রতিশোধ।
শেষ শিক্ষা দিয়ে গেনু—আজি শেষবার
আশীর্বাদ করি তোরে হে পুত্র আমার।

এই কবিতাটি নিয়ে এক সময়ে শিখেরা খুব আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের ধারণা, কবি যে কাহিনী অবলম্বন করে কবিতাটি দাঁড় করিয়েছেন তা ইতিহাস-সম্মত নয়।

কিন্তু তা সত্য হলেও এই কবিতার মূল্য একটুও কমে না। গুরু গোবিন্দের যে পরিচয় এতে ফুটেছে তা আশ্চর্যভাবে মহৎ। যে অন্যায় তিনি মুহূর্তের উত্তেজনায় করেছিলেন তার জন্য পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করতে তিনি একটুও বিচলিত হন নি।

পাঠানপুত্র তরুণ মামুদের মানবিকতাও অপূর্ব রূপ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতা কোনো গোঁজামিল তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায় নি। নৃশংসতা, কঠোরতা, এসব তাঁর প্রিয় নয় আদৌ, কিন্তু ধর্ম যেখানে কঠোর ব্যবস্থা চায় সেখানে ধর্মের নির্দেশ তিনি শ্রদ্ধাবনত মস্তকে স্বীকার করেন। আর তাঁর সেই ধর্ম জাতি-ধর্ম বা দেশ-ধর্ম নয়, তা উদার মানব-ধর্ম—নিত্যধর্ম। তাঁর এই নিত্যধর্ম-বোধ তাঁর জীবনের শেষের দিকে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হয়েছে।

এর পরের কবিতা 'নকল গড়'। যে বীর, যার অন্তরাত্মা সতেজ, সে

কখনো নিজের বা নিজের জাতির অপমান সহ্য করে না—প্রাণ দিয়ে হলেও সেই অপমানের প্রতিকার করতে চেষ্টা করে। এই কবিতায় তারই একটি ছোটখাটো ছবি ফুটেছে।

এর পরের কবিতা 'হোরিখেলা'।

এর ছন্দের দোলাটি চমৎকার—যোদ্ধাদের হোরিখেলার ছন্দই বটে।

সেই সাহিত্যিক গুণই হয়তো এর বড়ো গুণ। চিন্তার দিক দিয়ে তেমন কোনো উচ্চ সম্পদ আমরা এই কবিতায় পাই নি।

ভূনাগ রাজার রানী যুদ্ধে হেরে নিজের শহর ছেড়ে কেতুনপুরে এসে যুদ্ধজয়ী কেসর খাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন হোরিখেলার জন্যে। রানী ও রাজপুতানীদের সঙ্গে হোরিখেলা হবে, এই লোভে কেসর খাঁ কিছু সৈন্য সঙ্গে নিয়ে সাজসজ্জা করে কেতুনপুরে এলেন। রানী তাঁর সৈন্যদের দাসীর বেশ পরিয়ে এনেছিলেন। হোরির মাতামাতি শুরু হ'ল। কিন্তু কেসর খাঁর চোখে ঠিক নেশা লাগল না—

পাঠান কহে, "রাজপুতানীর দেহে
　　কোথাও কিছু নাই কি কোমলতা।
বাহুযুগল নয় মৃণালের মতো,
কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত,
বড়ো কঠিন শুষ্ক স্বাধীন যত
　　মঞ্জরীহীন মরুভূমির লতা।"
পাঠান ভাবে দেহে কিংবা মনে
　　রাজপুতানীর নাইকো কোমলতা।

হোরি খেলতে খেলতে রানী এক সময়ে ফাগের কাঁসার থালাখানা পাঠানপতির ললাটে ছুঁড়ে মারলেন। এটি হ'ল তাঁর সৈন্যদের জন্য শত্রু-নিপাতের ইঙ্গিত।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
　　সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।
ফাগুনরাতে কুঞ্জবিতানে
মত্ত কোকিল বিরাম না জানে,
কেতুনপুরে বকুলবাগানে
　　কেসর খাঁয়ের খেলা হল সারা।

যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল
সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা।

প্রবল শত্রুর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে নারী সেই শত্রুর ধ্বংসের জন্য মোহময় ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, আর সেই জন্যই তা ক্ষমার্হ, এই হয়তো কবির বক্তব্য।

এর পরের কবিতা 'বিবাহ'-এ দেখা যাচ্ছে, মেত্রির নবীন রাজার বিবাহ হচ্ছে, সেই সময় বড় রাজার আদেশ এলো বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। রাজপুতবীর সেই আদেশ শিরোধার্য করে বিবাহ-বেশ পরেই ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধে গেলেন। কন্যার মাতা কেঁদে বললেন:

বধূবেশ
খুলিয়া ফেল্ হায় রে হতভাগী।

কন্যা শান্তমুখে মাকে বললেন:

কেঁদো না মা, ধরি তোমার পায়ে,
বধূসজ্জা থাক্ মা আমার গায়ে,
মেত্রিপুরে যাইব তাঁর লাগি।

যুদ্ধে মেত্রির রাজা মারা গেলেন। যখন তাঁর চিতারচনার কাজে তাঁর লোকেরা ব্যস্ত তখন কিংকর-কিংকরী সঙ্গে নিয়ে চতুর্দোলায় চড়ে তাঁর বধূ এসে উপস্থিত হলেন। মেত্রিপতি বরের বেশে চিতায় শায়িত হলেন, তাঁর বধূও রক্তবাস পরে তাঁর শিয়রে গিয়ে বসলেন এবং পতির সঙ্গে সহমৃতা হলেন। শ্মশান রচনা করল তাঁদের বাসর।

বিবাহ ও বিবাহিত জীবন শুধু সুখের ব্যাপারই নয়, সেখানেও স্থান হওয়া চাই ত্যাগের জন্য প্রস্তুতির ও অভয়ের—এই কবির বক্তব্য।

এর পরের 'বিচারক' কবিতায় বিচারকের মহৎ দায়িত্ববোধের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রঘুনাথ রাও আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। নিজের সেই দুষ্কৃতি ঢাকা দেবার জন্য তিনি মহীশূরপতি হৈদরালির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। মহা সমারোহে তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেছেন তখন দেশের প্রধান বিচারক রাম শাস্ত্রী এসে তাঁর পথরোধ করে বললেন:

বধিয়াছ তুমি
আপন ভ্রাতার পুত্রে।

বিচার তাহার না হয় য'দিন
ততকাল তুমি নহ তো স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন
ন্যায়ের বিধানসূত্রে।

রঘুনাথ রাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :

নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসি নি পথমাঝখানে
ন্যায়-বিধানের ভাষ্য।

তখন রাম শাস্ত্রীও বললেন :

রঘুনাথ রাও,
যাও করো গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার;
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর
না রহিব অবরুদ্ধ।

কবিতাটির শেষ স্তবকে লেখা হয়েছে :

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক
সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ
গ্রামের কুটিরে চলি গেলা ফিরে
দীন দরিদ্র বিপ্র।

কথা ও কাহিনীর কথা অংশের শেষ কবিতাটি 'পণরক্ষা'। তুমরাজ যখন আজমীর-দুর্গের ভার পেয়েছিলেন তখন তিনি পণ করেছিলেন জীবন থাকতে প্রভুর দুর্গ শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু এমন দিন এলো যখন আজমীর-দুর্গের অধীশ্বর বিজয়সিংহ বিনা যুদ্ধে আজমীর-দুর্গ মারাঠাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। সেই মর্মে তিনি তুমরাজকে আদেশ করে পাঠালেন। মারাঠারা আজমীর-দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে সংবাদ পেয়ে

দুমরাজ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু দূত তাঁর প্রভুর নির্দেশ নিয়ে এলো। দুমরাজ ও তাঁর রাজপুত সেনা মর্মাহত হলেন—

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমর-সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।

কিন্তু হীনতা সয়ে যাওয়া বীরের ধর্ম নয়; প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করাও তার জন্য অধর্ম। এই দুয়ের বিরোধ দুমরাজ মেটালেন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে।

'কাহিনী' অল্প কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। তারও বেশির ভাগ 'কল্পনা' ও 'কথা'র যুগের কয়েক বৎসর আগে লেখা। কথা ও কাহিনী দুইই মোটের উপর কথা অর্থাৎ গল্পের টুক্‌রো। তবে ঐতিহাসিক গৌরবের জন্য কথার কবিতাগুলোর মর্যাদা মোটের উপর বেশি। ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তিও সেসবে কিছু বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

কাহিনীর 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি' খুব জনপ্রিয়। এ দুটি আদিতে 'চিত্রা'র কবিতা ছিল।

কিন্তু কাহিনীর সব চাইতে শক্তিশালী কবিতা হচ্ছে 'দেবতার গ্রাস' আর 'দীন দান'। 'দেবতার গ্রাসে'র রচনার তারিখ ১৩ই কার্তিক, ১৩০৪। এটি প্রথমে কথার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'দীন দান' রচিত হয় ১৩০৭ সালে।

কাহিনীর ভূমিকাস্বরূপ যে কবিতাটি লেখা হয়েছিল তার একটি স্তবক এই:

তবে ঘরে কিছু ফেলা নাহি যায়
ওগো হৃদয়ের গেহিনী;
কত সুখ দুখ আসে প্রতিদিন,
কত ভুলি, কত হয়ে আসে ক্ষীণ,
তুমি তাই লয়ে বিরামবিহীন
রচিছ জীবনকাহিনী।
আঁধারে বসিয়া কী যে কর কাজ
ওগো স্মৃতি-অবগাহিনী।

সোনার তরীতে ও চিত্রায় যে কবিকে আমরা দেখেছি বিশেষভাবে সৌন্দর্য-উপাসক তাঁকেই কথা ও কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে জীবন-ক্ষেত্রের একজন শ্রেষ্ঠ বোদ্ধা ও যোদ্ধা। গেটে, শেলী ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন কবির ভিতরে সৌন্দর্য-বোধ ও বিশ্বকল্যাণ-বোধ এক অপূর্ব যোগে যুক্ত হয়েছিল। হয়ত সেই জন্যই তাঁরা বিশেষভাবে একালের কবি।

কথা ও কাহিনীর মূল্য মহৎ চিন্তার জন্যই নয়—মহৎ চিন্তা যে মনোহর ভাষা পেয়েছে সেই জন্য।

কথা ও কাহিনীর কবিতাগুলো সম্পর্কে সহজেই ব্রাউনিঙের নাট্যকাব্য-গুলোর কথা মনে পড়ে। কবি যে ব্রাউনিঙের অনুরাগী ছিলেন তা আমরা জানি। কিন্তু ব্রাউনিঙের নাট্যকাব্যগুলোর তুলনায় কথা ও কাহিনী এবং কাহিনী আরো গূঢ়ভাবে জীবনধর্মী।

কাহিনী

কাহিনী কবিতা-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে। এর প্রায় সবগুলোই নাট্যকাব্য; এবং প্রায় সবগুলোই ১৩০৪ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণে রচিত অথবা প্রকাশিত। এর 'ভাষা ও ছন্দ' 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালের ভাদ্র মাসে, আর কর্ণ-কুন্তী-সংবাদের রচনার তারিখ ১৫ ফাল্গুন, ১৩০৬ সালে। এই কাহিনীও রবীন্দ্রনাথের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা-সম্ভার।

এর প্রথম কবিতা 'গান্ধারীর আবেদন'। এই কবিতাটি সম্বন্ধে চারুবাবু বলেছেন :

> গান্ধারীর আবেদন নাট্যকাব্য যখন কবি সভায় পাঠ করেন তখন আমরা ছাত্র। তখন আমাদের মনের মধ্যে নূতন স্বদেশপ্রেম জাগ্রত হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা ঐ নাটিকার মধ্যে আমাদের দেশের সাময়িক ইতিহাসের ছায়াপাত হইয়াছে মনে করিয়াছিলাম। আমরা অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম যে—ধৃতরাষ্ট্র হইতেছেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, যিনি তাঁহার স্নেহপাত্র পুত্রের অন্যায়ও সমর্থন করিতেছেন অন্ধভাবে, দুর্যোধন হইতেছেন ইণ্ডিয়ান ব্যুরোক্রেসী অর্থাৎ ভারতীয় আমলাতন্ত্র, যিনি ন্যায়ের দিকে দেখেন না, দেখেন নিজের জয়লাভের দিকে ; গান্ধারী

ইংরেজ জাতির ন্যায়নিষ্ঠা, ইংরেজ জাতির ধর্মবোধ, যিনি নিজের অতি নিকট আত্মীয়কেও অন্যায় করিতে দেখিলে দণ্ড দিতে সংকুচিত হন না, যাহাকে রবীন্দ্রনাথ পরে বড় ইংরেজ বলিয়াছেন গান্ধারী সেই বড় ইংরেজের প্রতিনিধি, তিনি Sense of British Justice, দুর্যোধন-মহিষী ভানুমতী হইতেছেন ব্রিটিশ প্রেস্টিজ্, নিজেদের প্রভুত্ব ও জয়াধিকার বজায় রাখিবার অশোভন জেদ, তিনি ন্যায় অন্যায় কিছু বিচার করেন না, কেবল কিসে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমী থাকিবে, কিসে তাঁহাদের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থতা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য; পাণ্ডবেরা হইতেছেন দুর্যোধনের ছল-বল-কৌশলে পরাভূত ও স্বাধিকার-বঞ্চিত ভারতবাসী, নিজ বাসভূমে পরবাসী; আর দেবী দ্রৌপদী হইতেছেন ধর্মপথে চলার শাস্তি ও গৌরব, যিনি সর্বস্বহারা পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় বনবাসে অনুগমন করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক কালের ছায়া এর উপরে যে পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমসাময়িক কালকে অতিক্রম করে চিরকালের জন্য যা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠ ধর্মবোধ তারও প্রকাশ এই কবিতায় ঘটেছে। গান্ধারীর কণ্ঠে ন্যায়ধর্ম যে বেদনাময় ভাষা পেয়েছে তা সর্বযুগে সমাদৃত হবার যোগ্য :

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু
মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু
ধর্মেই ধর্মের শেষ।...
দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে-বিচার। যার তরে প্রাণ
কোনো ব্যথা নাহি পায় তারে দণ্ডদান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পার না দিতে সে কারে দিয়ো না,—
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে,
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে
বিচারক। শুনিয়াছি বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা,—পুত্রের বিচার

নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ ; ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার,—
মূঢ় নারী লভিয়াছি অন্তরে আমার
এই শাস্ত্র।—পাপী পুত্রে ক্ষমা কর যদি
নির্বিচারে, মহারাজ, তবে নিরবধি
যত দণ্ড দিলে তুমি যত দোষী জনে
ধর্মাধিপ নামে, কর্তব্যের প্রবর্তনে,
ফিরিয়া লাগিবে আসি দণ্ডদাতা ভূপে—
ন্যায়ের বিচার তব নির্মমতারূপে
পাপ হয়ে তোমারে দাগিবে।

দুর্যোধনকে আঁকা হয়েছে দম্ভের প্রতিমূর্তি রূপে। সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শক্তির অহংকারও তার খুব, কিন্তু আসলে সে দুর্বল, তাই ছলের আশ্রয় নিতে তার আপত্তি নেই আদৌ ; তার ধর্মপ্রাণ জননীর সম্মুখবর্তী হতেও তার সাহস হয় না।

বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুধু বয়সের দিক দিয়েই জরাগ্রস্ত হন নি, তাঁর ধর্মবুদ্ধিও জরাগ্রস্ত হয়েছে। যা ভাল বলে বোঝেন তা করবার সামর্থ্য তাঁর নেই।

এর পরের কবিতা 'পতিতা'। এটিও মহাভারত অবলম্বনে লেখা, তবে কবির দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে। চারুবাবু কবিকে প্রথম এই কবিতাটি পড়তে শুনেছিলেন ১৩০৮ সালে মজুমদার লাইব্রেরীতে। ভূমিকাস্বরূপ কবি যা বলেছিলেন সংক্ষেপে তা এই :

আমি এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছি যে—রমণী পুষ্পতুল্য—তাহাকে ভোগে বা পূজায় তুল্যভাবে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহাতে যে কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায় তাহা ফুলকে বা রমণীকে স্পর্শ করে না,—ফুল বা রমণী চিরপবিত্র, চির-অনাবিল,—তাহাতে ফুলের বা রমণীর কোনো ইচ্ছা মানা হয় না বলিয়া সে ভোগে বা পূজায় নিয়োজিত হয়, এবং তাহাতে নিয়োগকর্তারই মনের কদর্যতা বা পবিত্রতা প্রকাশ পায় মাত্র। যে সহজপূজ্য তাহাকে ভোগের পদবীতে যে নামাইয়া আনে সেও একটা আনন্দ পায় বটে, কিন্তু সে

আনন্দ অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পতিতা হইলেও নারীর স্বাভাবিক পবিত্রতা তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে, অনুকূল অবস্থা পাইলে সে পুনর্বার পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। পাপের অন্যায়ে সে তাহার আত্মাকে কলুষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আত্মা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় নাই—তাহার আত্মা বাষ্পাচ্ছন্ন দর্পণের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য তাহার সহজ স্বচ্ছতা ও শুচিতা হারাইয়াছে। ঋষির কুমারই পতিতার কলুষ-তামস জীবনের মধ্যে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া প্রকৃত জীবনপথের সন্ধান তাহাকে দেখাইয়া দিলেন। ভক্ত যখন জাগায় তখনই তো ভগবান্ জাগ্রত হন, তাই তো আমরা বলি জাগ্রত ভগবান্। পতিতার নারীত্বের পূজারী এতদিন কেহ ছিল না, ঋষিকুমার তাহার প্রথম পূজারী হইয়া তাহাকে তাহার নারীত্বের সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দিলেন। সদ্‌গুণ সে পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় যে পর্যন্ত না ভাবের ভাবুক আসিয়া তাহার উপাসনা করে। শক্তিমানের পূজা না পাইলে তো শক্তি জাগ্রতা হন না।

যে সংসারের কাছে ও নিজের কাছে পতিত হয়েছে তার কেমন করে যেন নতুন জন্মলাভ হ'ল সেই চিত্র অপূর্ব রেখায় রেখায় এই কবিতায় ফুটেছে। পতিতার নতুন জন্মলাভ হ'ল কারো উপদেশে নয়, ঋষিকুমারের অকপট শ্রদ্ধা ও প্রীতি আর তপোবনের শান্তি তার ভিতরে এই পরিবর্তন ঘটাল। আর এই পরিবর্তন কত সত্য! তার পরিবর্তিত স্বভাব যেন আমরা অনুভব করতে পারি। এ সম্পর্কে কবিতাটির কয়েকটি বিশিষ্ট চরণ এই :

> নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
> নদী জলতলে বাজিল শিলা,
> ভগবান ভানু রক্ত-নয়নে
> হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

অথবা

> ও আহুতি তুমি নিয়ো না নিয়ো না
> হে মোর অনল, তপের নিধি,
> আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
> এমন ক্ষমতা দিল না বিধি।

অথবা

আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো, করুণানিধি।
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।

কবি বলেছেন, ভক্ত যখন জাগায় তখনই তো দেবতা জাগ্রত হন। এটি একটি শ্রেষ্ঠ চিন্তা। কোনো বড় ভাব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন যখন সেই ভাবের ভাবুকের আবির্ভাব হয়। তার আগে তা যেন ঘুমিয়ে থাকে। জগতের ইতিহাসে বার বার এটি দেখা গেছে।

এর ছন্দের চঞ্চল গতিও লক্ষণীয়—তা যেন পতিতার নবচেতনালাভের বেদনা-চাঞ্চল্যের প্রতিরূপ।

জাগ্রত-আত্মা নারী চক্রী রাজমন্ত্রীকে কঠিন ভৎর্সনা করছে এই ভাবে :

হাসো হাসো তুমি হে রাজমন্ত্রী,
লয়ে আপনার অহংকার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা
ফিরে লও তব পুরস্কার।
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে।
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে।
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দু-একটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।

এর পরের কবিতা 'ভাষা ও ছন্দ'। এটিও খুব বিখ্যাত, আর সাহিত্যিক সৃষ্টির স্বরূপনির্দেশের দিক দিয়েও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা ও ছন্দ—অর্থাৎ প্রতিদিনের মুখের ভাষার সঙ্গে কবির ব্যবহৃত ছন্দোময় ভাষার কি পার্থক্য—সেই কথা। কবিতাটির প্রথম অংশে আঁকা

হয়েছে বাল্মীকির অন্তরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের শোকে কবিত্বের যে নতুন প্রেরণা লাভ হয়েছে সেই ভাব-মুহূর্তের চিত্র :

…বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে
গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে
নব ছন্দ…

যে নতুন সমৃদ্ধ চেতনা বাল্মীকির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে তার স্বরূপ সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার—
তার নিত্য জাগরণ ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

প্রতিভার এ একটি অপূর্ব সংজ্ঞা।

নতুন ছন্দ বাল্মীকির মনকে কি নিবিড়ভাবে অধিকার করেছে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে এই বাক্যাংশে—'বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকি।— ছন্দকে বলা হয়েছে ভাব-শরীর।

ব্রহ্মার নির্দেশে দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হয়ে জানতে চাইলেন, যে ছন্দ তাঁর চিত্ত থেকে সদ্য উৎসারিত হয়েছে তার সাহায্যে স্বর্গের কোন্ দেবতার যশঃকথা গান করে তিনি স্বর্গের অমরকে মর্ত্যলোকে অমরতা দেবেন।

ভাবোন্মত্ত মুনি শির নেড়ে বললেন :

দেবতার সামগীত গাহিতেছে বিশ্বচরাচর
ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে করিছে স্তব ; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে ; অরণ্য উঠায়ে লক্ষ শাখা
মর্মরিছে মহামন্ত্র ; ঝটিকা উঠায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জন-গান,…

কিন্তু মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করে তা প্রকাশ-সামর্থ্যে বড় দীন, কেননা তা ব্যঞ্জনাহীন—

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে,
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে,
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তস্বর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

কবি বাল্মীকি চাচ্ছেন তাঁর নবলব্ধ ছন্দের সাহায্যে মানুষের এই প্রকাশ-দৈন্য ঘোচাবেন, ছন্দ সেই প্রকাশকে ব্যঞ্জনাময় করবে—

মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজ সম
উদ্দাম সুন্দর গতি,—সে-আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।

বাল্মীকি চাচ্ছেন তিনি যে ছন্দ লাভ করেছেন তা তিনি প্রয়োগ করবেন মহামানবের স্তবগান রচনায়, তাতে ক্ষণস্থায়ী নর-জন্মকে মহৎ মর্যাদা দান করা হবে। তিনি নারদকে অনুরোধ জানালেন :

হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহ-পায়ে
স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।
দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে।

কাব্যে বা সাহিত্যে মানুষকে দেবতা করে তোলা হয়—তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে মানুষকে দেখানো হয় যে সে অলৌকিক শক্তির অধিকারী। এমন চেষ্টা যে সাহিত্যে কখনো কখনো না করা হয় তা নয়, কিন্তু তাতে সাহিত্যের মর্যাদা বাড়ে না, বরং ক্ষুণ্ণ হয়। সাহিত্যে মানুষকেই আঁকা হয়, তবে মানুষের জীবনের এমন সব মুহূর্তের, তার অন্তরের এমন সব অনুভূতির, চিত্রও আভাসে ইঙ্গিতে তাতে আঁকা পড়ে যা একান্তভাবে তার প্রতিদিনের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। তাকেই কবি বলেছেন দেবত্ব। মানবত্বে

আর দেবত্বে মেশানো একটা ছবি বাল্মীকির মনে প্রতিভাত হয়েছে। বাস্তব জীবনে তেমন মানুষ আছে কি না তাই বাল্মীকি নারদের কাছে জানতে চাচ্ছেন—

ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সবদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।

(এটি রামায়ণের রাম-চরিত্রের একটি চমৎকার মূল্যায়ন।)

নারদ বললেন, তেমন মানুষ হচ্ছেন অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

বাল্মীকি বললেন, আমি তাঁর কথা জানি, তাঁর কীর্তিকথা শুনেছি, কিন্তু তাঁর জীবনের সকল ঘটনা সকল তথ্য তো জানি না, কাজেই তাঁর ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে পাছে সত্যভ্রষ্ট হই এই ভয় আমার মনে আছে।

তার উত্তরে নারদ হেসে বললেন :

সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

এখানে সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে খুব একটি গভীর কথা বলা হয়েছে। তথ্য বলতে যা বোঝায় সাহিত্যে সেসব কম থাকে না, কিন্তু সেই সব তথ্য ডিঙিয়ে তাতে প্রকাশ পায় সত্য, অর্থাৎ কবির মনে সেই সব তথ্য অবলম্বন করে অথবা সেই সব তথ্যের প্রেরণায় যে পূর্ণাঙ্গ সত্যের ছবি প্রতিভাত হয়েছে সেইটি। অযোধ্যার রঘুপতি রামের কথা রামায়ণে সবিস্তারে বলা হয়েছে মিথ্যা নয়, কিন্তু রামের সেই সব কাহিনী কবি বাল্মীকির মনে মহৎ মনুষ্যত্বের

যে একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়েছিল সেইটিই রামায়ণের বড় সত্য। সাহিত্যের বা কাব্যের সার্থকতা এইখানে। যা তথ্যসমৃদ্ধ কিন্তু সত্যসমৃদ্ধ নয় তা কাব্য নাম পাবার যোগ্য নয়।

এ সম্বন্ধে কবি তাঁর বহু লেখায়, বিশেষ করে তাঁর 'সাহিত্যের পথে'-র 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

এর পরের কবিতা 'সতী'। এটিও রবীন্দ্রনাথের খুব একটি শক্তিশালী কবিতা। যেমন 'গান্ধারীর আবেদন'-এ তেমন এই 'সতী' নাটিকাটিতে কবির ধর্মবোধ এক অসাধারণ রূপ পেয়েছে।

একটি মারাঠি কাহিনী অবলম্বনে এটি লেখা, সেই কাহিনীটি এই :

বিনায়ক রাও-এর কন্যা অমাবাই-এর বিবাহের আয়োজন হয়েছে, সকলে বরের আগমনের প্রতীক্ষা করছে, এমন সময়ে মশাল জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে বহু শিবিকায় সদলবলে উপস্থিত হ'ল বিজাপুর রাজসভার জনৈক মুসলমান সভাসদ এবং অমাবাইকে হরণ করে মুহূর্তে তারা অন্তর্হিত হ'ল। অমাবাই-এর বাগ্‌দত্ত বর জীবাজি এর পর সভায় উপস্থিত হয়ে বললে, কেমন করে তার শিবিকা মশাল বর-পরিচ্ছদ সবই দস্যুদল কেড়ে নিয়েছে। সেই রাত্রে বিনায়ক রাও ও জীবাজি হোমাগ্নি স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই দস্যুর রক্তপাতে এর প্রতিশোধ নেবেন। বহুদিন পরে অমাবাই-এর সেই অপহারকের সঙ্গে বিনায়ক রাও ও জীবাজির যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'ল এবং যুদ্ধে সেই অপহারক ও জীবাজি দুইজনই নিহত হ'ল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই বিনায়ক রাও ও তাঁর স্ত্রী রমাবাই-এর সঙ্গে তাঁদের কন্যা অমাবাই-এরও দেখা হ'ল। এই তিনজনের কথাবার্তা, তাদের চিন্তা ও আচরণের ঘাত-প্রতিঘাত, এই কবিতার বিষয়।

অমাবাই বিনায়ক রাওকে পিতা বলে সম্বোধন করলে। কিন্তু বিনায়ক রাও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন :

পিতা! আমি তোর পিতা! পাপীয়সী
স্বাতন্ত্র্যচারিণী। যবনের গৃহে পশি
ম্লেচ্ছগলে দিলি মালা কুলকলঙ্কিনী।
আমি তোর পিতা।

অমাবাই বললে :

অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষপঞ্জরে।
তুমি পিতা, আমি কন্যা, বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিত, প্রণমি' চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব।

অমাবাই-এর এই কথা বিনায়ক রাও-এর হৃদয় স্পর্শ করল, তিনি বললেন :

কোথা যাবি অমা?
ধিক্ অশ্রুজল। ওরে দুর্ভাগিনী নারী
যে বৃক্ষে বাঁধিলি নীড় ধর্ম না বিচারি
সে তো বজ্রাহত দগ্ধ, যাবি কার কাছে
ইহকাল-পরকাল-হারা?

অমাবাই বললে, পুত্র আছে—

বিনায়ক রাও তাকে বাধা দিয়ে বললেন :

থাক পুত্র। ফিরে আর চাস নে পশ্চাতে
পাতকের ভগ্নশেষ পানে। আজ রাতে
শোণিত-তর্পণে তোর প্রায়শ্চিত্ত শেষ,—
যবনের গৃহে তোর নাহিক প্রবেশ
আর কভু। বল্ তবে কোথা যাবি আজ?

পিতার এমন কঠোরতায় অমাবাই বললে, পিতার থেকে স্নেহময় যে মৃত্যু সে তো আছে, তার মুক্ত দ্বারে আশ্রয় প্রার্থনা করে কেউ ফিরে যায় না।

অমাবাই-এর কথায় বিনায়ক রাও-এর মন নরম হ'ল, তিনি বললেন :

মৃত্যু? বৎসে। হা দুর্বৃত্তে। পরম পাবক
নির্মল উদার মৃত্যু—সকল পাতক
করে গ্রাস—সিন্ধু যথা সকল নদীর
সব পঙ্করাশি। সেই মৃত্যু সুগভীর
তোর মুক্তি গতি।

কিন্তু মৃত্যুর সময় তো তোর আসে নি। বরং চল্ সলজ্জ স্বজন আর সক্রোধ সমাজ এদের পরিত্যাগ করে আমরা দূর তীর্থে গিয়ে বাস করি।

সেথা গঙ্গাতীরে
নবীন নির্মল বায়ু;—স্বচ্ছ পুণ্যনীরে
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, নির্জন কুটিরে
শিব শিব শিব নাম জপি শান্ত মনে,
সুদূর মন্দির হতে সায়াহ্ন-পবনে
শুনিয়া আরতিধ্বনি,—এক দিন কবে
আয়ুঃশেষে মৃত্যু তোরে লইবে নীরবে,—
পতিত কুসুমে লয়ে পঙ্ক ধুয়ে তার
গঙ্গা যথা দেয় তারে পূজা-উপহার
সাগরের পদে।

অমাবাই বললে, আমার ছেলে আছে তার কি হবে। বিনায়ক রাও বললেন :

তার কথা
দূর কর্। অতীত-নির্মুক্ত পবিত্রতা
ধৌত করে দিক তোরে। সদ্য শিশুসম
আর বার আয় বৎসে পিতৃকোলে মম
বিস্মৃতি-মাতার গর্ভ হতে। নব দেশে,
নব তরঙ্গিণীতীরে, শুভ্র হাসি হেসে
নবীন কুটিরে মোর জ্বালাবি আলোক
কন্যার কল্যাণ-করে।

অমাবাই বললে :

জলে পতিশোক,
বিশ্ব হেরি ছায়াসম ; তোমাদের কথা
দূর হতে আনে কানে ক্ষীণ অস্ফুটতা,
পশে না হৃদয়মাঝে। ছেড়ে দাও মোরে
ছেড়ে দাও। পতিরক্তসিক্ত স্নেহডোরে
বেঁধো না আমায়।

বিনায়ক রাও দুঃখিত হয়ে বললেন : কন্যা পিতার নয় সে তো সত্য কথা, যে ফুল শাখা থেকে পড়ে গেছে সে আর শাখায় ফিরে যায় না।

কিন্তু রে শুধাই তোরে কারে ক'স পতি
লজ্জাহীনা। কাড়ি নিল যে ম্লেচ্ছ দুর্মতি
জীবাজির প্রসারিত বরহস্ত হতে
বিবাহের রাত্রে তোরে—বঞ্চিয়া কপোতে
শ্যেন যথা লয়ে যায় কপোত-বধূরে
আপনার ম্লেচ্ছ নীড়ে,—সে দুষ্ট দস্যুরে
পতি ক'স তুই। সে রাত্রি কি মনে পড়ে?
…সে দারুণ রাতে
হোমাগ্নি করিয়া স্পর্শ জীবাজির সাথে
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি—দস্যুরক্তপাতে
লব এর প্রতিশোধ। বহুদিন পরে
হয়েছি সে পণমুক্ত। নিশীথ-সমরে
জীবাজি ত্যজিয়া প্রাণ বীরের সদ্‌গতি
লভিয়াছে। রে বিধবা, সেই তোর পতি,—
দস্যু সে তো ধর্মনাশী।

এতে অমাবাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধা হয়ে বললে :

ধিক্ পিতা, ধিক্।
বধেছ পতিরে মোর—আরো মর্মান্তিক
এই মিথ্যা বাক্যশেল। তব ধর্ম কাছে
পতিত হয়েছি, তবু মম ধর্ম আছে

সমুজ্জ্বল। পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর,—বলে করি নাই আত্মদান।
মনে আছে দুই পত্র এক দিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু, "হানো তারে ছুরি,"
মাতা লিখেছিল, "পত্রে বিষ দিনু পুরি
করো তাহা পান।" যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত
তাহলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ? হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ? ধর্মের সে নয়,
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে। মাঝে মাঝে তবু
সংস্কার উঠিত জাগি,—কোনো দিন কভু
নিগূঢ় ঘৃণার বেগ শিরায় অধীর
হানিত বিদ্যুৎকম্প,—অবাধ্য শরীর
সংকোচে কুঞ্চিত হত; কিন্তু তারো পরে
সতীত্ব হয়েছে জয়ী। পূর্ণ ভক্তিভরে
করেছি পতির পূজা; হয়েছি যবনী
পবিত্র অন্তরে; নহি পতিতা রমণী;—
পরিতাপে অপমানে অবনতশিরে—
মোর পতিধর্ম হতে নাহি যাব ফিরে
ধর্মান্তরে অপরাধী সম।

এমন আন্তরিক পরধর্মপ্রীতি জগতের সাহিত্যে কমই রূপলাভ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে কবির অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটক। বাদশাহ আকবরের পুত্র সেলিম

ও রাণা প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী—এদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ একান্ত হৃদয়গ্রাহী করে আঁকা হয়েছে তাতে। নাটকখানির বিরুদ্ধে সেদিনে রাজস্থান থেকে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছিল। এই 'সতী' অবশ্য 'অশ্রুমতী'র চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী রচনা। তবে পূর্ববর্তীর গৌরব 'অশ্রুমতী'র লেখকের প্রাপ্য।

অমাবাই-এর কথা শেষ না হতেই তার মাতা রমাবাইকে ছুটে আসতে দেখা গেল। তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়ে অমাবাই বললে :

এ কী, এ কী!
নিশীথের উল্কাসম এ কাহারে দেখি
ছুটে আসে মুক্ত কেশে।
জননী আমার
কখনো যে দেখা হবে এ জনমে আর
হেন ভাবি নাই মনে। মাগো, মা জননী,
দেহ পদধূলি।

রমাবাই বলে উঠলেন :

ছুঁস্‌নে যবনী
পাতকিনী।

অমাবাই বললে

কোনো পাপ নাই মোর দেহে,—
নিষ্পাপ তোমারি মতো।

রমাবাই বললেন :

যবনের গেহে
কার কাছে সমর্পিলি ধর্ম আপনার?

অমাবাই বললে

পতি কাছে।

রমাবাই বললেন

পতি! ম্লেচ্ছ, পতি সে তোমার!
জানিস কাহারে বলে পতি! নষ্টমতি,
ভ্রষ্টাচার! রমণীর সে যে এক গতি,

একমাত্র ইষ্টদেব। ম্লেচ্ছ মুসলমান,
ব্রাহ্মণ-কন্যার পতি! দেবতা সমান!

অমাবাই বললে

উচ্চ বিপ্রকুলে জন্মি তবুও যবনে
ঘৃণা করি নাই আমি, কায়বাক্যেমনে
পূজিয়াছি পতি বলি; মোরে করে ঘৃণা
এমন সতী কে আছে? নহি আমি হীনা
জননী তোমার চেয়ে,—হবে মোর গতি
সতীস্বর্গলোকে।

তখন রমাবাই 'সতী' কথাটার উপরে জোর দিয়ে কন্যাকে বললেন:

সতী তুমি!

অমাবাই বললে: আমি সতী।

রমাবাই বললেন:

জানিস মরিতে অসংকোচে?

অমাবাই বললে:

জানি আমি।

রমাবাই তখন বললেন:

তবে জ্বাল্ চিতানল। ওই তোর স্বামী
পড়িয়া সমরভূমে।

অমাবাই বললে:

জীবাজি?

রমাবাই বললেন:

হাঁ জীবাজি।
বাগ্‌দত্ত পতি তোর। তারি ভস্মে আজি
ভস্ম মিলাইতে হবে। বিবাহরাত্রির
বিফল হোমাগ্নিশিখা শ্মশানভূমির
ক্ষুধিত চিতাগ্নিরূপে উঠেছে জাগিয়া;
আজি রাত্রে সে-রাত্রির অসমাপ্ত ক্রিয়া
হবে সমাপন।

এতক্ষণে বিনায়ক রাও-এর ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। তিনি তাঁর কন্যার মনের ভাব পুরোপুরি বুঝতে পেরে বললেন :

যাও বৎসে, যাও ফিরে
তব পুত্র কাছে, তব শোকতপ্ত নীড়ে।
দারুণ কর্তব্য মোর নিঃশেষ করিয়া
করেছি পালন,—যাও তুমি।

পত্নীর দিকে ফিরে বললেন :

বৃথা করিতেছ ক্ষোভ। যে নব শাখারে
আমাদের বৃক্ষ হতে কঠিন কুঠারে
ছিন্ন করি নিয়ে গেল বনান্তরছায়ে,
সেথা যদি বিশীর্ণা সে মরিত শুকায়ে,
অগ্নিতে দিতাম তারে ; সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি ;
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।
অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

মনে কোনো ক্ষোভ না রেখে কন্যাকে তিনি বললেন স্বধর্মনিষ্ঠা হতে, কেননা তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি জানেন, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য এক, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ বহু—

যাও বৎসে, চলে।
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে—যাও তব
স্নেহপ্রীতিজড়িত সংসারে,—অভিনব
ধর্মক্ষেত্র মাঝে।

পরধর্মপ্রীতির কথা বলা অনেকটা সোজা, কিন্তু কাজে দেখানো সোজা নয় আদৌ, বিশেষতঃ এমন সংকটাপন্ন ক্ষেত্রে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিনায়ক রাও সর্বান্তঃকরণে সেই পরধর্মপ্রীতি দেখালেন। পত্নীকে তিনি বললেন :

এস প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে
সংসারের দুঃখ-সুখ চক্র-আবর্তন
ত্যাগ করি,—

কিন্তু রমাবাই নারী, নিত্য-ধর্মের কথা তিনি তেমন জানেন না যেমন জানেন লোক-ধর্মের কথা। তাছাড়া তাঁর কন্যার নামে অপযশ রটেছে, সেই অপযশ কিসে ঘোচানো যায় সেই দিকেই তাঁর দৃষ্টি; তিনি বললেন:

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ভের লজ্জা। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গারসম সে কলঙ্ককালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব দুহিতার নামে
সতী-মঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

তখন অমাবাই তার মাকে বুঝিয়ে বললে:

ছাড়ো লোকলাজ
লোকখ্যাতি,—হে জননী এ নহে সমাজ,
এ মহাশ্মশানভূমি। হেথা পুণ্যপাপ
লোকের মুখের বাক্যে করিয়ো না মাপ,—
সত্যেরে প্রত্যক্ষ করো মৃত্যুর আলোকে।
সতী আমি। ঘৃণা যদি করে মোরে লোকে
তবু সতী আমি। পরপুরুষের সনে
মাতা হয়ে বাঁধ যদি মৃত্যুর মিলনে
নির্দোষ কন্যারে—লোকে তোরে ধন্য কবে—
কিন্তু মাতঃ নিত্যকাল অপরাধী রবে
শ্মশানের অধীশ্বর পদে।

কিন্তু কোনো কথা বুঝবার মতো অবস্থা রমাবাই-এর নয়। তাঁর একমাত্র কথা তাঁর কন্যার কুযশ ঘুচে গিয়ে সুযশ রটুক। তিনি আদেশ করলেন :

জ্বালো চিতা,
সৈন্যগণ। ঘেরো আসি বন্দিনীরে।

অমাবাই নিরুপায় হয়ে পিতার শরণাপন্ন হ'ল, পিতা তাকে অভয় দিলেন। দুঃখিত হয়ে তিনি বললেন :

যেই হস্তে তোরে
বক্ষে বেঁধে রেখেছিনু, কে জানিত ওরে
ধর্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে
সেই হস্তে এক দিন হইবে খণ্ডিতে
তোমারি সৌভাগ্যসূত্র হে বৎসে আমার।

কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছিলেন, বললেন :

বৃথা আচার বিচার।
পুত্র লয়ে মোর সাথে আয় মোর মেয়ে
আমার আপন ধন। সমাজের চেয়ে
হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন।
পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম,—আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয় ?

অমাবাই পিতার সঙ্গে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু রমাবাই বাধা দিয়ে বললেন :

রে পাপিষ্ঠে, ঐ দেখ্ তোর লাগি প্রাণ
যে দিয়েছে রণভূমে,—তার প্রাণদান
নিষ্ফল হবে না, তোরে লইবে সে সাথে
বরবেশে ধরি তোর মৃত্যুপূত হাতে
সুরস্বর্গমাঝে।

সৈন্যদের তিনি আদেশ করলেন (অমাবাইকে যে আর ঘরে নেওয়া যায় না সহজেই সেকথা তিনি বুঝেছিলেন) :

শুন, যত আছ বীর,
তোমরা সকলে ভক্ত ভৃত্য জীবাজির,—
এই তাঁর বাগ্‌দত্তা বধূ,—চিতানলে
মিলন ঘটায়ে দাও মিলিয়া সকলে
প্রভুকৃত্য শেষ করো।

সৈন্যগণ তখন চীৎকার করে উঠল "ধন্য পুণ্যবতী" এবং অমাবাইকে জোর করে চিতায় তুলতে গেল, বিনায়ক রাও বললেন :

ছাড়্ তোরা।

সৈন্যগণ বললে :

যিনি এ নারীর পতি
তাঁর অভিলাষ মোরা করিব পূরণ।

বিনায়ক রাও বললেন :

পতি এঁর স্বধর্মী যবন।

বিনায়ক রাও-এর এমন কথা শুনে সেনাপতি বললে :

সৈন্যগণ,
বাঁধো বৃদ্ধ বিনায়কে।

তখন অমাবাই মাতাকে বললে, পাপীয়সী, পিশাচিনী।

রমাবাই চীৎকার করে বললেন :

মূঢ় তোরা কী করিস বসি।
বাজা বাদ্য, কর জয়ধ্বনি।

সৈন্যগণ জয় জয় ধ্বনি করে অমাবাইকে ধরে চিতায় তুলল। রমাবাই বললেন :

রটা বিশ্বময়
সতী অমা।

তখন অমাবাই অগতির গতির কাছে নিবেদন করলে :

জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ।
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।
হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু,—জাগো, তারে করো বজ্রাঘাত

দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

যেমন 'বন্দী বীরে' তেমনি এই 'সতী' নাটিকায় অতি ঘোর নৃশংসতার চিত্র কবি এঁকেছেন—অবশ্য কর্তব্যবোধে। 'বন্দী বীরে' যেমন বিজয়ী মোগল পক্ষের বিচারকের নির্মম দর্পের চিত্র তিনি এঁকেছেন, 'সতী'তে তেমনি তিনি এঁকেছেন অমাবাই-এর (এবং তাঁর নিজেরও) আপনার লোকদের ভয়াবহ বিচারমূঢ়তার চিত্র, কেননা তিনি সত্যসন্ধ; তিনি জানেন, ক্ষুদ্র দেশধর্ম ও জাতিধর্মের উর্ধ্বে স্থান হওয়া চাই নিত্যধর্মের। 'তব নিত্যধর্মে করো জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে'—এটি কবির এক অপূর্ব প্রাণময় ধ্বনি এই কাব্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই নিত্যধর্মবোধ ও তার এমন অপূর্ব চিত্রণ জগতের সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি—হয়ত বা অদ্বিতীয় কীর্তি। আমাদের দেশের জন্য এই চিন্তা যে কত অর্থপূর্ণ তা সহজেই বোঝা যায়।

এর পরের কবিতা 'নরকবাস'। একটি অতি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এটি লেখা। রাজা সোমক তাঁর একমাত্র শিশুপুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন, এত ভালবাসতেন যে একদিন অন্তঃপুরে সেই শিশুপুত্রের কান্না শুনে রাজসভায় সমাগতদের কথা না ভেবে তিনি পুত্রের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফিরে এলে তাঁর পুরোহিত তাঁকে কড়া কথায় ভৎর্সনা করলেন। রাজা বিনীতভাবে নিজের অন্যায় স্বীকার করলেন। কিন্তু বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রাজপুরোহিত বললেন—রাজার এক-পুত্র-শাপ দূর হতে পারে এমন পন্থা আছে, কিন্তু কাজটি কঠিন, রাজা হয়ত তা পেরে উঠবেন না। রাজা বললেন :

নাহি হেন সুকঠিন কাজ
পারি না করিতে যাহা ক্ষত্রিয়-তনয়—
কহিলাম স্পর্শি তব পাদপদ্মদ্বয়।

তখন রাজপুরোহিত প্রস্তাব করলেন :

আমি করি যজ্ঞ-আয়োজন,
তুমি হোম করো দিয়ে আপন সন্তান।
তারি মেদগন্ধধূম করিয়া আঘ্রাণ
মহিষীরা হইবেন শতপুত্রবতী—
কহিনু নিশ্চয়।

সবাই এমন প্রস্তাবে ধিক্ ধিক্ করতে লাগল, কিন্তু রাজা বললেন :

তাই হবে প্রভু,
ক্ষত্রিয়ের পণ মিথ্যা হইবে না কভু।

রাজা সোমক ও তাঁর পুরোহিত দুজনেরই এমন গর্হিত কার্যের জন্য নরকবাস হ'ল। কিন্তু অন্তর-নরকানলে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার পরে রাজা যখন স্বর্গের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পুরোহিত তাঁকে ডেকে তাঁর ঘোর দুষ্কৃতির কথা স্বীকার করলেন ও নরকে তাঁর দুর্দশার কথা বললেন। রাজা ক্ষাত্র অহংকারের বশবর্তী হয়ে যে অপরাধ করেছিলেন তার জন্য মনে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছেন সত্য, কিন্তু তিনি মহাপ্রাণ তাই তাঁর মনে হ'ল তাঁর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি, এমন অপরাধের জন্য তাঁর আরও দীর্ঘ দিন-রজনী নরক-অনলে দগ্ধ হওয়া চাই।

ধর্ম এসে রাজাকে বললেন :

মহারাজ,
স্বর্গ অপেক্ষিয়া আছে তোমা তরে আজ,
চলো ত্বরা করি।

রাজা বললেন :

সেথা মোর নাহি স্থান
ধর্মরাজ। বধিয়াছি আপন সন্তান
বিনা পাপে।

ধর্ম বললেন

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্তপরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

কিন্তু পুরোহিত অনুনয় করে বললেন :

যেয়ো না যেয়ো না তুমি চলে
মহারাজ। সপ্তশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না যেয়ো না
একাকী অমরলোকে। নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহ রহ
মহারাজ, রহ হেথা।

পুরোহিতের অনুনয়ে রাজা ধর্মকে বললেন :

ভগবন,
যতকাল ঋত্বিকের আছে পাপভোগ
ততকাল তার সাথে করো মোরে যোগ—
নরকের সহবাসে দাও অনুমতি।

পাপের কবলে পুরোহিতের দারুণ যাতনার কথা রাজা বুঝলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষাত্র-অহংকারের বশবর্তী হয়ে তিনি যে ঘোর অপরাধ করেছিলেন সেই স্মৃতির দংশন থেকে নিষ্কৃতিও তিনি পাচ্ছিলেন না। অপরাধ সম্বন্ধে রাজার এমন তীক্ষ্ণ সচেতনতা দেখে ধর্ম তাঁকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন :

মহান্ গৌরবে হেথা রহ মহীপতি।
ভালের তিলক হ'ক দুঃসহ দহন,
নরকাগ্নি হ'ক তব স্বর্গ-সিংহাসন।

নরকের প্রেতগণও রাজা সোমকের গৌরব ঘোষণা করলে :

জয় জয় মহারাজ, পুণ্যফলত্যাগী।
নিষ্পাপ নরকবাসী, হে মহাবৈরাগী,
পাপীর অন্তরে করো গৌরব সঞ্চার
তব সহবাসে। করো নরক উদ্ধার।
বসো আসি দীর্ঘ যুগ মহাশত্রু সনে
প্রিয়তম মিত্রসম এক দুঃখাসনে।
অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জলন্ত মেঘের সাথে দীপ্ত সূর্যপ্রায়

দেখা যাবে তোমাদের যুগল মুরতি
নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি।

কবি চির-সুখ-ভূমি স্বর্গ চান নি, চেয়েছেন অশ্রুজলে চির-শ্যামল 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'। কবি এখানে বলছেন, অন্যায় সম্বন্ধে যে তীক্ষ্ণ চেতনা তাই সত্যকার নরকবাস, তেমন নরকবাস মহামূল্য; তেমন চেতনা যাদের অন্তরে তারা নিষ্পাপ নরকবাসী, মহাবৈরাগী—তাদের সহবাসে পাপীর অন্তরে গৌরব সঞ্চারিত হয়, নরকের উদ্ধার সাধন হয়।

আমরা পরে দেখব কবি অতিরিক্ত 'পাপ-বোধ' ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, অন্যায় সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতনতাকে তিনি মহামূল্য জ্ঞান করেছেন। বাস্তবিকই তা মহামূল্য; তারই ভিতর দিয়ে জীবনের সত্যকার বিকাশ, সত্যকার মহত্ত্বলাভ, সম্ভবপর। বলা যেতে পারে এই ধরনের অন্তর-নরকানলে বাসই সত্যকার স্বর্গবাস। এমন নরকানলে যারা বাস করে তারাই নারকীদের সত্যকার উদ্ধারকর্তা।

আপন অন্তরের অলৌকিক আনন্দ-বেদনা আর দেশের বিচিত্র দুর্গতি সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ চেতনা সারা জীবন কবির জন্য এমন নরকানল রচনা করেছিল।

এর পরের কবিতা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। ছড়ার ছন্দে হাল্‌কা রচনা এটি—মাঝে মাঝে জ্ঞানগর্ভ বাণীতে সমুজ্জ্বল।

'কাহিনী'র শেষ কবিতা 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'—১৩০৬ সালে লেখা। এটিও সুপ্রসিদ্ধ। এতে কর্ণের মহৎ চরিত্র খুব স্পষ্ট ও অজটিল রেখায় ফুটেছে।

কুন্তী জন্ম-মুহূর্তে কর্ণকে সন্তানের অধিকার দেন নি। সে মানুষ হয়েছে সূতপুত্র রূপে, পেয়েছে কৌরবের সখ্য। আজ যদি সে রাজ-জননী কুন্তীর আহ্বানে তাঁকে মাতা বলে তাঁর সন্তানদের দলে যায়, তার এত দিনের সম্পর্ক ছেদন করে, তবে সে শুধু ধিক্কারের যোগ্যই হবে। আজ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে পাণ্ডবদের জয় হবে। কিন্তু সেই দুর্দিনে বীরের সদ্‌গতি থেকে সে ভ্রষ্ট না হোক—সে নির্লোভ ও অভীত থাকুক—এই আশীর্বাদ সে জননী কুন্তীর কাছে চায়। তার শেষ উক্তিতে তার চরিত্রবল অপূর্ব রূপ পেয়েছে:

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।

আজি এই রজনীর তিমির-ফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধ-ফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন
জয়হীন চেষ্টার সংগীত—আশাহীন
কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে ক'রো না আহ্বান।
জয়ী হ'ক রাজা হ'ক পাণ্ডব-সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
জন্মরাত্রে ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন—আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগো জননী
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় অভয় ও অলোভ যে রূপ পেয়েছে তা শুধু মনোজ্ঞ নয়, তা মহিমময়।

কণিকা

'কণিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৬ সালে।

'কণিকা' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সমষ্টি। ইংরেজিতে এই জাতীয় কবিতাকে এপিগ্র্যাম বলা হয়। এদের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলো গভীর জ্ঞানে পূর্ণ কিন্তু স্বল্পকলেবর। সাহিত্যিক সৌষ্ঠবও এসবে কম নয়—তীক্ষ্ণ বাচন-ভঙ্গি—অনেক ক্ষেত্রে শ্লেষ—এসবের প্রধান অবলম্বন।

গ্যেটের এপিগ্র্যামের সঙ্গে এসব মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। গ্যেটের এপিগ্র্যাম এসবের তুলনায় হয়ত জ্ঞানগম্ভীর কিছু বেশি।

আমাদের দেশের চাণক্য-বচন ও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার সঙ্গেও এসবের তুলনা হতে পারে। তবে চাণক্য-বচনে সাহিত্যিক সৌষ্ঠব কম, আর সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা অনেক ক্ষেত্রে হালকা ধরনের।

'কণিকা'র কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করা যাক :

মূল

আগা বলে—আমি বড়ো, তুমি ছোটো লোক।
গোড়া হেসে বলে—ভাই ভালো তাই হ'ক।
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্বে আছ ভোর
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।

স্পর্ধা

হাউই কহিল—মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে—তার গায়ে লাগে নাকো কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

নিরাপদ নীচতা

তুমি নীচে পাঁকে পড়ি ছড়াইছ পাঁক,
যেজন উপরে আছে তারি তো বিপাক।

নূতন ও সনাতন

রাজা ভাবে, নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি। ন্যায়ধর্ম বলে,
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা দেয়
যা তব নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।

কর্তব্য-গ্রহণ

কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

সৌন্দর্যের সংযম

নর কহে—বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি।
নারী কহে জিহ্বা কাটি—শুনে লাজে মরি।
পদে পদে বাধা তব—কহে তারে নর।
কবি কহে—তাই নারী হয়েছে সুন্দর।

চালক

অদৃষ্টেরে শুধালেম—চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল—ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

ক্ষণিকা

'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের শ্রাবণে। সেই বৎসরেই সূচনার কয়েক মাসে এর কবিতাগুলি লেখা হয়। এই কাব্য কবি উৎসর্গ করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সুহৃদ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে। উৎসর্গে কবি লেখেন :

ক্ষণিকারে দেখেছিলে
    ক্ষণিক বেশে কাঁচা খাতায়,
সাজিয়ে তারে এনে দিলেম
    ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।
আশা করি নিদেন পক্ষে
    ছটা মাস কি এক বছরই
হবে তোমার বিজনবাসে
    সিগারেটের সহচরী।
কতকটা তার ধোঁয়ার সঙ্গে
    স্বপ্নলোকে উড়ে যাবে;
কতকটা কি অগ্নিকণায়
    ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাবে?

কতকটা বা ছাইয়ের সঙ্গে
আপনি খসে পড়বে ধুলোয় ;
তার পরে সে ঝেঁটিয়ে নিয়ে
বিদায় ক'রো ভাঙা কুলোয়।

মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের "লীলা" খণ্ডে 'ক্ষণিকা'র অনেকগুলো কবিতা স্থান পেয়েছিল, সেই "লীলা" খণ্ডের প্রবেশক কবিতা হিসাবে কবি রচনা করেন এই কবিতাটি :

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-কথা তুমি বলিতে চাও
সে-কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-পথে তুমি চলিতে চাও
সে-পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও ?
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ?

বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না।

আর সেই প্রসঙ্গেই তিনি আরও লেখেন :

ভালোবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে অলীককে, সংগতকে নহে অসংগতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। স্নেহ আদর করিয়া সুন্দর মুখকে পোড়ারমুখী বলে, মা আদর করিয়া ছেলেকে দুষ্টু বলিয়া মারে, ছলনাপূর্বক ভর্ৎসনা করে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না, ভালোবাসার ধনকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলাইয়া উঠে না, সেই জন্য সত্যকে সত্যকথার দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক-পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। প্রেমলীলার এই অঙ্গটি এই গ্রন্থাবলীর "লীলা" খণ্ডে পাঠকেরা পাইবেন। ইহা ছাড়া "লীলা"র মধ্যে আর একটি জিনিস আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। "মাতাল" যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে আমি সমাজসংগত ভব্যতার ধার ধারি না —বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র, আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না,—একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই আড়ম্বর। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময়ে ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।

কবির এই সব উক্তি ক্ষণিকার অনেকগুলো কবিতার উপরে প্রচুর আলোকপাত করেছে। কবির মনোরম বিদ্রোহ, স্পর্ধা, উল্টো করে কথা বলার ভঙ্গি, 'ক্ষণিকা' পাঠকালে এসব সম্বন্ধে পাঠকদের একটু বেশি সচেতন থাকা চাই। নইলে কবির চিন্তার অপ্রত্যাশিত ঝিলিক, তাঁর কথার নতুন নতুন ছটা, এসব অনেকটা বৃথা হবে।

আমাদের সেই বহুদিন পূর্বের আলোচনাটিতে 'ক্ষণিকা' সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম :

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের তুলনা চলে। তবে ওমরের মতো জীবনের অতি-গুরু সমস্যাগুলোর কোনো মীমাংসা করতে না পেরে "ভাগ্যদেবীর ক্রূর পরিহাস পেয়ালা ভরে ভুলবার" চেষ্টাই এখানে কবির সবখানি কথা নয়। এখানে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির বেশি মিল বরং হাফিজের সঙ্গে।

এটি মোটের উপর এখনও আমাদের মত। হাফিজের কিছু কিছু বাণী পরে পরে উদ্ধৃত হবে। বিদ্রোহ, স্পর্ধা, এসব 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলোর বাইরের ঠাট, এর অন্তরতম কথা বিদ্রোহ নয়—প্রেম—নিবিড় ও ব্যথাভরা প্রেম—সে কথাটি কবি অপরূপে ব্যক্ত করেছেন এর শেষের 'অন্তরতম' কবিতায় :

আমি যে তোমায় জানি, সে তো কেউ জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে তো কেউ মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়,
কেহ কিছু নারে কহিতে।

* * *

বলি নে তো কারে, সকালে বিকালে
তোমার পথের মাঝেতে,
বাঁশি বুকে লয়ে বিনা কাজে আসি
বেড়াই ছদ্ম-সাজেতে।
যাহা মুখে আসে গাই সেই গান
নানা রাগিণীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানা মুখপানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা পানে চাই স্বপনে।

তবে ক্ষণিকায় এমন কিছু কিছু কবিতাও আছে, যাতে এই প্রেম ভিন্ন, অথবা এই প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে, অন্য ভাবও, বিশেষ করে কবির নিবিড় প্রকৃতি-প্রেম, লক্ষণীয় হয়েছে।

দীর্ঘদিন—বলা যেতে পারে 'চৈতালি'র সময় থেকে—কবির গভীর গম্ভীর ভাবের জগতে কেটেছে। 'ক্ষণিকা'য় সেই গাম্ভীর্য যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কবি সহজ ও চটুল হতে চাচ্ছেন। রচনার রীতিও কবি সেই অনুসারে বদলেছেন; হসন্তবহুল শব্দে ও সেই শব্দের ধ্বনিতে তাঁর নতুন রচনা-রীতি যথেষ্ট চমকপ্রদ হয়েছে।

এই নতুন ভাবে কবি নিজেকে উদ্বোধিত করেছেন 'ক্ষণিকা'র প্রথম কবিতায়। কবি বলছেন, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, সমস্যা, সন্ধান, এসব থাকুক, চোখের সামনে অবলীলাক্রমে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, যেসব আনন্দের ছবি ফুটে উঠছে তাই চোখ ভরে দেখা যাক আর প্রাণ ভরে উপভোগ করা যাক

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে!
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে।

* * *

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।
বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,

পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পুরাতে!
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

প্রতিমুহূর্তের চপল সৌন্দর্য আগেও যে কবিকে না ভুলিয়েছে তা নয়, তবে কবি এবার যেন সংকল্প করে বসেছেন যে যা নিত্য নয় চপল তাকেই তিনি দেখবেন, যা নিত্য যা শাশ্বত যা গহন গভীর সেসবের কথা থাকুক, কেননা সেসবের অন্ত পাওয়া যে ভার।

'ক্ষণিকা'য় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা একটি রস হয়ে উঠেছে। সেই জন্য এতে দার্শনিকতা বা চিন্তার কথা যথেষ্ট থাকলেও এটি ঠিক দার্শনিক কাব্য নয়। এর মেজাজটি বিশেষভাবে সাহিত্যিক, অর্থাৎ বহুর রসের রসিক।

এর পরের 'যথাসময়' কবিতায় কবি নিজেকে সমঝাচ্ছেন কখন তাঁর কি করা উচিত। কবি বলছেন, ভাগ্য যখন কৃপণ হয়ে আসে ও তার ফলে 'বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ', ও দীর্ঘদিন একা সঙ্গিহীন অবস্থায় কাটে—

তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল।
কথার সাথে গাঁথো কথার মালা,
মিলের সাথে মিল, মিলাও মিল।

কিন্তু কপাল যদি আবার ফেরে আর তার ফলে 'বন্ধু ফিরে বন্দি করে বুকে' আর 'সন্ধি করে অন্ধ অরিদল'—

তখন খাতা পোড়াও খ্যাপা কবি,
দিলের সাথে দিল, লাগাও দিল।
বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল বাহু,
চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল।

যাঁরা প্রকৃত বন্ধু, অর্থাৎ সমপ্রাণ, তাঁদের সঙ্গের অমূল্যতার গুণগান কবি হাফিজ এইভাবে করেছেন :

ইহকাল ও পরকালের আরাম এই দুটি কথায়—

বন্ধুদের সঙ্গে উৎসব করো আর শত্রুদের সঙ্গে আপোস করো।

এর পরের কবিতা 'মাতাল'। এটি বিখ্যাত।

কবি বলছেন, সভ্য ভব্য হয়ে তাঁর দীর্ঘদিন কেটেছে, কিন্তু তিনি দেখছেন তার ফলে তাঁর সময় নষ্টই হয়েছে, লাভ কিছুই হয় নি। আজ তিনি বুঝেছেন, সভ্য ভব্য হওয়ার চাইতে অভব্য হওয়া, মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া, এসবই তাঁর জন্য ভালো :

হ'ক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক দিশাহারা,
দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে
এক দমকে করুক লক্ষ্মীছাড়া।
সংসারেতে সংসারী তো ঢের
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো।
মেলাই আছে মস্ত বড়ো লোক
সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে ;—
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া।
বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।

কবির ভাষা কী উচ্ছল! কত বুদ্ধিদীপ্ত! প্রকৃতই তিনি মাতলামির কথা বলছেন না, বলছেন প্রেরণা, প্রেম, এসবের দুর্লভ উদ্দীপনার কথা— সাধারণ বিচার-বিবেচনার কথা তার কাছে তুচ্ছ।

মাতাল হওয়ার বহু গুণগান কবি হাফিজ করেছেন। তাঁর কিছু কিছু উক্তি এই :

আজ রাত্রে আমাদের পীর মসজিদ ছেড়ে শুঁড়িখানার দিকে এলেন।
বন্ধুগণ, এর পরে আমাদের এ ভিন্ন আর কী পথ আছে।

অথবা

হাফিজ ইচ্ছা করে এই শরাব-মাখানো কোর্তা গায়ে দেয় নি—
হে পবিত্র-বস্ত্র-পরিহিত ধর্মগুরু, আমাদের অক্ষম জেনে ক্ষমা কোরো।

হাফিজের চোখে শরাব হচ্ছে অন্তরের প্রেমোচ্ছল দশা—সাধারণ ধর্মকর্ম

তাঁর কাছে একান্ত স্বাদহীন। হাফিজ সেই মদিরায় মত্ত হতেই চান; কখনো কখনো মত্ত হন। রবীন্দ্রনাথ সেই মত্ততার কদর বোঝেন, কিন্তু এখনো কিছু দূরে থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছেন।

আমরা পরে দেখবো ভগবৎপ্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা রবীন্দ্রনাথ বহু দেখেছেন, তাতে ঝাঁপিয়েও যে না পড়েছেন তা নয়; তবে তাঁর বড় কাজ হয়েছে সেই সমুদ্রের কূলে তরঙ্গ-লীলার সান্নিধ্য লাভ করা—তাতে তলিয়ে যাওয়া নয়। এ সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা হবে।

'মাতালে'র পরে যুগল, শাস্ত্র, অনবসর, অতিবাদ, এই চারটি কবিতায় উল্টো ধরনের কথাই কবি বেশি বলেছেন।

'যুগল' কবিতায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠক গোঁসাইজিকে কবি বিনয় করে বলছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের পরিবর্তে গীতগোবিন্দ পাঠ করতে—যাতে রাধা-কৃষ্ণের মানবিক লীলার পরিচয় বেশি করে আছে। কিন্তু সেই ধর্মগ্রন্থ বা কাব্য পাঠ ব্যপদেশেও কবি ভাবছেন তাঁর আর তাঁর প্রিয়ার কথা—তাঁদের পরস্পরের প্রেম-উপলব্ধির মুহূর্তে তাঁরা মরণশীল মানুষ হয়েও অন্ততঃ একবেলার জন্য অমরের মহিমা লাভ করেছেন সেই কথা—সেই মুহূর্তে জগতের আর সবই তাঁদের কাছে তুচ্ছ—অর্থহীন—

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মানব নাকো রাজার দারোগা রে,—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে,
          দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব রে ভাই, বেজার কোরো নাকো,
গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
          খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি।
একটুখানি সরে গিয়ে করো
     সঙের মতো সঙিন ঝমঝমর,
          আজকে শুধু একবেলারই তরে
               আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

কবি ব্রাউনিঙের The Last Ride Together কবিতাটির সঙ্গে এই

কবিতাটি মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। সেখানেও প্রেম-উপলব্ধির মুহূর্তের অমূল্যতার কথা বলা হয়েছে।

'শাস্ত্র' কবিতাটিতে 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে' এই শাস্ত্র-বচনের উপরে কবি তাঁর তির্যকদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেছেন, বনের যে নিরিবিলি জীবন তা যাপন করবার প্রয়োজন তো বৃদ্ধদের নয়, সে-প্রয়োজন বরং নব-প্রেম-বদ্ধ যুবক-যুবতীদের, কেননা—

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান মুখে নানা কথা,
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প, ফুরায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি
সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায়,
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
এ-কথা সে বিশেষ বোঝে।

বুড়ো হলে বিষয়াসক্তি না কমে বরং বেড়ে যায় এই কথাটিও কবি উপভোগ্য করে বলেছেন—

বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র,
চালান মামলা-মোকদ্দমা ;
* * *
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভালো চলে।

'অনবসর' কবিতাটিতে কবি তাঁর তির্যক্‌ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যা সব আমাদের নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ বলে পরিচিত সেসবের উপরে। সেসবের অভাবে আমরা যে যথেষ্ট দুঃখ পাই তা ঠিক, কিন্তু সেই দুঃখ নিয়ে যে দীর্ঘকাল শোক করবো জগতে তার অবসর নেই, কেননা, জগৎ পরিবর্তনশীল, আর নিত্য নতুন শোভা-সম্পদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সেসবের প্রতি যদি অবহেলা দেখাই তবে সেটি হবে বর্বরতা।

মনে হতে পারে জগতে সব-কিছুই যে পরিবর্তনশীল সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কবি আমাদের প্রেমের আকুলতাকে বিদ্রূপ করেছেন। কিছু বিদ্রূপ হয়তো করেছেন, কিন্তু তাঁর বড় কথাটি এই : সৌন্দর্য ও মাধুর্য নতুন নতুন বেশে এসে আমাদের চোখের সামনে দাঁড়াচ্ছে, তাদের আমরা অবহেলা করতে পারি না, তাদের সম্বন্ধে আমাদের যথাযোগ্য ভাবে সচেতন হওয়া চাই :

এস আমার শ্রাবণ-নিশি,
  এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
  লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এস, তুমিও এস,
  তুমি এস—এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
  ধরণীর নাম মর্ত্যভূমি।

যে যায় চলে বিরাগভরে
  তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে কাটাই, এমন
  সময় যে নেই, সময় যে নেই।

সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য আমাদের মুগ্ধ করে এই কথাটি কবি বলেছেন তাঁর 'অনবসরে'। 'অনবসরে'র পরের কবিতা 'অতিবাদ'-এ কবি বলেছেন সৌন্দর্য যে মুহূর্তে আমাদের মুগ্ধ করে সেই মুহূর্তের অপূর্বতার কথা। সেই মুহূর্তের কথা স্বভাবতঃ আমরা অতিরঞ্জিত করে বলি, কিন্তু আসলে সেই অতিরঞ্জনেও

আমাদের মনের ভাব পুরোপুরি প্রকাশিত হয় না। সেই মুহূর্তে সত্যের যথাযথ রূপের কথা আমরা ভাবতেই পারি না, অতিবাদই তখন সত্যের যথার্থ রূপ—

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব।
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্ প্রয়োজন?
ছুটুক বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে যত্ব ণত্ব।

*　　　*　　　*

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
করো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।

*　　　*　　　*

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো
বলব তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করছে ভুবন নূতন সৃষ্টি
মুচকি হাসির সুধার বৃষ্টি
চলছে আজি জগৎ জুড়ে।

ভাষায় ও ভঙ্গিতে কী ঔজ্জ্বল্যের ছটা!

ছন্দ আর মিলের দিক দিয়েও 'ক্ষণিকা'র কবিতাগুলো খুব লক্ষণীয়। এই ধরনের দুর্লভ ঔজ্জ্বল্যের ছটা হাফিজের গজলে সুপ্রচুর। কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করছি:

আমাদের নিরন্তর পানমুখে ওরে বঞ্চিত, শোন্—
আমরা আমাদের পেয়ালার ভিতরে প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখেছি।

* * *

গোলাপের গণ্ডের আগুন
বুলবুলের বাসা পুড়িয়ে দিয়েছে।

* * *

যারা তোমার মদির নার্গিস-চোখের দাস
তারাই মুকুটধারী রাজা।
যারা তোমার রক্ত-অধর-মদের মাতাল
তারাই জ্ঞানবান॥

এর পরের কবিতা 'যথাস্থান'-এ কবি বলেছেন তাঁর কবিতা কোন্ হাটে বিকোতে চায়, অর্থাৎ কারা তাঁর যথার্থ পাঠক, সেই কথা। বিদ্যেরত্ন-পাড়ায়, যেখানে 'পাত্রাধার কি তৈল কিংবা তৈলাধার কি পাত্র?' এই সব নিয়ে দিনরাত্রি সূক্ষ্ম তর্ক চলেছে, তাদের মধ্যে তাঁর কাব্য আসন পেতে চায় না। ধনীর 'মেহগিনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থে'র শ্রেণীভুক্ত হতেও তাঁর কাব্যের আগ্রহ নেই। একজামিনের পড়ায় ব্যস্ত নবীন ছাত্র, গৃহকর্মে ব্যস্ত লক্ষ্মীবধূ, এদের পাঠকরূপে পেতে তাঁর কাব্যের আপত্তি নেই; কিন্তু তাঁর বিশেষ আগ্রহ নবীন প্রেমিক-প্রেমিকার পাঠ্য হতে:

পাখি তাদের শোনায় গীতি,
নদী শোনায় গাথা,
কত রকম ছন্দ শোনায়
পুষ্প লতা পাতা,

সেইখানেতে সরল হাসি
সজল চোখের কাছে
বিশ্ব-বাঁশির ধ্বনির মাঝে
যেতে কি সাধ আছে ?

হঠাৎ উঠে উচ্ছ্বসিয়া
কহে আমার গান—
সেইখানে মোর স্থান।

এর পরের 'বোঝাপড়া'য় কবি নিজেকে বোঝাচ্ছেন, কেউ বা আমাদের ভালোবাসে কেউ বা বাসে না, ছোটোখাটো আঘাত জীবনে তো অনেকই আসে বড় আঘাতও মাঝে মাঝে আসে ; কিন্তু ভালো মন্দ যা-ই আসুক সেসব সহজ ভাবে জীবনে গ্রহণ করাই সংগত। কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিতান্ত অর্থহীন—হাস্যকর বললেই চলে :

নিজের ছায়া মস্ত করে
অস্তাচলে বসে বসে
আঁধার করে তোল যদি
জীবনখানা নিজের দোষে,
বিধির সঙ্গে বিবাদ করে
নিজের পায়েই কুড়ুল মার,
দোহাই তবে এ কার্যটা
যত শীঘ্র পার সারো।
খুব খানিকটে কেঁদেকেটে
অশ্রু ঢেলে ঘড়া ঘড়া—
মনের সঙ্গে এক রকমে
করে নে ভাই বোঝাপড়া।
তাহার পরে আঁধার ঘরে
প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো
ভুলে যা ভাই কাহার সঙ্গে
কতটুকুন তফাত হল।

মনেরে তাই কহ, যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

আমরা একে অন্যকে খুব কম জানি সে কথা কবি বলেছেন 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। সেই কথাটি অপূর্ব ছন্দোবন্ধে তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'অচেনা' কবিতাটিতে :

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায় রে।
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিস?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে।
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে, এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।

এর পরের 'তথাপি' কবিতাটি অনেকটা পূর্ববর্তী 'অনবসর' কবিতাটির অনুরূপ। কবি তাঁর প্রিয়াকে বলছেন—বলছেন অবশ্য চোখ ঠেরে—

দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
সেটা কিন্তু বলে রাখাই সংগত।
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
নিন্দা তারা করতে পারে অন্তত।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায়?
আমারো এই অশ্রু হবে মার্জনা।
ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
সান্ত্বনার্থে হয়তো পাব চার জনা।

কিন্তু শেষে তিনি বলছেন এসব সত্ত্বেও তাঁর প্রিয়াকেই তিনি পেতে চান :

কিন্তু তবু তুমিই থাকো সমস্যা যাক ঘুচি।
চারের চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি।

এর পরের কবিতা বিখ্যাত 'কবির বয়স'। কবি বলছেন তাঁর চুলে পাক ধরেছে, পরকালের ডাক শোনার তাঁর বয়স হ'ল, কিন্তু আসলে তিনি ছেলে বুড়ো গৃহী সাধক সবারই সমানবয়সী। সবারই মনের কথাটি বোঝা, তা প্রকাশ করে বলা, এই তাঁর কাজ; তাই নিজের মুক্তির কথা ভাববার অবসর তাঁর নেই—

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে নজর এত কেন ?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি একবয়সী জেনো।
ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে,
কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে ;—
কেউ বা থাকে ঘরের কোণে দোঁহে,
জগৎ মাঝে কেউ বা হাঁকায় রথ,
কেউ বা মরে একলা ঘরের শোকে,
জনারণ্যে কেউ বা হারায় পথ।

সবাই মোরে করেন ডাকাডাকি,
কখন শুনি পরকালের ডাক ?
সবার আমি সমানবয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।

পরবর্তীকালে কবি বলেন—"বিচিত্রের দূত আমি।"

এর পরের কবিতাটি 'বিদায়'। কবি বন্ধুদের সঙ্গে গানের জলসায় ছিলেন, সেখান থেকে বিদায় নিয়ে তিনি ঘুমোতে যেতে চাচ্ছেন। কবির এই ভাবটি এর পরে আরও বিকশিত আকারে আমরা পাবো তাঁর 'খেয়া'য়। এই কবিতায় তাঁর নতুন বৈরাগ্যমুখী চেতনার কথাটি খুব সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে ব্যক্ত

হয়েছে। কবির মাঝে মাঝে মনে হয়, যেভাবে তাঁর জীবন কেটেছে তার একটু অদল-বদল যদি সম্ভবপর হ'ত তবে সেইটি আনন্দের হ'ত। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলছেন, অদল-বদলের দরকার নেই, যা হয়েছে তাই ভালো হয়েছে। পরে অন্য কবিতায় কবি বলেন :

যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি ধন্য আমার ধরণী।

কবির স্ফূর্তিবাজ রূপটি কেমন অলক্ষিতভাবে আত্মগোপন করতে চাচ্ছে তাঁর নতুন গম্ভীর চেতনার মধ্যে!—

আমার যন্ত্রে একটি তন্ত্রী
একটু যেন বিকল বাজে,
মনের মধ্যে শুনছি যেটা
হাতে সেটা আসছে না যে।
একেবারে থামার আগে
সময় রেখে থামতে যে চাই,—
আজকে কিছু শ্রান্ত আছি,—
ঘুমোতে যাই—ঘুমোতে যাই।

বিদায়ের পরের কবিতা 'অপটু'। বিদায়ের ভাবটি তাতে আরও হৃদয়-গ্রাহী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়াকে কবি বলছেন, তাঁর উদ্দেশ্যে তিনি মালা গাঁথতে চাচ্ছেন, গান গাইতে চাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর হাত ও কণ্ঠ দুইই আজ অপটু হয়ে পড়েছে। কবি তাঁর প্রিয়ার কাছে অভিযোগ করছেন এই বলে যে এমন অপটুতা যে তাঁতে দেখা দিল এ কবির নিজের দোষে নয়, তাঁর প্রিয়ার দৃষ্টিরই দোষে। প্রিয়ার দৃষ্টির সামনে কিছুই আর করবার সাধ্য তাঁর নেই, তাই তিনি প্রিয়াকে (প্রিয়া অবশ্য এখানে বিশ্বপ্রিয়া ভিন্ন আর কেউ নন) বলছেন :

রেখে দিলাম মাল্য বীণা
সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে

এমন কোনো কর্ম দেহ
অকর্মণ্য দাসে।

কবি নিজেকে বলছেন অকর্মণ্য, অর্থাৎ শুধু নীরব আত্মনিবেদন এখন তাঁর জন্য সত্য হতে চাচ্ছে। হাফিজের একটি সুপরিচিত গজলে এই দুটি চরণ আমরা পাচ্ছি:

তোমার নার্গিস-চোখের সামনে কারো সাধ্য নেই যে শান্তিতে বসে থাকবে। তাই ভালো পন্থা হচ্ছে তোমার ওই মন-কাড়া চোখের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া॥

এর পরের 'উৎসৃষ্ট' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়াকে বলছেন, প্রিয়া তাঁর জন্য মালা গাঁথছেন, কিন্তু হায়, কবি তাঁর মালা যে বহু জনের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। বিধি বহু সুন্দরীর তনু মাল্যে ও পরিচ্ছদে সাজিয়ে তাঁকে দান করেছেন, তাই একটি প্রিয়াকে মালা দেওয়া আর তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়; তাঁর মনটি অনেক দেশে অনেক বেশে অনেক সুরে হারিয়ে গেছে।—বিচিত্র সৌন্দর্য কবিদের মনকে টানে, সেকথাটি অপূর্ব ভঙ্গিতে ব্যক্ত হ'ল!—কবি তাই বলছেন,—নিজের মনটি দেবার আশা তিনি আর করেন না, পরের মনটি পাবার আশায়ই তিনি বেঁচে আছেন।

কবি প্রিয়ার—বিশ্বপ্রিয়ার—করুণার (graceএর) উপরে নির্ভরশীল কি? হয়ত তাই। কিন্তু প্রবলভাবে নয়। পুরুষকার তাঁর খুব প্রিয়।

এর পরের 'ভীরুতা' কবিতাটি সুপরিচিত এবং খুব উপভোগ্য। কবি, অথবা প্রেমিক, প্রিয়ার আকর্ষণে নিবিড়ভাবে বাঁধা পড়েছে, তাকে ছেড়ে আর তার চলে না, কিন্তু তার দশা যে এমন হয়েছে তা সে প্রকাশ করে বলতে অনিচ্ছুক এই ভয়ে যে প্রিয়া তার অনুরাগ নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করবে—সেটি যে তার সইবে না। তাই তার মন যা চায় তার বিপরীত ভাব তার ব্যবহারে প্রকাশ পাচ্ছে:

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কিনা
বুঝব কেমন করে?

কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
গর্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

এর পরের 'পরামর্শ' কবিতায় কবি নিজেকে পরামর্শ দিচ্ছেন—

অনেক বার তো হাল ভেঙেছে
পাল গিয়েছে ছিঁড়ে
ওরে দুঃসাহসী।
সিন্ধুপানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।

কিন্তু এখন তো আর সে বল নেই। কাজেই নতুন করে আর কোনো দুঃসাহসিক যাত্রায় না বেরিয়ে—

এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী।'
রাখ রে আনাগোনা।
বর্ষশেষের বাঁশি বাজে
সন্ধ্যা-গগন ভরি,
ওই যেতেছে শোনা।
এবার ঘুমো কূলের কোলে
বটের ছায়াতলে
ঘাটের পাশে রহি,
ঘাটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।

কিন্তু কবি বুঝছেন তাঁর মনকে মিছে প্রবোধ দেওয়া, দুঃসাহসী হওয়াই তার স্বভাব—

হায় রে মিছে প্রবোধ দেওয়া,
অবোধ তরী মম
আবার যাবে ভেসে।
কর্ণ ধরে বসেছে তার
যমদূতের সম
স্বভাব সর্বনেশে।
ঝড়ের নেশা ঢেউয়ের নেশা
ছাড়ব নাকো আর
হায় রে মরণ-লুভী।
ঘাটে সেকি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি।

এর পূর্বে 'অশেষ' কবিতায়ও আমরা কবির এই পরিচয় পেয়েছি।

কবি জীবনের পথে চলেছেন শুধু বিচার-বুদ্ধি ও সংকল্পের জোরে নয়, নতুন নতুন প্রেরণার তাগিদে, আর সেই তাগিদ তাঁর জন্য প্রবল—অনতিক্রম্য।

এর পরের কবিতা 'ক্ষতিপূরণ'। তার বক্র ভঙ্গিটি খুব উপভোগ্য। কবি তাঁর কবিতা-সুন্দরীকে বা কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বলছেন লোকেরা যে এই বলে তাঁর অপবাদ দিচ্ছে যে তিনি নেশায় মেতে তুচ্ছ কথা ছন্দে গেঁথে বাংলা দেশে উচ্চ কথা ঢাকছেন এই কলঙ্ককে তিনি জ্ঞান করেছেন তাঁর জয়তিলক :

ফেলুক মুছি হাস্য-শুচি
তোমার লোচন
বিশ্বশুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘোরে।

কবি মহাকাব্য রচনায় মন দেন নি, সারা জীবন গীতিকাব্য রচনায়ই কাটিয়েছেন, তার কারণস্বরূপ বলছেন :

আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিংকিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

কবি বলছেন, মহাকাব্যের অষ্টসর্গব্যাপী পুরাণ-চিত্র বীরচরিত্র এই সব অঙ্কিত করার দিকে তাঁর মন যে যায় নি (আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকদের মতে মহাকাব্য অন্তত: আট সর্গের হওয়া চাই আর তার নায়ক হবেন কোনো সদ্‌বংশসম্ভূত ধীরোদাত্ত প্রতাপবান্ ব্যক্তি), তিনি যে শুধু তাঁর কবিতা-সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমের আলাপ করেই দিন কাটিয়েছেন, তিনি মনে করেন সেইটিই সবচাইতে ভালো কাজ তিনি করেছেন—তাঁর কাব্য-সুন্দরীর হরিণ-আঁখির দৃষ্টির প্রসন্নতা লাভ করতে পারলেই তিনি অমর হবেন, মরার পরে অমরতা লাভ তাঁর কাম্য নয়—

পুরাণ-চিত্র বীর চরিত্র

কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্গ—

ভাষার কী শাণিত দীপ্তি!

কাব্যের রসে বিভোর হওয়ার (ecstasy-র) আনন্দ কবির জন্য সবচাইতে কাম্য, তাই তাঁর জন্য পরম সার্থকতা, এই কবির বক্তব্য।

কবি হাফিজের সুবিখ্যাত দুইটি লাইন

যদি আমার সেই শিরাজের প্রিয়া আমার হারানো মনটি নিয়ে হাজির হয়,
তবে তার গালের কালো তিলের জন্যই আমি সমরকন্দ ও বোখারা দান
করে দেব

এই সম্পর্কে স্মরণীয়।

এর পরের কবিতা 'সেকাল'। এটি খুব জনপ্রিয়।

টেনিসনের Recollections of the Arabian Nights কবিতাটি এই সম্পর্কে স্মরণীয়। টেনিসনের কলাকৌশল অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখা দিয়েছে; তবে টেনিসনের রচনায় শিল্প-চাতুর্য খুব চোখে পড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় সব শিল্প-চাতুর্য ডিঙিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অনুভূতির আন্তরিকতা।

টেনিসন্ যেমন হারুন-আর্-রশিদের কালের বাগ্দাদের লোকদের চাল-চলনের ও সেই কালের বৈভবের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথও তেমনি কল্পনাবলে কালিদাসের কাব্যের জগতে উপনীত হয়েছেন এবং সেই কালের জীবনের, বিশেষ করে সেই কালের সুন্দরীদের প্রসাধন-কলার, অপূর্ব ছবি এঁকেছেন :

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গনিত বসে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়ত খসে খসে।
মিলন-রাতে বাজত পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা,

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা।

কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্যের বহু চরণের ছায়া তাঁর এই কবিতার চরণগুলোর উপরে পড়েছে। চারুবাবুর বইতে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে।

উপসংহারে কবি বলেছেন কালিদাসের কালের বরাঙ্গনাদের দেখা একালে আর পাওয়া যায় না, সেকথা ভাবতে কবির খুব দুঃখ হয়; তবে এই কথা ভেবে তিনি প্রবোধও পান যে বকুল সেকালেরই মতো আজও ফোটে যদিও সেকালের মতো তা নারীর মুখ-মদের ছিটা আর পায় না, আর—

ফাগুন মাসে অশোক-ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিন হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা।

কবি আরো বলছেন, কালিদাসের নায়িকাদের সাক্ষাৎকার আমাদের মেলে না বটে, কিন্তু এখনও যেসব বরাঙ্গনা আমাদের চার পাশে আছেন তাঁদের চালচলন কিছু ভিন্নদেশী ধরনের হলেও তাঁরাও কালিদাসের চোখে ভালোই লাগতেন :

এখন যাঁরা বর্তমানে,
আছেন মর্ত্যলোকে,
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।

মরব না ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে।

আর কবি শেষে মন্তব্য করেছেন যে এক হিসাবে তিনি কালিদাসের চাইতে বেশি ভাগ্যবান কেননা কালিদাস এখন নামেই বেঁচে আছেন কিন্তু তিনি সত্যই বেঁচে আছেন :

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমি তো পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান নি মহাকবি।
বিদুষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিল না তাঁর ছবি।

যে সৌন্দর্য আজ চোখে দেখা যাচ্ছে তার দাম সবচাইতে বেশি; তাই কবি তাঁর প্রিয়াকে বলছেন :

প্রিয়ে তোমার করুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্বে বেড়াই নেচে।

এর পরের কবিতা 'প্রতিজ্ঞা'।

আমাদের দেশে সাধারণ নিয়ম এই যে তাপসরা হবেন স্ত্রী-ত্যাগী। কিন্তু কবি তাঁর তির্যক্ ভঙ্গিতে বলছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি তাপস হবেন না যদি না তপস্বিনীকে পান। কবি আসলে বলছেন প্রেরণা লাভের কথা, প্রেরণা না পেলে আর তিনি তপস্বী কেমন করে হবেন। সেই প্রেরণার এই অপূর্ব মূর্তি তিনি এঁকেছেন :

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,

যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন মল
রিনিকঝিনি
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না
পাই গো তপস্বিনী।

'প্রতিজ্ঞা'র পরের কবিতাটি 'পথে'। জীবনের বিচিত্র পথে কবিকে চলতে হয়েছে, সে চলার যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল তাও নয়, কিন্তু এমনি ভাবে পথে পথে চলতে চলতে এমন অনেক দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে যা তাঁর মনে অপরূপ আনন্দ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল :

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।
এ পথ গেছে কত গাঁয়ে,
কত গাছের ছায়ে ছায়ে,
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে।
আরেক দিন সে ফাগুন মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে, সেই
মনে জাগে।
আমের বোলের গন্ধে অবশ
বাতাস ছিল উদাস অলস,

ঘাটের শানে বাজছে কলস
ক্ষণে ক্ষণে।
সে-সব কথা ভাবছি বসে
অকারণে।

কিন্তু এখন অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে—

দীর্ঘ হয়ে পড়ছে পথে
বাঁকা ছায়া,
গোষ্ঠ-ঘরে ফিরছে ধেনু
শ্রান্তকায়া।

এই ধূসর গোধূলিতে তিনি ফিরে চলেছেন—কোথায় তাও তিনি জানেন না।

বাইরের জগতের যেসব দৃশ্য কবির চোখে পড়ছে তা অতি অল্প কথায় এক মনোহর রূপ পেয়েছে কবিতাটিতে; কিন্তু সেই মনোহরকে কবি দেখছেন কেমন অনাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে।

এর পরের 'জন্মান্তর' কবিতাটি 'চৈতালি'র 'সভ্যতার প্রতি' সনেটটির সঙ্গে পঠনীয়। 'জন্মান্তর'-এ ব্রজের রাখাল বালকদের সরল জীবন-যাত্রার আনন্দ খুব উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

এর পরের 'কর্মফল'-এ ও 'কবি'-তে কবি সাহিত্যিকদের মতভেদ ঝগড়াঝাঁটি এসবের দিকে উপভোগ্য তির্যক ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন। কবি গ্যেটেও বলেছেন :

কত দুঃখ পাই আমি
যখন দেখি অগণিত কবির ভিড়।
কারা তাড়ায় সংসার থেকে সব কবিত্ব ?
আর কেউ নয়, কবিরাই।

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কবিতাটিতে দেশ-বিদেশে ঘোরার আনন্দের উদ্দীপনা ব্যক্ত হয়েছে—সেই আনন্দই লক্ষ্মী :

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া
বাতাস বহে বেগে;
সূর্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক মারে মেঘে।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রৈব না আর কভু।

যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই।

এর পরের 'বিদায়-রীতি' কবিতাটি খুব উপভোগ্য—ঈষৎ করুণও। কবি তাঁর কাব্যরানীর কাছ থেকে বহুবার বিদায় নিয়েছেন, আর বহুবার ফিরে এসেছেন। এবারও তাঁর মনে বিদায় নেবার কথা উঠেছে। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর কবিতারানী তাঁর এই কথা শুনে লুকিয়ে হাসবেন। কবি বলছেন, তাঁর রকমসকম দেখে কবিতারানীর হাসি পাওয়াটাই স্বাভাবিক, তবু কবির এই বিদায় নেওয়াটা একটু করুণ চোখেও তিনি দেখুন। কেন? তার কারণ কবি যদিও ফিরে ফিরে আসছেন তবু বিদায় নেবার কথাটা তিনি মন থেকে দূর করতে পারছেন না :

হায় গো রানী, বিদায়বাণী
এমনি করে শোনে?
ছি ছি ওই যে হাসিখানি
কাঁপছে আঁখিকোণে।
এতই বারে বারে কি রে
মিথ্যা বিদায় নিয়েছি রে
ভাবছ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে ঘুরে
ফিরে আসবে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়ো নাকো।
ভ্রমক্রমে ক্ষণেক তরে
এনো গো জল আঁখির 'পরে
আকুল স্বরে যখন ক'ব—
সময় হল যাবার।
তখন না হয় হেসো, যখন
ফিরে আসব আবার।

এর পরের কবিতাগুলোর মধ্যে 'একটি মাত্র' একটি রূপক কবিতা। কবি 'মরু-পাহাড় দেশে' 'শুষ্ক বনের শেষে' দুই প্রহরের সময় যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন বনের মধ্যে একটি আঙুর ফল পেয়েছিলেন। সেই আঙুর ফলটি অতি যত্নে তিনি রেখেছিলেন, খুব ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ করলেও সেই ফলটির ঘ্রাণও তিনি নেন নি। কিন্তু দিনের আলো থাকতে ঘরে ফিরে সেই লুকোনো আঙুর ফলটি খুলে দেখে তিনি দুঃখিত হলেন যে সেটি তাঁর মুঠির মধ্যে শুকিয়ে গেছে।

এই আঙুর ফলটি কি? জীবন সার্থক হতে পারে এমন কোনো সম্পদ। কিন্তু সেই সম্পদ যদি আমরা যথাসময়ে জীবনের কাজে না লাগাই, কেবল তাকে কৃপণের মতো আগলে রাখি, তবে তা শুষ্ক শীর্ণ হয়ে যায়—আমাদের জীবনের কাজে আর লাগে না। আমাদের মহান পূর্ববর্তীদের অমূল্য সব নির্দেশ আমাদের কৃপণ মুঠির মধ্যে এমন শীর্ণ শুষ্ক হয়ে গেছে।

এর পরের 'সোজাসুজি,' 'অসাবধান' ও 'স্বপ্নশেষ' এই তিনটি কবিতায় কবি যাকে প্রেমের বিদ্রোহী লীলা বলেছেন প্রধানত তাই ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমকে সাধারণতঃ গভীর জটিল ও পরমবেদনাকর বলা হয়, কিন্তু কবি দেখেছেন প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের প্রতি কিঞ্চিৎ আনুকূল্য দেখানোর অতিরিক্ত কিছু নয়,—কবি যে তাঁর প্রেয়সীকে চিরকাল বা দীর্ঘদিন মনে করে রাখবেন এও সম্ভবপর মনে হয় না। কিন্তু কবি প্রেম

নিয়ে যতই চটুলতা করুন প্রেম সম্বন্ধে তাঁর ভয়ও ব্যক্ত হয়েছে 'স্বল্পশেষ'-এর এই শেষ লাইনগুলোয় :

ক্ষুদ্র আমার তরীখানি—সত্য করি' কই,
হায় গো পথিক হায়,
তোমায় নিয়ে একলা নায়ে পার হব না ওই
আকুল যমুনায়।

এখানে কূলে কূলে নৌকো বাইছে যে গোপিকা সে পথিক-রূপী কৃষ্ণকে তার নৌকোয় তুলে আকুল যমুনায় নৌকো ভাসাতে ভয় পাচ্ছে। অর্থাৎ যে-প্রেম হাল্কা লীলা বলেই মনে হচ্ছে তা যে কখন এক গভীর ও প্রবল ব্যাপার হয়ে উঠবে তার কিছুই ঠিক নেই।

এর পরের 'কূলে' কবিতাটিতে শীতকালের পদ্মা-অঞ্চলের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তখন জল অনেক নিচে নেমে যাওয়ার ফলে নদীর পাড়ি খুব উঁচু দেখায়, আর সেই উঁচু পাড়ির গায়ে হাজার হাজার গাঙ্‌শালিখ বাসা করে কলরব করে। সেই উঁচু পাড়ি বেয়ে গরু জল খাওয়ার জন্য নিচে নামতে পারে না, পাড়ের উপরে শুধু দুই একটা ছাগল চরে বেড়ায়, আর—

জলের 'পরে বেঁকে-পড়া
খেজুর শাখা হতে
ক্ষণে ক্ষণে মাছরাঙাটি
ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতে।

কবি নিজেকে বলছেন এমন আঘাটাতে বসে বসে সময় নষ্ট করা কেন। উত্তরে শুনছেন :

নাই, নাই, নাই গো আমার
কারেও কাজ নাই।

অর্থাৎ ভাঙন-ধরা কূলের বা আঘাটার যে সৌন্দর্য তা তাঁকে কম আনন্দ দিচ্ছে না। কাজেই আপাততঃ তাঁর আর কিছুতে প্রয়োজন নেই।

এর পরের কবিতা 'যাত্রী'। তার নেয়ে কে? বলা যেতে পারে, কবি। কবির জীবন-তরীতে বহুলোক তাদের ধানের আঁটি নিয়ে পার হয়েছে, সেই ধান বা জীবনের সম্পদ নিয়ে তারা কে কোথায় যাবে সে সম্বন্ধে কবি

কৌতূহলী হয়েছেন, কিন্তু সব সময়ে উত্তর পান নি, না পেয়ে তিনি দুঃখিতও নন, কেননা জীবনের সম্পদ নিয়ে কে কোথায় যাচ্ছে তা তারা নিজেরাও ভালো জানে না। আপন পর বহুজনের সঙ্গে জীবনে আমাদের যে পরিচয় হয় তা এমন ক্ষণ-পরিচয়ই বটে—চৈতালির কয়েকটি সনেটেও এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। এখানে ছবিটি আর একটু ফলাও করে আঁকা হয়েছে। জীবনে যত জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে, কবি দেখেছেন, তাদের সবারই মধ্যে মোহন ও মধুর কিছু কিছু আছে, তাই তারা কেউই অনাদরের যোগ্য নয় :

এস, এস নায়ে!
ধুলা যদি থাকে কিছু
থাক না ধুলা পায়ে।
তনু তোমার তনুলতা,
চোখের কোণে চঞ্চলতা,
সজলনীল জলদবরণ
বসনখানি গায়ে।
তোমার তরে হবে গো ঠাঁই
এস, এস নায়ে।

এর পরে 'এক গাঁয়ে' ও 'দুই তীরে' এই দুইটি কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা কবি বেশি করে বলেছেন—প্রকৃতির গাছপালা, ফুলফল, পশু-পক্ষী, নদী মেঘ বাতাস, এসব আমাদের মন কত আকর্ষণ করে, আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রীতি কত বাড়িয়ে দেয়, সেই কথা। প্রকৃতির এইসব শোভা-সৌন্দর্য অবশ্য আমাদের সবারই কাছে একই কথা ব্যক্ত করে না; কিন্তু আমাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যে বাড়িয়ে দেয় তা সত্য :

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।

আমি শুনি, শুয়ে
বিজন বালু-ভুঁয়ে,

তুমি শোন, কাঁখের কলস
ঘাটের 'পরে থুয়ে।

তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।

এর পরের 'অতিথি' কবিতাটির রূপক স্পষ্ট—বধূ হচ্ছেন রাধা আর অতিথি হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যখন দ্বারে এসেছেন তখন যেমন করেই হোক রাধার উচিত তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো—তাঁকে ফিরিয়ে না দেওয়া। কবি প্রশ্ন করছেন, অতিথি তো দ্বারে এসে হাজির, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বধূ কি এখনো উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হন নি?

ওগো বধূ হয় নি তোমার কাজ?
গৃহ-কাজ?
ঐ শোন কে অতিথ এল আজ
এল আজ।
সাজাও নি কি পূজারতির ডালা?
এখনো কি হয় নি প্রদীপ জ্বালা
গোষ্ঠগৃহের মাঝ?
অতি যত্নে সীমন্তটি চিরে
সিঁদুর-বিন্দু আঁক নাই কি শিরে?
হয় নি সন্ধ্যাসাজ?

এই ধরনের ছবি কবি বহুভাবে এঁকেছেন।

এর পরের 'সংবরণ' কবিতায় কবি মধুর বাতাস, কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখায় 'বৌ-কথা-কও' পাখির ডাক, এই সব উপভোগ করছেন। তাঁর মনে পড়ছে এমন দিন বহুবার তাঁর মনের কথা বার করে গানে গানে হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে, তাতে করে যা ছিল তাঁর নিজের দখলে তাকে পথের পান্থদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ কোনো গান তিনি গাইবেন না, কেননা গাইলে তাঁর মনের বেদনা ব্যক্ত হয়ে পড়বে। সেই বেদনা চেপে

রেখে আজ শুধু বেড়া দেওয়া বাগানে বসে এই বাতাস, 'বৌ-কথা-কও' পাখির ডাক, এই সবই তিনি উপভোগ করবেন।

এর পরের কবিতাটি 'বিরহ'। তাতে খুব হাল্‌কা হাতে একটি বিরহের ছবি আঁকা হয়েছে। প্রিয়তম দুপুরে চলে গেছে ; মধ্যাহ্নে আকাশ বাতাসের যে উদাস ভাব তার মধ্যে প্রেমিকা বসে আছে। তার আবাঁধা চুল বাতাসে উড়ছে।

এর পরের কবিতাটি 'ক্ষণেক দেখা'। গ্রামের পথে অনেক সময় দেখা যায় গৃহস্থ-বধূ কলসী-কাঁখে যাচ্ছে, যেতে যেতে কৌতূহলবশে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পথের পথিককে সে দেখে, তার পর ঘোমটা-ঢাকা হয়েই সে চলে যায় ; পথিকও চলে যায় কিছু কৌতূহল মনে নিয়ে। এই ছবিটি খুব অল্প কথায় এই কবিতায় আঁকা হয়েছে।

এর যে রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তা বলাই বাহুল্য।

এর পরের কবিতা 'অকালে'। গ্রামের হাট ভেঙে যাচ্ছে। হাটে যারা গিয়েছিল তারা বোঝা মাথায় করে আপন আপন ঘরে ফিরে এলো। যারা ওপারের গ্রামে যাবে তারা চেঁচিয়ে নৌকো ডাকছে—তাদের সে ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এমন সময়ে একজনকে দেখা যাচ্ছে পসরা মাথায় হাটে ছুটেছে। এই ছবিটি কবি এঁকেছেন। দেরিতে-হাটে-যাওয়া লোকটিকে তিনি বলছেন :

ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে ?
সন্ধ্যা হল, ওই যে বেলা
গেল রে বয়ে।

এরও অবশ্য রূপক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

এর পরের কবিতা 'আষাঢ়'। একটি সুপরিচিত বর্ষার কবিতা এটি। বর্ষার দিনের সরসতা ও নবীনতার পোঁচ যেন লেগেছে এর উপরে :

নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে, ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,

আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,
কালিমাখা মেঘ ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্ চাহি রে।
ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

এর পরের 'দুই বোন' কবিতাটি এর পূর্বের 'ক্ষণেক দেখা' কবিতাটির অনুরূপ।

এর পরের 'নববর্ষা' কবিতাটি সুবিখ্যাত। নববর্ষার দিনে কবির মন সত্যই ময়ূরের মতো কলাপ মেলেছে। যে বর্ষার রূপ কবি চোখে দেখছেন আর প্রাচীন কাব্যে যার বর্ণনা পড়েছেন সবই তাঁকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে :

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

* * *

ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে
দোদুল দুলিছে ?
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে ?

এর পরের কবিতা 'দুর্দিন'। রজনীগন্ধার বনে ঝড় হয়ে গেছে। তাতে ফুলগুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়েছে। এমন দুর্দিনে কবির প্রিয়া এসেছেন শূন্য সাজি হাতে করে। আজ তাঁকে দেবার মতো ফুল যে কবির বাগানে নেই। কবি বলছেন ছিন্ন ফুল যা আছে তাই ধুয়ে মুছে প্রিয়াকে তিনি নিবেদন করবেন, তা দিয়ে প্রিয়ার সাজি যে ভরবে এমন সম্ভাবনা নেই—তবু তাই তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করুন।

এর রূপকটি স্পষ্ট। কবির কাব্য-জীবনে যে দুর্দিন চলেছে সে কথা কবি আরও বহুভাবে বলেছেন। কিন্তু এমন দিনে প্রিয়া এসেছেন তাঁর উপহার নিতে! তাঁর যা সাধ্য তাই তিনি নিবেদন করবেন।

'দুর্দিনে'র পরের কবিতা 'অবিনয়'। দুইটিই ১লা আষাঢ়ে লেখা। 'দুর্দিনে' কবি বলেছেন তাঁর প্রিয়া তাঁর সামনে শূন্য ফুলের সাজি নিয়ে এসেছেন অসময়ে, তাই ছিন্ন মলিন ফুল যা আছে তাই ধুয়ে তাঁকে নিবেদন করতে হচ্ছে। 'অবিনয়' কবিতায় কবি প্রিয়াকে বলছেন, এই আষাঢ়ের দিনের বিজলি-চমকে গহন মেঘে নব-কদম্বের মদির গন্ধে কবি আকুল, তাই তাঁর গানে আজ বিহ্বল তান লেগেছে। কবি তাঁর প্রিয়ার ঘন কালো কুঞ্চিত কেশেও নববর্ষার সমারোহ দেখছেন। এই আষাঢ়ের দিনে তাঁর আচরণে ও দৃষ্টিতে যে বিহ্বলতা দেখা দিয়েছে প্রিয়া যেন তাঁর সেই অবিনয় ক্ষমা করেন।—কবি বলতে চাচ্ছেন নববর্ষায় তাঁর আনন্দ উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সংযত চালচলন আজ তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

এর পরের কবিতা 'ভর্ৎসনা'। এর নায়ক নায়িকার কাছে প্রত্যাশা কিছু করে না যদিও দুর্দিনে সে পথে বেরিয়েছে। কিন্তু তাকে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার দিকে নায়িকা যেভাবে তাকিয়েছে তাতে সে তাকে চোখের চাওয়ায় নীরব তিরস্কার করেছে এই অভিযোগ নায়িকার কাছে নায়ক করছে। নায়ক বলছে তার বাঁধাঘাটের কাছে দুটি চাঁপার ছায়ায় নিজের ঘর আছে, দিবস গত হলে তাতে ধ্রুবতারার মতো প্রদীপ জ্বলে; সেখানেই সে চলেছে; কিন্তু নায়িকার এমন চোখের চাওয়ার নীরব তিরস্কারে সে দুঃখ পেয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এল। নায়িকার ছায়া ও ভূমি-আসন ত্যাগ করে সে আপন পথে চলবে। নায়িকা এখন দরজা বন্ধ করুক।

এই নায়ক কে? নায়িকাই বা কে? আমাদের মনে হয়েছে নায়ক

কবি, নায়িকা তাঁর পরিজন। পরিজন ভেবেছিলেন তাঁদের বিত্তের জন্য কবি লোলুপ। কিন্তু কবি তা নন। তাঁর নিজের আশ্রয় আছে—তাঁর কাব্য-জগৎ সেই আশ্রয়।

সাধারণ প্রেমের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ হতে পারে। নায়ক নায়িকাকে যে চায় না তা নয়, কিন্তু নায়িকার কাছে তার কোনো কাঙালপনা দেখাতে চায় না।

এর পরের 'সুখদুঃখ' কবিতাটি 'কড়ি ও কোমলে'র 'কাঙালিনী' কবিতাটির সঙ্গে তুলনীয়। এখানে কবি তাঁর বক্তব্য খুব অল্প কথায় খুব সহজভাবে বলেছেন।

মেয়েটি মহাসুখী কেননা সে তার প্রার্থিত এক পয়সার তালপাতার বাঁশি বাজাতে পারছে ; আর ছেলেটি মহাদুঃখী কেননা এক পয়সা দিয়ে সে যে দোকান থেকে রাঙা লাঠি কিনবে সেই পয়সাটি তার নেই।

এর থেকে সুখ কিসে দুঃখই বা কিসে, সেই তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ না করাই ভালো, কেননা সে তত্ত্ব জটিল। একটি সুখের ছবি আর একটি দুঃখের ছবি আমরা দেখছি এই যথেষ্ট।

এর পরের 'খেলা' কবিতাটিতে কবি বলছেন, ছেলেবেলায় নালার জলে তিনি পাতার ভেলা ভাসিয়েছিলেন, হঠাৎ বৃষ্টি আসার ফলে নালার স্রোত প্রবল হয়ে তাঁর সেই পাতার ভেলা ডুবিয়ে দিয়েছিল। তিনি সেদিন ভেবে-ছিলেন হতবিধিরই এই কাজ। তার পর বড় হবার পরে তাঁর জীবনের কাজ যত নষ্ট হয়েছে সেসব দৈবের প্রতিকূলতার ফলেই ঘটেছে এই মোটের উপর তাঁর ভাবনা দাঁড়িয়েছে। দেখছেন তিনি—তাঁর ছেলেবেলাকার মনোভাব আজো দূর হয় নি।

এর পরের 'কৃতার্থ' কবিতাটিতে কবি জীবনে কৃতার্থতার কথা ভেবেছেন। জীবনের হাটে বেচা-কেনা যখন আমাদের শেষ হয় তখনো নানা দাবি আমাদের মেটাতে হয়। প্রহরীর দাবি, পারঘাটার দাবি, দোকানির দাবি, ভিক্ষুকের দাবি, চোর-ডাকাতের দাবি, এসব মিটিয়ে যখন আমরা সর্বস্বান্ত তখন দেখি আমরা যত নিঃসম্বল ও যত অভাজনই হই না কেন, যারা আমাদের ভালোবাসে তাদের অন্তরে আমরা ঠাঁই পেয়েছি। কবি দেখছেন সংসারে এতেই জীবনের কৃতার্থতা।

এর পরের 'স্থায়ী-অস্থায়ী' কবিতায় কবি বলছেন, সংসার ও সংসারের জীবন থেকে আমরা গোলাপ তুলি, সেই গোলাপের সঙ্গে কাঁটাও থাকে, গোলাপ স্থায়ী হয় না কিন্তু কাঁটার ব্যথা আমাদের বুকে থেকেই যায়। আমাদের জীবন যখন শেষ হয়ে আসে তখনো আমরা দেখি সংসার অনেক ফুল অনেক গন্ধ অনেক কোমলতা নিয়ে হাজির, কিন্তু সেসব সংগ্রহ করবার তখন আর আমাদের সময় নেই, আমরা বুকে ব্যথা নিয়েই সংসার থেকে বিদায় হই।

রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনে এই কাঁটা ও ব্যথাও অবশ্য নিরর্থক নয়।

এর পরের 'উদাসীন' কবিতাটি বিখ্যাত। কবি বলছেন, এতদিন তাঁর জীবন কেটেছে বিচিত্র কামনার তরঙ্গে আন্দোলিত হয়ে; কিন্তু আজ সে অবস্থা তাঁর নয়, আজ তিনি উদাসীন—

উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।
হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি
ছুটি নে কাহারো পিছুতে,
মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই কিছুতে।

তাঁর পক্ষে যা পাওয়া সম্ভব তা আজ তিনি খুশীমনে গ্রহণ করেন, কিন্তু কাড়াকাড়ি করেন না কিছুর জন্যই।

এতদিন কামনার তরঙ্গে তিনি কিভাবে আন্দোলিত হয়েছেন সে সম্বন্ধে তাঁর বর্ণনাটি অপূর্ব—

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।
আঘাত করিয়া ফিরেছি দুয়ারে দুয়ারে,
সাধিয়া মরেছি ইহারে তাঁহারে উহারে,
অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙিয়াছি তাহা হৃদয়-শোণিত-বরনে।
মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে,
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে।

আজ যে প্রবল চাওয়ার কবল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন, তার ফলে জগতের চারদিকের শোভা-সৌন্দর্য আজ তিনি শান্ত মনে তাকিয়ে দেখতে পারছেন। আগে যখন কামনার প্রবলতা তাঁর মধ্যে ছিল তখন এমন করে দেখবার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিল না—

বকুল কেবল দলিত করেছি আলসে,
ছিলাম যখন নিলীন বকুল-শয়নে।
কত ফুল নিয়ে আসে বসন্ত
আগে পড়িত না নয়নে,—
তখন কেবল ব্যস্ত ছিলাম চয়নে।

তিনি আরও দেখছেন তিনি যে আজ কিছুই প্রবলভাবে কামনা করছেন না, সবাই আপন বৃন্তে ফুটুক এই আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁর, এর ফলে ত্রিভুবন আজ তাঁর পিছনে ফিরছে—

সবলে কারেও ধরি নে বাসনা-মুঠিতে,
দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে ;
যখনি ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা
হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।
দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি
মন নাহি মোর কিছুতে,
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে।

গীতায় যাকে নিষ্কাম ভাব বলা হয়েছে কতকটা সেই ভাব এই কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। বাসনার আবেগ যখন মন্দীভূত হয় আর মন শান্ত হয় তখন এরকম অবস্থা ঘটে। সেই অবস্থার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা এই কবিতাটি।

'যৌবন-বিদায়' কবিতাটিতে কবি চল্লিশের ঘাট থেকে তাঁর যৌবন-তরীকে বিদায় দিচ্ছেন। বিদায় দেওয়ার কালে স্মরণ করছেন এই তরীতে চড়ে কত ঢেউয়ের টলমলানি, কত স্রোতের টান তিনি সহ্য করেছেন, কত শ্রাবণ-দিনে ভরা গাঙে দুকূল-হারা পাড়ি জমিয়েছেন।

বিদায় দেওয়ার কালে সেই তরীকে আরো তিনি জিজ্ঞাসা করছেন—

ভেবেছিলেম ঘাটে ঘাটে
করতে আনাগোনা

এমন চরণ পড়বে নায়ে
নৌকো হবে সোনা।
এতবারের পারাপারে—
এত লোকের ভিড়ে
সোনা-করা দুটি চরণ
দেয় নি পরশ কি রে ?

উপসংহারে কবি বলছেন :

যদি চরণ পড়ে থাকে
কোনো একটি বারে—
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে
সোনার মৃত্যু পারে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী' শীর্ষক চরণগুলো স্মরণীয়।

সুন্দরের বা মনোহরের চরণ-স্পর্শ যে কবির যৌবন-তরণীতে কখনো কখনো ঘটেছে তাই-ই কবির যৌবনের বিদায়কালীন পাথেয়।

'শেষ হিসাব' কবিতাটিতে কবি বলছেন, জীবন শেষ হয়ে এলো, সেই জীবনের হিসাব মিলাবার সাধ্য যে তাঁর নেই তা যথার্থ। এখন আঁধার তাঁকে ডাকছে—এই কালে মিটমিটে দীপের আলোর মায়া ত্যাগ করে চক্ষু মুদে একলা থাকাই তাঁর জন্য ভালো :

জানাজানির সময় গেছে
বোঝাপড়া কর্ রে বন্ধ।
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক রে হয়ে বধির অন্ধ।

হ'ক রে তিক্ত মধুর কণ্ঠ,
হ'ক রে রিক্ত কল্পলতা।
তোমার থাকুক পরিপূর্ণ
একলা থাকার সার্থকতা।

'শেষ' কবিতাটিতে কবি বলছেন, কিছুই যে থাকবে না, আমরা কেউ থাকব না এটি দুঃখের কথা নয় আনন্দের কথা, কারণ :

অধিক দিন তো বইতে হয় না
শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি
গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে,—
যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে
দুঃখ কিসের তরে?

এই পরিবর্তন-স্রোত জগতে কেমন দ্রুত বইছে তার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা কবি দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে কবি তাঁর এই অন্তরতম প্রার্থনাটি জানিয়েছেন :

আজ তোমাদের যেমন জানছি
তেমনি জানতে জানতে,
ফুরায় যেন সকল জানা
যাই জীবনের প্রান্তে।
এই যে নেশা লাগল চোখে
এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার
বাকি না রয় মোটে।
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্ত্যে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।

কবি সহজ আনন্দকে দেখছেন, জানছেন, তাই পরিবর্তন, মৃত্যু, ধ্বংস, এসব তাঁকে ভয় দেখাতে পারে না।

'বিলম্বিত' কবিতায় কবি বলছেন, তিনি কাব্য-সাধনা শুরু করেছিলেন বহুদিন আগে—তখন ছিল বসন্তকাল, তাঁর বেশবাসে তাঁর রচনায় সেই কালেরই

ছায়া পড়েছিল। তারপর কাব্যসাধনায় তাঁর বহুকাল কেটেছে; সেই 'দখিন হাওয়া'র কাল গত হয়ে আজ 'পুবে হাওয়া'র কাল এসেছে; কিন্তু তাঁর মধ্যে আজও রয়েছে সেই 'দখিন হাওয়া'র কালের রকম-সকম—

হল কালের ভুল,
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম
দখিন হাওয়ার ফুল।

কবি নিজেকে বলছেন আর দেরি না করে নতুন যুগের জন্য তৈরি হতে—তাঁর গানে নতুন কালের সুর ধ্বনিত করতে :

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা,
এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা।
বাজছে মেঘের গুরু গুরু
বাদল ঝর ঝর,
সজল বায়ে কদম্ববন
কাঁপছে থর থর।

'মেঘমুক্ত' কবিতাটিতে কবি মেঘমুক্ত দিনের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন :

মেঘ ছুটে গেল নাই গো বাদল,
আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল
বহিছে বায়।
পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা
শৈবাল 'পরে মেলে আছে পাখা,
জলের কিনারে বসে আছে বক
গাছের ছায়।
আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল
আয় গো আয়।

এর পরের 'চিরায়মানা' কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীকে বলছেন সাজ-সজ্জার জন্য দেরি না করে প্রসন্ন মনে সহজ বেশে তাঁর সামনে আসতে :

এস হেসে সহজ বেশে
আর ক'রো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা,
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ।
মেঘে মগন পূর্ব-গগন,
বেলা নাই রে আজ।
এস হেসে সহজ বেশে
নাই বা হল সাজ।

প্রভাতবাবু বলেছেন 'ক্ষণিকা'র ছাপার কাজ খুব ধীরভাবে চলেছিল, হয়তো তারই ইঙ্গিত রয়েছে এই কবিতাটিতে। তাঁর অনুমানটি খুশী হবার মতো। কবির প্রায় সব রচনা ব্যঞ্জনায় অপূর্বভাবে সমৃদ্ধ।

এর পরের কবিতাটি বিখ্যাত 'আবির্ভাব'।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিরূপে খ্যাত। তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে অন্য ঋতু তাঁর প্রিয় নয়; তবে বর্ষায় তাঁর আনন্দ যে সব চাইতে বেশি তাতে সন্দেহ নেই। এই 'আবির্ভাব' কবিতাটিকে বলা যায় কবির একটি শ্রেষ্ঠ বর্ষা-বন্দনা।

যে সুন্দর তাঁর পরম প্রিয় তাকে বসন্তদিনেও তিনি দেখেছেন—

সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল।

কিন্তু বর্ষার দিনেই তার পরিপূর্ণ মহিমা তিনি উপলব্ধি করছেন:

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;

চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

এই একটি স্তবকে নববর্ষার এক অপূর্ব রূপ ব্যক্ত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাতে কবির আনন্দ-তন্ময়তাও ব্যক্ত হয়েছে।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি নিজে বলেছেন :

কাব্যের একটা বিভাগ আছে যা গানের সহজাতীয়। সেখানে ভাষা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ জ্ঞাপন করে না, একটা মায়া রচনা করে, যে-মায়া ফাল্গুন মাসের দক্ষিণ হাওয়ায়, যে-মায়া শরৎ ঋতুতে সূর্যাস্তকালের মেঘপুঞ্জে। মনকে রাঙিয়ে তোলে; এমন কোনো কথা বলে না যাকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

ক্ষণিকার আবির্ভাব কবিতায় একটা কোনো অন্তর্গূঢ় মানে থাকতে পারে; কিন্তু সেটা গৌণ, সমগ্র ভাবে কবিতাটার একটা স্বরূপ আছে; সেটা যদি মনোহর হয়ে থাকে তাহলে আর কিছু বলবার নেই।

তবু আবির্ভাব কবিতায় কেবল সুর নয়, একটা কোনো কথা বলা হয়েছে; সেটা হচ্ছে এই যে—এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুন মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণগন্ধগান নিয়ে; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল; তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রঙের আকাশে ঘনিয়ে এল বর্ষার সজল শ্যামল সমারোহ—জীবনে বাণীর বদল হল, বীণায় আর-এক সুর বাঁধতে হবে; সেদিন যাকে দেখেছিলুম এক বেশে এক ভাবে, আজ তাকে দেখছি আর-এক মূর্তিতে; খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই অভ্যর্থনার নূতন আয়োজন। জীবনের ঋতুতে ঋতুতে যার নূতন প্রকাশ, সে এক হলেও তার জন্যে একই আসন মানায় না।

এই কবিতাটির সপ্তম স্তবকে এই চরণটি আছে—'এই বেতসের বাঁশিতে

পড়ুক'। এর পূর্ব পাঠ ছিল—'বনবেতসের বাঁশিতে পড়ুক'। বেতসের অর্থ বেত, আর বেত নিরেট, তা দিয়ে বাঁশি হয় না। চারুবাবু এই দিকে কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তার উত্তরে কবি লিখেছিলেন :

> কোনো ভালো অভিধান দেখ তো, বেতস বলতে বাঁশও হয় এমন সাক্ষ্য পেয়েছি। কবিতা যখন লিখেছিলেম তখন খাগ্‌ড়ার কথা ভেবেছি—শরেতে যে ভদ্ররকম বাঁশি হয় তা নয়, কিন্তু ওর মর্মস্থানের ফাঁকটুকুতে নিশ্বাস সঞ্চার ক'রে সুর বের করা যায় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু যখন দেখা গেল বেতস বলতে শর বোঝায় না এবং অর্থমালার সর্বপ্রান্তে বেণু কথাটা পাওয়া গেল তখন বাগর্থের দ্বন্দ্ব মিটল দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। তুমি কোন্ কৃপণ অভিধানের দোহাই দিয়ে আবার ঝগড়া তুলতে চাও!

কিন্তু বেতসের অর্থ বেণু বা বাঁশ না হলেও, ঐ শব্দটির এই নতুন অর্থ স্বচ্ছন্দে গৃহীত হতে পারে, কেননা রবীন্দ্রনাথের মতো কবি শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বেত দিয়ে বাঁশি না হলেও বেতের পাতলা পাতা দিয়ে গ্রামের ছোট ছেলেমেয়েদের বাঁশি তৈরি করে বাজাতে যেন দেখেছি। এই যদি সত্য হয় তবে 'বনবেতসের' পাঠটিই বেশি ভালো।

এর পরের কবিতা 'কল্যাণী'। এটিও বিখ্যাত। 'উর্বশী'তে কবি নারীর মোহিনী মূর্তির স্তব গেয়েছেন। এই 'কল্যাণী' কবিতাটিতে তিনি গেয়েছেন গৃহস্থবধূ-রূপে নারীর কল্যাণী মূর্তির স্তব। কবির দৃষ্টিতে কল্যাণীর স্থান রূপসী ও বিদুষীদের উপরে। কল্যাণীকে জরা স্পর্শ করতে পারে না, তার শ্রী অবিচল—সে চিরশান্তিদায়িনী :

> তোমার নাহি শীতবসন্ত,
>   জরা কি যৌবন।
> সর্বঋতু সর্বকালে
>   তোমার সিংহাসন।
> নিবে নাকো প্রদীপ তব,
> পুষ্প তোমার নিত্য নব,
> অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
>   চির বিরাজ করে।

সর্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে।
... ...

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর-সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে।

'ক্ষণিকা'র শেষ দুইটি কবিতা হচ্ছে 'অন্তরতম' ও 'সমাপ্তি'। অন্তরতম থেকে কিছু অংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি।

'ক্ষণিকা'র যে চটুল ও চপল ভঙ্গি তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে এই দুটি কবিতায়। 'ক্ষণিকা'র অব্যবহিত পরের 'নৈবেদ্যে'র ভগবৎ-চেতনার ও ভগবৎ-নির্ভরতার সুর এই দুটিতে বাজছে। 'সমাপ্তি'র শেষ দুই স্তবক আমরা উদ্ধৃত করছি :

কখন যে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হল যে কবে,
পিছনে চাহিয়া দেখিনু, কখন
চলিয়া গিয়াছে সবে।
তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।
কখন যে পথ আপনি ফুরাল
সন্ধ্যা হল যে কবে।

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা ?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।
নয়নে আমার অশ্রুজলের
চিহ্ন কি যায় দেখা ?

'ক্ষণিকা' চন্দ্রনাথ বসুকে বিশেষ আনন্দদান করেছিল—কবির কাছে লেখা একখানি চিঠিতে তাঁর সেই আনন্দ তিনি ব্যক্ত করেন। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু মতবিরোধের কথা আমরা জেনেছি; কিন্তু সমস্ত মত-বিরোধ সত্ত্বেও কবির প্রতিভার প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁর সেই চিঠিখানি আমরা রবীন্দ্রজীবনী থেকে উদ্ধৃত করছি :

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। কণিকা কথা ও কল্পনা ক্ষণিকা—বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন?…যে চারিখানার নাম করিলাম সবগুলিই মিষ্ট হৃদয়স্পর্শী সুগভীর সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ। কিন্তু ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি—পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে—মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোনো কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। প্রকৃতির প্রাণের সৌরভ পল্লীতেই পাওয়া যায়। কোন্‌টার কথা বলিব? অনেকগুলাতে এই সৌরভ পাইয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন, 'বিরহে'র সৌরভে বড়ই মজিয়াছি। তুমি যে উহা প্রত্যক্ষবৎ করিয়া দিয়াছ।…তোমার প্রতিভার পরিমাণ হয় না।

'ক্ষণিকা'র ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কবি পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন :

ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রাকৃত বাংলা ভাষা ও প্রাকৃত বাংলা ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি বেগ ও সৌন্দর্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা পাড়াগেঁয়ে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেবলমাত্র গ্রাম্য ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহন-শক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশি।

'ক্ষণিকা'র ভাষা ও ছন্দের প্রভাব একালের বাংলা কাব্যে খুব লক্ষণীয় হয়েছে।

কবি 'ক্ষণিকা'র উৎসর্গ-পত্রে তাঁর বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন—তাঁর এই কাব্যের অন্তত কতকটা কি বন্ধুর সিগারেটের মতো ক্ষণে ক্ষণে অগ্নিকণায় দীপ্তি পাবে?—এই প্রশ্নে ব্যক্ত হয়েছে এই কাব্যের বিশিষ্ট রূপটি—বিচিত্র চিন্তা এতে অগ্নিকণার তীক্ষ্ণ ঔজ্জ্বল্য নিয়েই ফুটে উঠেছে। বাণীর এমন উজ্জ্বল লীলা তাঁর আর কোনো কাব্যে ব্যক্ত হয় নি। (গদ্যে এই ধরনের ঔজ্জ্বল্য পাই তাঁর শেষ বয়সের 'শেষের কবিতা'য়।) ইংরেজি সাহিত্যে এমন ঔজ্জ্বল্য আমরা কিছু পরিমাণে পাই Donne ও বার্নস্-এর কবিতায়। সুফী কবি হাফিজের রচনায় এমন ঔজ্জ্বল্য যে সুপ্রচুর তা আমরা বলতে চেষ্টা করেছি।

'ক্ষণিকা'কে আমরা এক সময়ে বলেছিলাম গীতিকবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। এর অসাধারণ মূল্য সম্বন্ধে আমরা আজও নিঃসন্দেহ। কিন্তু গীতিকবিতা হিসাবে একে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলা যায় কিনা সে সম্বন্ধে আরও ভাববার আছে।

নৈবেদ্য

'ক্ষণিকা' প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালের শ্রাবণে। এর পর অগ্রহায়ণ থেকে 'নৈবেদ্য' রচনা শুরু হয়, আর সেই বৎসরেই, বোধ হয় ফাল্গুনের মধ্যে, এর একশটি কবিতা দাঁড়িয়ে যায়। 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালের আষাঢ়ে।

'ক্ষণিকা'র শেষ কবিতাটিতে কবি লিখেছিলেন :

পথে যতদিন ছিনু, ততদিন
অনেকের সনে দেখা।

সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

একা 'সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বরে'র, পরম দয়িতের সম্মুখীন হওয়া বলতে যা বোঝায় কবির সেই চেতনা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে। সেই নিবিড় ভগবৎ-চেতনা ব্যক্ত হয়েছে 'নৈবেদ্যে'র পরবর্তী 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমালা' ও 'গীতালি' কাব্যেও ; তবে 'নৈবেদ্য' ও তার পরবর্তী এই কাব্যগুলোর মধ্যে একটি লক্ষণীয় পার্থক্যও আছে। এই শেষোক্ত কাব্যগুলোর ভাব মোটের উপর ভক্তির আকুলতার ভাব ; কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র মুখ্য ভাব যোগ-যুক্তের ভাব। (এসবের বিস্তৃত পরিচয় পরে পরে স্বতঃই পাওয়া যাবে।) ভগবানের সঙ্গে এই নিবিড় যোগ উপলব্ধির পথেই এতদিন ধরে, কতকটা অজ্ঞাতসারে, কবি চলেছিলেন। তাঁর সেই বিচিত্র ভঙ্গির, বিচিত্র দুঃখযাতনাময়, চলার অবসান আজ যেন হয়েছে। পরমমহিমময় পরমমোহন পরমকাঙ্ক্ষিত ভগবানের সঙ্গে এই যে এক অন্তরঙ্গ যোগ কবি অনুভব করতে পেরেছেন সেই গূঢ় উপলব্ধির দ্বারা এই কাব্যে রঞ্জিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর জীবনবোধ, বিশ্ববোধ, স্বদেশবোধ—সব কিছুই।

কবির চিত্তের উদ্দীপ্ততম মুহূর্তের স্বাক্ষর বোধ হয় তাঁর 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলোর মধ্যেই বেশি পাওয়া যায়।

'নৈবেদ্যে'র এই দুর্লভ মূল্যটি দুর্ভাগ্যক্রমে প্রভাতবাবুর দৃষ্টি অনেকখানি এড়িয়ে গেছে। তিনি এতে আদি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের বিশেষ প্রভাব দেখেছেন। কোনো কবির যা-সব মতবিশ্বাস, সেসব নিয়েই তিনি—সেসব বাদ দিয়ে তিনি কখনো নন। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মুহূর্তে সেসব আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হয়—রূপান্তরিত হয়ে সার্থক হয় ; কতকটা যেমন আগুনের মধ্যে পড়ে কয়লা রূপান্তরিত ও সার্থক হয়।

'নৈবেদ্যে'র একশত কবিতার অনেকগুলোই সনেট, কেবল এর প্রথম একুশটি ও শেষ কবিতাটি সনেট নয়।

গ্রন্থ-পরিচয়ে বলা হয়েছে :

নৈবেদ্যের অনেকগুলো কবিতা গানরূপে ব্যবহৃত হইবার সময় সেগুলোর অনেক পাঠ পরিবর্তন হইয়াছে।

'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলো যখন রচিত হচ্ছিল সেই সময়ে চলেছিল কবির

'চিরকুমারসভা'র মতো হাস্যকৌতুকপূর্ণ রচনা আর 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র মতো জটিলমনস্তত্ত্বপূর্ণ রচনাও। এর উপর বিলাতে আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখবার জন্য বড়রকমের অর্থসংগ্রহের কাজেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু এই সব চিন্তা ও কর্মের ঘূর্ণাবর্ত যেন অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে পরম শান্তমনে তিনি অন্তরের নৈবেদ্য নিবেদন করতে পেরেছেন তাঁর পরম দেবতাকে। এই কবিতাগুলো সম্বন্ধে তিনি তাঁর সুহৃদুত্তম আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন :

> ……নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মতো দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভালো হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন—আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোক-নিন্দার কোন দাবিই রাখি না।

কবির ভগবৎ-চেতনার অসাধারণ ঐকান্তিকতারই পরিচয় রয়েছে তাঁর এই উক্তিতে।

বলা যেতে পারে উপনিষদের ও গীতার প্রাচীন ব্রহ্মচেতনার ও ব্রহ্ম-নিষ্ঠার আদর্শ কবির এই 'নৈবেদ্য' কাব্যে নতুন প্রাণ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে কবির শ্রেষ্ঠ গুরু হচ্ছেন তাঁর পিতৃদেব, আর মহাত্মা রামমোহন। বইখানি কবি উৎসর্গ করেন তাঁর 'পরমপূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে'।

এর প্রথম কবিতাটিতে অতি নিরাভরণ ভাষায় পরম ঐকান্তিকতার সঙ্গে কবি বলেছেন :

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
    দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে,
করি জোড়কর হে ভুবনেশ্বর
    দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
    বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
    দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্মপারাবার-পারে হে,
নিখিল-জগত-জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

জীবন, বিশ্বজগৎ, প্রতিদিনের জীবনযাপন, এসব সম্বন্ধে অসাধারণ দায়িত্ববোধ ব্যক্ত হয়েছে এই সহজ সরল কথাগুলোর মধ্যে। এমন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের, অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের সর্বময় প্রভুর, সম্মুখীন হবার চেতনা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হিব্রু ঐতিহ্যের ঋষিদের মধ্যে। কোরানের প্রবল একেশ্বরবাদ এবং বাইবেলের Do unto others as you like to be done by-শিক্ষা ব্রাহ্মসমাজের মনীষীদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উপনিষদ ও গীতার চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের জীবনে সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক, বিশেষ করে হিব্রু ঐতিহ্যের প্রভাব যখন ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে লক্ষণীয়।

কিন্তু কত বিচিত্র প্রভাব কবির জীবনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল সেটি তেমন বড় কথা নয়, তার চাইতে অনেক বড় কথা—তাঁর উপলব্ধি সার্থক রূপ কতটা নিতে পেরেছিল। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে যে জাগ্রত ভগবানের বোধ নানাভাবে আমরা পাচ্ছি সেইটি একটি মহামূল্য ভাব-সম্পদ। বলা বাহুল্য জাগ্রত ভগবানের বোধ পূর্ণজাগ্রত মানব-চেতনারই একটি রূপ—অন্তত সেভাবে ভিন্ন তাকে বোঝা কঠিন। পরে পরে, বিশেষ করে কবির 'মানুষের ধর্মে'র আলোচনাকালে, এই প্রসঙ্গ আসবে।

কবি জাগ্রত ভগবানের কাছে জীবনের জন্য যে-সব শ্রেষ্ঠ সম্পদ সূচনার কবিতাগুলোর ভিতরে প্রার্থনা করেছেন সেসবের দিকে তাকানো যাক :

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।

সব দুখশোক সার্থক হ'ক
লভিয়া তোমারি আলো।

পরশমণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে নিক পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।

*   *   *

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

*   *   *

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।
নিশ্বাসে মোর নিমেষের পাতে,
চেতনা বেদনা ভাবনা আঘাতে,
কে দেয় সর্বশরীরে ও মনে
তব সংবাদ আনি।
না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।

*   *   *

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক,
তারা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।

সবার সহিতে তোমার বাঁধন
হেরি যেন সদা এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গে পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে।

* * *

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস,
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।
বাক্যের ঝড়, তর্কের ধূলি,
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে
নাহি তার কোনো ত্রাস।

* * *

অমল কমল সহজে জলের কোলে
আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরিতে না হয় আলয় কোথায় ব'লে
ধুলায় ধুলায় লুটিয়া।

... ...

কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু,
শুধাব না কোনো পথিকে।
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু
যখন ফিরিব যেদিকে।

এসবের সর্বত্রই আমরা পাচ্ছি প্রবল ও তীক্ষ্ণ ভগবৎ-চেতনা—ভগবানই কবির জীবনের একমাত্র সত্য না হলেও প্রধানতম সত্য এই ধরনের বোধ। শেষের লাইনগুলোয় দেখা যাচ্ছে, কবি আর ভগবানকে খুঁজবার কথা ভাবছেন না—তিনি অনুভব করছেন তিনি ভগবানের দ্বারা পরিবৃত। কবির জন্য পরম অর্থপূর্ণ পরম আনন্দকর হয়েছে এই চেতনা।

অবশ্য এসব তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্তের পরিচয়। সেই শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত তাঁর জন্য আর ক্ষণস্থায়ী নয়; কিন্তু তাই বলে চিরস্থায়ী, অক্ষয়, অব্যয়,—এমনও নয়। সে কথাও তিনি বলেছেন। ভগবানকে যতটা তিনি লাভ করেছেন তাতে বুঝেছেন তাঁকে অন্তরে লাভ করলে সব ভয় সব সংশয় সব ক্ষুদ্রতা-বোধ দূর হয়ে যায়—আমরা যে 'অনীশ্বর অরাজক ভয়ার্ত জগতে' আছি এই পরমদুঃখকর বোধের কবল থেকে মুক্তিলাভ হয়। এ এক মহা লাভ। এমন কথা প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্‌রাও বলেছেন। শিব কালী প্রভৃতি দেবতার সাধকরাও বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কবির কিছু পার্থক্য এই যে কবি নিজের ভিতরকার এই প্রত্যয়ের অসাধারণ শক্তিই অনুভব করছেন না, তাঁর চারপাশের লোকেরা যে এই মহা অর্থপূর্ণ প্রত্যয় থেকে বঞ্চিত, আর দারুণ দুঃখের সেই বঞ্চনা, সে-বিষয়েও তিনি অসাধারণ ভাবে সচেতন :

> আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
> সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
> সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়,
> পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
> অনন্ত অমৃতবার্তা।

'নৈবেদ্যে' কবি যে একই সঙ্গে অনুভব করেছেন ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার পরম শক্তি আর সেই যোগের অভাবে তাঁর সমসাময়িক কালের স্বদেশের ও বিদেশের লোকদের জীবনের বিচিত্র দুঃখ ও দুর্গতি, এ থেকেই কাব্য হিসাবে 'নৈবেদ্যে'র লাভ হয়েছে এক অসাধারণ মূল্য। 'নৈবেদ্য' যেমন গভীরভাবে ভগবন্মুখী, তেমনি গভীরভাবে জীবন-জিজ্ঞাসু।

তাছাড়া 'নৈবেদ্যে'ই কবিকে আমরা প্রথম দেখতে পাচ্ছি, শুধু বাংলার বা ভারতের কবি তিনি নন, জগতেরও কবি তিনি হয়েছেন। এই সমুন্নতি তাঁর লাভ হয়েছে সকল ঈশ্বরের যিনি পরম ঈশ্বর তাঁর সম্বন্ধে পরম-উদ্দীপ্ত চেতনা থেকে। অনুভূতির গভীরতা চিরদিনই নব সৃষ্টির সহায় হয়—সাহিত্য-ক্ষেত্রে তো বটেই।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব, অর্থাৎ এক জ্ঞানময় কল্যাণময় শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে বিশ্বজগৎ এই ধারণার সত্যতা, যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণ করা কঠিন—হয়ত

প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু সেই অস্তিত্বে অকপট বিশ্বাস যে বিশ্বাসীর জীবনকে আশ্চর্যভাবে সবল ও সমৃদ্ধ করে তা অনেক সময়ে দেখা গেছে।

ভগবৎ-বিশ্বাস ও ভগবৎ-নির্ভরতা যে মূলত এক মরমী ব্যাপার সে কথা কবিও বলেছেন, যেমন—

আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়
বিশ্ব করিছে গ্রাস
তারি মাঝখানে সংশয়াতীত
প্রত্যয় করে বাস।

কিন্তু এই 'নৈবেদ্যে'ও সেই গূঢ় চেতনা রয়েছে নিচে, কবি ভগবানকে বেশি করে দেখেছেন বিচিত্র মানব-সম্বন্ধের ভিতরে, মানবিক গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ প্রতীক রূপে। ভগবানের এই মানবিকতা পরে কবির চিন্তায় আরও প্রবল হয়।

ভগবানের মরমী বোধ, আর মানবিক বোধ, দুয়েরই অসাধারণ পরিচয় আমরা 'নৈবেদ্যে'র অনেক সনেটে পাব।

এর ২০ সংখ্যক প্রার্থনাটি কর্মক্ষেত্রের একটি শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা :

তোমার পতাকা যারে দাও, তারে
বহিবারে দাও শকতি।

কিন্তু সেই শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন কর্মোদ্যমের শক্তি কবি লাভ করেছেন মরমী চেতনা থেকে :

বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে
মুক্ত রাখিয়ো তোমা পানে মোরে,
ধুলায় রাখিয়ো, পবিত্র ক'রে
তোমার চরণধূলিতে।
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে,
তোমারে দিও না ভুলিতে।

'নৈবেদ্যে'র সূচনার প্রার্থনাগুলির ভিতরে মরমী সুর, অর্থাৎ একান্ত ভগবৎ-বোধের সুর, কিছু বেশি লেগেছে। কিন্তু এর ২৫ সংখ্যক কবিতা থেকে—সেটি 'নৈবেদ্যে'র চতুর্থ সনেট—কবির ভিতরে এক নতুন প্রবল কাব্য-প্রেরণা দেখা দিয়েছে ; ফলে এখন থেকে তাঁর বাণী অপূর্ব বৈভবময় হয়ে উঠেছে :

আবার আমার হাতে বীণা দাও তুলি,
আবার আসুক ফিরে হারা গানগুলি।
সহসা কঠিন শীতে মানসের জলে
পদ্মবন মরে যায়, হংস দলে দলে,
সারি বেঁধে উড়ে যায় সুদূর দক্ষিণে
জনহীন কাশফুল্ল নদীর পুলিনে :
আবার বসন্তে তারা ফিরে আসে যথা
বহি লয়ে আনন্দের কলমুখরতা,—
তেমনি আমার যত উড়ে-যাওয়া গান
আবার আসুক ফিরে, মৌন এ পরান
ভরি উতরোলে ; তারা শুনাক এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা,
সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব বারতা।

এর পরের দুইটি সনেটে কবি অনন্তকে বা অনন্তরূপ ভগবানকে প্রবলভাবে অনুভব করছেন শুধু তাঁর অন্তরাত্মায় নয়, তাঁর দেহের শিরায় শিরায়, অণুতে অণুতেও। এমন বোধের কথা কবি ছিন্নপত্রাবলীতেও বলেছেন। প্রবল অনুভূতি শুধু মনের উপরে নয়, দেহের উপরেও ক্রিয়াশীল হয়।

এর ৩০ সংখ্যক ('বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' শীর্ষক) সনেটটি খুব বিখ্যাত। আমাদের দেশে ভগবৎ-সাধনার যা প্রচলিত ধারা তার বিপরীত কথা কবি এতে বলেছেন, কেননা আমাদের দেশে সাধারণত প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, এসবকে সত্য-উপলব্ধির পথে বিভ্রান্তিকর জ্ঞান করা হয়। তবে তান্ত্রিক সাধনায় প্রকৃতিকে সহায় জ্ঞান করা হয়েছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনা তান্ত্রিক সাধনা নয়। মানবিকতা বলতে যা বোঝায় তাঁর সাধনা প্রধানত তাই। প্রিয়জনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি প্রেম ও প্রীতি তাঁর জন্য অশেষ অর্থপূর্ণ। প্রকৃতি এবং মানুষ উভয়ের সঙ্গে প্রেমের নিবিড় যোগ তাঁর অন্তরে অনন্ত সম্বন্ধে অপূর্ব সচেতনতা, ভগবানের মরমী বোধ, এসব এনে দিয়েছে। প্রকৃতিনির্ভর জীবন রবীন্দ্রনাথ মানুষের যত বড় সহায় জ্ঞান করেছেন আমাদের দেশে সাধারণত তা জ্ঞান করা হয় না।

এই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'-শীর্ষক সনেটের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যায় ৩২ সংখ্যক সনেটটি। তাতে কবি বলেছেন, তিনি যে তাঁর হৃদয়-মনের সব দ্বার খুলে রেখেছিলেন তার ফলে—

চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।

আর—

সেই পথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।

যা-কিছু ঘটছে সব অর্থপূর্ণ জ্ঞান করা হয় বিজ্ঞানে। পারমার্থিক চিন্তায় কাম্য অকাম্য ভালো মন্দ এসবের বিচার করা হয়।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার আর পারমার্থিক চিন্তার এক নতুন যোগ রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেখা যাচ্ছে। একালে অবশ্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাই বেশি মর্যাদা লাভ করেছে।—কিন্তু কবির চিন্তায় ভগবৎ-বোধ বা ভূমার বোধ শুধু অনন্তের রহস্যময় বোধ নয়, নৈতিক দায়িত্ব-বোধ বলতে যা বোঝায় তাও। এর পরেই তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হবে।

এর ৩৩ সংখ্যক সনেটে কবি গভীর আনন্দ লাভ করেছেন এইটি লক্ষ্য করে যে তাঁর জীবনের যেসব ক্ষণিক সুখদুঃখের তুচ্ছ মুহূর্ত সেসবের উপরেও কেমন করে অসীমের চরণ-চিহ্ন পড়েছে—

খেলামাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসংগীত সাথে চন্দ্রসূর্যমাঝে।

এইকালে ভগবানের সঙ্গে কবির যোগ যে কত নিবিড় কত একান্ত হয়েছিল ৩৫ সংখ্যক সনেটটিতে তা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

কালি হাস্যে পরিহাসে গানে আলোচনে
অর্ধরাত্রি কেটে গেল বন্ধুজন সনে ;
আনন্দের নিদ্রাহারা শ্রান্তি বহে লয়ে
ফিরি আসিলাম যবে নিভৃত আলয়ে

দাঁড়াইনু আঁধার অঙ্গনে। শীতবায়
বুলাল স্নেহের হস্ত তপ্ত ক্লান্ত গায়
মুহূর্তে চঞ্চল রক্তে শান্তি আনি দিয়া।
মুহূর্তেই মৌন হল স্তব্ধ হল হিয়া
নির্বাণ-প্রদীপ রিক্ত নাট্যশালা সম।
চাহিয়া দেখিনু ঊর্ধ্বপানে, চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়াল নক্ষত্রলোকে।
হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

এই প্রশান্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নয়, কিন্তু তা না হলেও অমূল্য।

৩৭ সংখ্যক সনেটে ঈশ্বর সম্বন্ধে কবির মরমী চেতনা খুব প্রবল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে :

মহারাজ, ক্ষণেক দর্শন দিতে হবে
তোমার নির্জন ধামে। সেথা ডেকে লবে
সমস্ত আলোক হতে তোমার আলোতে
আমারে একাকী,—সর্ব সুখদুঃখ হতে,
সর্ব সঙ্গ হতে, সমস্ত এ বসুধার
কর্মবন্ধ হতে।

কিন্তু তার পরে ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবিক বোধই বেশি প্রবল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

কবি যে দীর্ঘকাল ঈশ্বর সম্বন্ধে অচেতন ছিলেন তিনি আজ দেখছেন তাতে ক্ষতি কিছু হয় নি, বরং বহুদিন ধরে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে এসে তাঁর চিত্ত যে শেষে ভগবন্মুখী হয়েছে এতে তিনি কৃতার্থ বোধ করছেন :

আমি অন্য মনে
সঘনপল্লবপুঞ্জ ছায়াকুঞ্জবনে
ছিনু শুয়ে তৃণাস্তীর্ণ তরঙ্গিণী-তীরে
বিহঙ্গের কলগীতে সুমন্দ সমীরে।

আমি যাই নাই দেব তোমার পূজায়,
চেয়ে দেখি নাই পথে কারা চলে যায়।
আজ ভাবি ভালো হয়েছিল মোর ভুল,—
তখন কুসুমগুলি আছিল মুকুল,—
হেরো তারা সারাদিনে ফুটিতেছে আজি।
অপরাহ্ণে ভরিলাম এ পূজার সাজি।

আজ কবি প্রকৃতির সর্বত্র ভগবানের জলন্ত স্বাক্ষর দেখছেন :

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখনি দেখেছি আজি, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত, শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত, সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত, শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে উর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

উপনিষদের বাণী নতুন চিত্তগ্রাহী রূপ পেয়েছে কবির বাণীতে। বলা বাহুল্য এ বোধ শুধু সৌন্দর্য-বোধ নয়—মরমীও।

ভগবৎ-চেতনা বা ভগবৎ-প্রেম সম্পর্কে কবি নিজের বিশিষ্ট চিন্তা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন এর পরের কয়েকটি সনেটে। ৪১ সংখ্যক সনেটে তিনি বলেছেন, যারা বলে, ভগবানের পূজা না করলে তিনি দণ্ড দেবেন, যমদূত এমন অপূজককে নরকে নিয়ে যাবে, কবির মতে তারা ভগবানের নিন্দুক, তাঁর ভক্ত কখনো নয়। কবির মতে নিজেকে জানান দেবার জন্যে ভগবানের কিছুমাত্র ত্বরা নেই, তাঁর হাতে কাল অন্তহীন—একটি পুষ্পের কলি ফোটাবার জন্য শত বর্ষ ধরে তাঁর ধীর আয়োজন চলে। (তাঁর এই চিন্তার সঙ্গে স্বতঃই যুক্ত তাঁর শিক্ষা-দর্শন।)—সত্যকার ভগবৎ-চেতনা বা ভগবৎ-

প্রেম কোনো এক শুভক্ষণে ভক্তের মনে জাগে, তার পর সেই ভক্তের মধ্যে অন্তহীন চেষ্টা চলে তাঁকে উপলব্ধি করতে—

সেই তো প্রেমের গর্ব ভক্তির গৌরব।
সে তব অগমরুদ্ধ অনন্ত নীরব
নিস্তব্ধ নির্জন মাঝে যায় অভিসারে
পূজার স্বর্ণথালি ভরি উপহারে।
তুমি চাও নাই পূজা সে চাহে পূজিতে,
একটি প্রদীপ হাতে রহে সে খুঁজিতে
অন্তরের অন্তরালে। দেখে সে চাহিয়া
একাকী বসিয়া আছ ভরি তার হিয়া।
চমকি নিবায়ে দীপ দেখে সে তখন
তোমারে ধরিতে নারে অনন্ত গগন।
চিরজীবনের পূজা চরণের তলে
সমর্পণ করি দেয় নয়নের জলে।
বিনা আদেশের পূজা—হে গোপনচারী,
বিনা আহ্বানের খোঁজ, সেই গর্ব তারি।

এর পরের সনেটেও এই অপূর্ব অন্বেষণের ছবি কবি এঁকেছেন

কত না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে
অভ্রভেদী হিমাদ্রির সুদূর আলয়ে
পাষাণ-প্রাচীর মাঝে। হে সিন্ধু মহান,
তুমি তো তাদের কারে কর না আহ্বান
আপন অতল হতে। আপনার মাঝে
আছে তারা অবরুদ্ধ, কানে নাহি বাজে
বিশ্বের সংগীত।
প্রভাতের রৌদ্রকরে
যে তুষার বয়ে যায়, নদী হয়ে ঝরে,
বন্ধ টুটি ছুটি চলে,—হে সিন্ধু মহান,
সেও তো শোনে নি কভু তোমার আহ্বান।

সে সুদূর গঙ্গোত্রীর শিখর-চূড়ায়
তোমার গম্ভীর গান কে শুনিতে পায়।
আপন স্রোতের বেগে কী গভীর টানে
তোমারে সে খুঁজে পায় সেই তাহা জানে।

ভগবৎ-চেতনা কবির অন্তরে কত প্রবল, কত সত্য, তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু ভগবৎ-ভক্তির নামে যে ধরনের উচ্ছ্বাসপ্রকাশ আমাদের দেশে প্রচলিত তার প্রতি তিনি বিমুখতা জ্ঞাপন করেছেন :

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তি-মদ-ধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার-ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর,—সর্ব কর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে। সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি ;
সর্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।
সংবরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।

কেশবচন্দ্রের প্রভাবে নতুন ভক্তির আকুলতা বাংলার শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়েছিল। তারও প্রতি এটি হয়ত কবির এক প্রবল প্রতিবাদ।

নব-যৌবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যে ও আনন্দে কেমন বিভোর হয়ে কবির কাল কেটেছে, আর তা থেকে বর্তমানে তাঁর মনোভাবে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার এক অপূর্ব বর্ণনা আমরা পাচ্ছি এর পরের সনেটে :

মাতৃস্নেহ-বিগলিত স্তন্য-ক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান ; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম স্বরে,—প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত-চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে, প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা।
আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে,—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্তি কঠিন নির্মল।

কবির অন্তর-প্রকৃতির লালনে প্রকৃতি কত বড় সহায় হয়েছে সে কথা পুরোপুরি স্বীকার করেও তিনি সচেতন হয়েছেন তাঁর ভিতরে আজ যে পরিবর্তন ঘটেছে সে-সম্বন্ধে। সেই পরিবর্তনকে তিনি দেখছেন পল্লী থেকে রাজপুরে আসার মতো ব্যাপার। সেই রাজপুরে, অর্থাৎ মানুষের বৃহত্তর মিলন-ক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে, আজ তাঁর কি করণীয় সে কথা প্রকাশ পেয়েছে এর পরের সনেটে :

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে

ছুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

নিবিড় প্রকৃতি-প্রেম থেকে প্রবল নৈতিক বোধে এমন সহজ সমুত্থানের দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। ভারতীয় ধ্যানী চেতনার এ এক নতুন উন্মেষ। খুব সার্থক এই উন্মেষ। কিন্তু এর দিকে দেশের মনোযোগ আজো তেমন করে আকৃষ্ট হয় নি।

গভীর ভগবৎ-চেতনা—অন্য কথায় গভীর জীবন-চেতনা—কবির ভিতরে যে সত্য-বোধ উন্মেষিত করেছে তার সাহায্যে তিনি দেখছেন তাঁর দেশের ছুর্গতি কত গভীর। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছে দেশের লোকদের বহু-ব্যাপক ভীত ত্রস্ত দশার উপরে—সেই ঘৃণিত ভয় ও ত্রাস থেকে তাদের মুক্তি তিনি চাচ্ছেন :

এ ছুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ ছুর্বলের এ পাষাণ-ভার,
এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য-মর্যাদাগর্ব চিরপরিহার।—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

কী অর্থপূর্ণ প্রার্থনা দেশের জন্য! জানি না কতদিনে এর মূল্য সম্বন্ধে দেশ অবহিত হবে।

দেশের এই যে বহুব্যাপক ভয় ও ত্রাস—বৃহৎ লজ্জারাশি—কবির মনে হয়েছে এই মহা দুর্ভাগ্যের বড় কারণ, দেশের লোকদের যোগ্য ভগবৎ-চেতনার বা ধর্ম-চেতনার অভাব। সেই অভাব সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে কবি দেশের প্রচলিত ধর্মাচারের কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর বাণী এই :

মনুষ্যত্ব তুচ্ছ করি যারা সারাবেলা
তোমারে লইয়া শুধু করে পূজা-খেলা
মুগ্ধভাবভোগে,—সেই বৃদ্ধ শিশুদল
সমস্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল।
তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে খর্ব বামনগণ করে অবমান
কে তাদের দিবে মান। নিজ মন্ত্রস্বরে
তোমারেই প্রাণ দিতে যারা স্পর্ধা করে
কে তাদের দিবে প্রাণ। তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদের দিবে ঐক্যধারা।

এই ব্যাপারে দেশের সবাই যে কবির সঙ্গে একমত হবেন তা আশা করা যায় না; তবে কবির আন্তরিকতা লক্ষণীয়। বহু পূর্বে মহাত্মা রামমোহন দেশের প্রচলিত ধর্মাচারে এই ধরনের ত্রুটিই দেখেছিলেন :

Hindu idolatry···, more than any other pagan worship, destroys the texture of society···

দেশের প্রচলিত ধর্মাচারের কিছু কিছু প্রশংসা ও সমালোচনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক লেখায় করেছেন। কিন্তু সে-সবের মধ্যে তাঁর 'নৈবেদ্যে'র সনেট-গুলোয় তাঁর সমালোচনা বেশি জোরালো হয়েছে।—ব্রহ্মের যোগ্য বোধ মানুষের অন্তরে কী অভূতপূর্ব সচেতনতা, কী অসীম দায়িত্ববোধ এনে দেয় সে সম্বন্ধে কবি বলেছেন :

হে রাজেন্দ্র, তোমা কাছে নত হতে গেলে
যে ঊর্ধ্বে উঠিতে হয়, সেথা বাহু মেলে

লহ ডাকি সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে,—অগ্রসর করো প্রতিদিন
যে মহান পথে তব বরপুত্রগণ
গিয়াছেন পদে পদে করিয়া অর্জন
মরণ অধিক দুঃখ।

ওগো অন্তর্যামী,
অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি
দুঃখে তার লব আর দিব পরিচয়।
তারে যেন ম্লান নাহি করে কোনো ভয়,
তারে যেন কোনো লোভ না করে চঞ্চল।
সে যেন জ্ঞানের পথে রহে সমুজ্জ্বল,
জীবনের কর্মে যেন করে জ্যোতি দান,
মৃত্যুর বিশ্রাম যেন করে মহীয়ান।

ধর্মের যে এই 'সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন শৈলপথ' কবি দেখছেন, তাঁর দেশের লোক সেই পথ অবহেলা করে ভাবাবেশে জ্ঞানহারা হয়ে দিন কাটিয়েছে; নিজেদের তারা উন্নত জাগ্রত রাখে নি আদৌ; আর তার ফলে:

তারা আজি কাঁদিতেছে। আসিয়াছে নিশা,
কোথা যাত্রী, কোথা পথ, কোথায় রে দিশা।

দেশের যে বহুব্যাপক ভয়—লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয়—৫৩ সংখ্যক সনেটে কবি পুনরায় সে-সমস্তের কথা তুলেছেন; সেই সনেটের শেষে ভগবানকে বলছেন:

কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার।

এই আত্মবোধ বিজ্ঞান দিতে পারে না। অথচ এর অভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত অসার।

এর পরের ৫৪ সংখ্যক সনেটটি খুব শক্তিশালী। আত্মবোধ অকম্পিত শিখার মতো তাতে রূপ ধরে উঠেছে—সেই আত্মবোধে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সব স্বাধীনতার অক্ষয় ভিত্তি:

আমারে সৃজন করি যে মহা সম্মান
দিয়েছ আপন হস্তে, রহিতে পরান
তার অপমান যেন সহ্য নাহি করি।
যে আলোক জ্বালায়েছ দিবস-শর্বরী
তার ঊর্ধ্বশিখা যেন সর্ব উচ্চে রাখি,
অনাদর হতে তারে প্রাণ দিয়া ঢাকি।
মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।
সেথায় যে পদক্ষেপ করে
অবমান বহি আনে অবজ্ঞার ভরে,
হ'ক না সে মহারাজ বিশ্বমহীতলে
তারে যেন দণ্ড দিই দেবদ্রোহী বলে
সর্ব শক্তি লয়ে মোর। যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

স্বাধীনতার মহাগীতা এটি। আর উচ্চারিত হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে। জার-শাসিত রাশিয়ায়ও জন্ম হয়েছিল স্বাধীনতার মহাসাধক টলস্টয়ের। এই আত্মবোধ যেখানে অবিকশিত অথবা শিথিল সেখানে কি শোচনীয় দশা ঘটে তার কথা কবি পুনরায় বলেছেন ৫৬ সংখ্যক সনেটে :

ত্রাসে লাজে নতশিরে নিত্য নিরবধি
অপমান অবিচার সহ্য করে যদি
তবে সেই দীনপ্রাণে তব সত্য হায়
দণ্ডে দণ্ডে ম্লান হয়। দুর্বল আত্মায়
তোমারে ধরিতে নারে দৃঢ়নিষ্ঠাভরে।
ক্ষীণপ্রাণ তোমারেও ক্ষুদ্রক্ষীণ করে
আপনার মতো,—যত আদেশ তোমার
পড়ে থাকে, আবেশে দিবস কাটে তার।
পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে
চতুর্দিকে ; মিথ্যা মুখে, মিথ্যা ব্যবহারে,

মিথ্যা চিত্তে, মিথ্যা তার মস্তক মাড়ায়ে,
না পারে তাড়াতে তারে উঠিয়া দাঁড়ায়ে।
অপমানে নতশির ভয়ে ভীতজন
মিথ্যারে ছাড়িয়া দেয় তব সিংহাসন।

যে ব্রহ্মবোধ কবির অন্তরে অভাবিত শক্তির সঞ্চার করেছে সেই ব্রহ্মবোধ প্রাচীন ভারতের জাগ্রত-আত্মাদের মধ্যে কী রূপ নিয়েছিল সে কথা কবি বলেছেন এর পরের কয়েকটি সনেটে :

হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর,
তপোবন-তরুচ্ছায়ে মেঘমন্দ্রস্বর
ঘোষণা করিয়াছিল সবার উপরে
অগ্নিতে, জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য। সে বাক্য উদার
এই ভারতেরি।

* * *

তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হতে আনন্দ-নির্ঝর।
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে,
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে,
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।

* * *

তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব-আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে, তোমারি নির্ভয়ে,
তোমারি শাসনগর্বে দীপ্তত্বপ্তমুখে
বিশ্ব-ভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।

* * *

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দবলে

উচ্চারি উঠিলে উচ্চে—'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

কবি নিঃসন্দেহ যে সেই ব্রহ্মজ্ঞানের, সেই একের বীর্যবন্ত বোধেরই, ক্ষমতা আছে ভারতকে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করতে :

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে-মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

আধুনিক যুগ মোটের উপর সহজ-আস্তিক্যবোধ-বিহীন। কিন্তু আত্ম-বোধের মূল্য কোনো সভ্যযুগেই কম হবার কথা নয়। সেই আত্মবোধের সঙ্গে ভগবৎ-বোধের নিবিড় যোগের কথা আমরা জেনেছি। অন্তত, কবি এই অপূর্ব আত্মবোধ লাভ করেছেন ভগবৎ-বোধ থেকেই।

এর পরের কয়েকটি সনেটে কবি ভারতের পতন-দশার কথাই বিশেষ করে ভেবেছেন, কিন্তু এমন শোচনীয় পতনের মধ্যে দাঁড়িয়েও দেশ সম্বন্ধে তিনি আশাহীন নন। সীমাহীন প্রেমের পক্ষেই এটি সম্ভবপর :

তব চরণের আশা, ওগো মহারাজ,
ছাড়ি নাই। এত যে হীনতা, এত লাজ,
তবু ছাড়ি নাই আশা। তোমার বিধান
কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ
সংগোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দিষ্ট কালে

মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চির-সম্ভবের বেশে।
আছ তুমি অন্তর্যামী এ লজ্জিত দেশে,
সবার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে হৃদয়ে
গৃহে গৃহে রাত্রিদিন জাগরূক হয়ে
তোমার নিগূঢ় শক্তি করিতেছে কাজ।
আমি ছাড়ি নাই আশা ওগো মহারাজ।

এই প্রেম—এই মৃত্যুহীন ইচ্ছাশক্তি—চিরদিনই অমূল্য।

ভারত যে কী রূপ নিয়ে শুভক্ষণে জেগে উঠবে কবি তা ঠিক জানেন না। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন এই বিষয়ে যে একালের ইয়োরোপীয় সভ্যতার মধ্যে সে-পথের নির্দেশ নেই। এই সময় আফ্রিকায় বোয়ার যুদ্ধ চলেছিল; তাতে ইয়োরোপীয় সুসভ্য জাতিরা আপনাদের অতিঘৃণিত স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছিলেন। কবির ধর্ম-বোধ ও মনুষ্যত্ব-বোধ কী উচ্চগ্রামে আরোহণ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে 'নৈবেদ্যে'র অনেকগুলো উক্তিতে। ইয়োরোপের তখন জগতে অপ্রতিহত প্রতাপ, কিন্তু কবি যেন দিব্যচক্ষে দেখেছিলেন অচিরে তার যে মহাদুর্গতি ঘটবে সেইটি :

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম,—প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
কবিদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি।
শ্মশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।

*   *   *

স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। অকস্মাৎ
পরিপূর্ণ স্ফীতি মাঝে দারুণ আঘাত

বিদীর্ণ বিকীর্ণ করি চূর্ণ করে তারে
কাল-ঝঞ্ঝা-ঝংকারিত দুর্যোগ-আঁধারে।
একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান
দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।

স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি বিচার
জঠরে পুরিতে চায়। বীভৎস আহার
বীভৎস ক্ষুধারে করে নির্দয় নিলাজ
তখন গর্জিয়া নামে তব রুদ্র বাজ।
ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

* * *

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্‌গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

এই দুর্দিনে কবি ভারতকে বলছেন নতুন প্রভাতের জন্য প্রস্তুত থাকতে। কবির ধারণা হয়েছে ব্রহ্মের বোধ—একের বীর্যবন্ত ভাবনা—ভারতকে সেই প্রস্তুতির শক্তি দেবে।

ভারত সম্বন্ধে কবি যে আশা পোষণ করেছিলেন আজো তা সফল হয় নি। তবে এর পরে ভারতের কর্মক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটে মহাত্মা গান্ধীর—অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা একালের জগতে খুব অর্থপূর্ণ চিন্তারূপে অভিনন্দিত হয়েছে, আর ইয়োরোপের শক্তিমদমত্ততা যে তার ও জগতের জন্য এক ধ্বংস-যজ্ঞের আয়োজন করেছে সে-বিষয়ে একালের ইয়োরোপীয় মনীষীরাও সচেতন

হয়েছেন। কবির আদর্শবাদ যে আসলে কত বড় বাস্তববাদ তা সুপ্রমাণিত হয়েছে। আর এই দিক দিয়ে 'নৈবেদ্যে'রও অসাধারণ মূল্যের কথা খানিকটা বোঝা যাচ্ছে।

এর পরের কয়েকটি সনেটেও সভ্যতা সম্বন্ধে নব-ধারণার ও নব-সম্ভাবনার কথা কবি বলেছেন। ধনাড়ম্বর, শক্তিগর্ব, এসব নয়, প্রাচীন ব্রাহ্মণের যে ত্যাগ-বৈরাগ্য-পূত জীবনাদর্শ ছিল কবি তাকেই মানুষের জন্য বিশেষ কাম্য বিবেচনা করেছেন। নব ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে কবির চিন্তার সঙ্গে পরে আমাদের আরো পরিচয় হবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের সর্বকর্মের নিয়ন্তারূপে কবি দেখেছেন জাগ্রত ভগবানকে—

তাঁরি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী, হে দীনহীন। দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্যদীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে। আর কেহ নহে নহে নহে
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যার কাছে তব শির লুটাইতে পারে।

জাগ্রত ভগবানের প্রতিনিধিরূপে জীবনযাপন বলতে কি বোঝায় তা এক অপূর্ব রূপ পেয়েছে এর পরের সনেটে :

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে। প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার, হে রাজাধিরাজ।
সে গুরু সম্মান তব সে দুরূহ কাজ
নমিয়া তোমারে যেন শিরোধার্য করি
সবিনয়ে। তব কার্যে যেন নাহি ডরি
কভু কারে।

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খরখড়্গ সম

তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

কবির প্রবল ভগবৎ-চেতনা তাঁর নৈতিক-বোধকে বা জীবনের দায়িত্ব-বোধকে কী বলশালী করেছে তা লক্ষণীয়।

কেউ কেউ বলতে পারেন, প্রবল নৈতিক বোধ, অর্থাৎ জীবনের দায়িত্ববোধ, এখানে জাগ্রত-ভগবানের রূপ নিয়েছে। এই দুই মতের কোন্‌টি পুরোপুরি সত্য কে বলবে।

এর পরের ৭২ সংখ্যক সনেটে দেশের ব্যাপক লক্ষ্য সম্বন্ধে কবির বক্তব্য খুব স্পষ্ট রূপ নিয়েছে :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

এর পরের কয়েকটি সনেটেও একান্ত ভগবৎ-অনুবর্তিতার কথা কবি বলেছেন। সেই মহাসত্যের ও মহাশক্তির একান্ত অনুবর্তিতা তাঁকে অপরিসীম বল দিয়েছে।

কিন্তু এমন ভগবৎ-চেতনা সত্ত্বেও মানুষের স্তুতি-নিন্দা রাগ-দ্বেষ